নবসন্ধির ব্যাখ্যা

ঈশ্বর ভালবাসা

যোহনের পত্রাবলির ব্যাখ্যা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ
২০০৮

প্রথম প্রকাশ	২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮২ প্রভুর জন্মোৎসব
সংশোধিত দ্বিতীয় প্রকাশ	 ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সাধ্বী স্কলাস্তিকা
প্রকাশনা	© সাধু বেনেডিক্ট মঠ মহেশ্বরপাশা - খুলনা www.asram.org
অনুমোদন	+ বিজয় ডি ক্রুজ, ওএমআই খুলনার বিশপ ১১ই জুলাই ২০০৮ সাধু বেনেডিক্ট পর্ব
বাইবেল উদ্ধৃতি	পবিত্র বাইবেল - জুবিলী বাইবেল সাধু বেনেডিক্ট মঠের অনুবাদ © বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী - ঢাকা, ২০০৬

সংকেতাবলির অর্থ

প্রাক্তন সন্ধি (পুরাতন নিয়ম)

আদি আদিপুস্তক
যাত্রাযাত্রাপুস্তক
লেবীয়লেবীয় পুস্তক
দ্বিঃবিঃদ্বিতীয় বিবরণ
সামসামসঙ্গীত-মালা
ইসাইসাইয়া
যেরেযেরেমিয়া
এজেএজেকিয়েল
হোহোসেয়া

নবসন্ধি (নূতন নিয়ম)

মথি মথি-রচিত সুসমাচার
মার্কমার্ক-রচিত সুসমাচার
লুকলুক-রচিত সুসমাচার
যোহনযোহন-রচিত সুসমাচার
শিষ্যশিষ্যচরিত
রোরোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র
১ করিকরিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের ১ম পত্র
২ করিকরিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের ২য় পত্র
গাগালাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র
এফেএফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র
কলকলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র
ফিলিফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র
১ থেথেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের ১ম পত্র
২ থেথেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের ২য় পত্র
ফিলেফিলেমোনের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র
হিব্রুহিব্রুদের কাছে পত্র
যাকোব প্রেরিতদূত যাকোবের পত্র
১ পিপ্রেরিতদূত পিতরের ১ম পত্র
২ পিপ্রেরিতদূত পিতরের ২য় পত্র
১ যোহন প্রেরিতদূত যোহনের ১ম পত্র
প্রত্যাপ্রত্যাদেশ পুস্তক

মুখবন্ধ

ব্যাখ্যা লেখায়, প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের ভাষ্য দ্বারাই বিশেষত উপকৃত হয়েছি। সুতরাং এই মুখবন্ধে তাঁর নিজের মুখবন্ধের সমাপনী বাণী উপস্থাপন করা উপকারী মনে করি। তিনি লিখেছিলেন: ‘যার উপলব্ধি-শক্তি রয়েছে, পত্রটির বাণী শুনে সে আনন্দিত না হয়ে পারবে না। তার জন্য পত্রপাঠ হবে আগুনের উপর ঢালা তেলের মত: তার অন্তরে এমন আগুন থাকলে যার ইন্ধন দরকার, তবে সেই আগুন কেমন যেন পুষ্টি পাবে, বৃদ্ধি পাবে ও জ্বলতে থাকবে। অন্য কয়েকজনের জন্য পত্রপাঠ হবে সলতের কাছে দেওয়া শিখার মত: যার অন্তরে আগুন নিভে গেছিল, পত্রের বাণী তার অন্তরে গিয়ে পৌঁছনো মাত্রই আগুন ধরবে (…) আর এভাবে একই ঐশপ্রেমের বিষয়ে আমরা সবাই মিলে আনন্দ করব। কেননা ঐশপ্রেম যেখানে থাকে সেখানে থাকে শান্তি, এবং বিনম্রতা যেখানে থাকে সেখানে থাকে ঐশপ্রেম। কিন্তু ইতিমধ্যে যোহনের বাণী শোনার সময় এসে গেছে: সেই বাণী ব্যাখ্যা করার সময় প্রভু আমাদের যা বলতে অনুপ্রেরণা দেবেন তা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করব, তোমরাও যেন তা ভাল করে উপলব্ধি করতে পার।’

সাধু বেনেডিক্ট মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ

ভূমিকা

যোহনের পত্রাবলি ও আদিখ্রীষ্টমণ্ডলী

যোহনের পত্রাবলি যে যথার্থই প্রেরিতদূত যোহনের লেখা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; বস্তুতপক্ষে পত্রাবলিতে লেখকের নামের উল্লেখ নেই। তথাপি ঐশতাত্ত্বিক ও রচনাশৈলী ভিত্তিক বিবিধ সাদৃশ্য হেতু খ্রীষ্টমণ্ডলীর আদিকাল থেকে পত্রত্রয় সেই একই প্রেরিতদূত যোহনের লেখা বলে সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে যিনি চতুর্থ 'সুসমাচার' ও 'প্রত্যাদেশ' পুস্তক দু'টিরও লেখক। দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইরেনেউস সুসমাচার এবং পত্রত্রয় প্রেরিতদূত যোহনেরই লেখা বলে উল্লেখ করেন; একই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার আচার্য ক্লেমেণ্টও স্পষ্টই সমর্থন করেন পত্রত্রয় প্রেরিতদূত যোহনেরই লেখা।

যোহনের সুসমাচার যেমন, তাঁর পত্রাবলিও তেমন অসীম বিস্তার লাভ করেছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ফিলিপ্পীয়দের প্রতি সাধু পলিকার্পের পত্রে যোহনের প্রথম পত্রই বারংবার যেন অক্ষরে অক্ষরে উল্লিখিত, 'যে কেউ যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না, সে খ্রীষ্টবৈরী; আর যে কেউ ক্রুশের সাক্ষ্য স্বীকার করে না, সে শয়তান থেকে উদ্গত: আর যে কেউ নিজ ভাবাবেগ অনুযায়ী প্রভুর বচনগুলি বিকৃত করে, ও এমন কথা সমর্থন করে যে, পুনরুত্থান নেই, বিচারও নেই, তেমন লোক শয়তানের প্রথমজাত। (ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র ৭:১)। একই সময়ে সাধু জাস্টিনের লেখাগুলিতে যোহনের প্রথম পত্রই বিশেষত যেন প্রতিধ্বনিত হয়, যথা 'যিনি ঈশ্বর থেকে আমাদের জন্ম দিয়েছেন সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হলাম, এমনকি যথার্থই তা-ই হয়ে উঠলাম, কারণ আমরা খ্রীষ্টের আজ্ঞাসকল মেনে চলি' (ত্রিফোনের সঙ্গে আলোচনা ১২৩:৯)।

কিন্তু তবুও যখন আমরা বলি যোহনই পত্রত্রয়ের লেখক, তখন একথা সমর্থন করি না যে, পত্রত্রয় প্রেরিতদূত যোহন দ্বারা একভাবে লিখিত হয়েছে, বরং যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যার 'ভূমিকায়' উপস্থাপিত ধারণার দিকে অঙুলি নির্দেশ করি (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যায়ও একাধিক বার ইঙ্গিত করা হল যে 'লেখকের সমস্যা' অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়, কারণ শেষ পর্যায়ে বিশ্বাস করতে হয় পবিত্র বাইবেলের প্রকৃত 'লেখক' স্বয়ং ঈশ্বরই, যিনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় মন্ডিত মানুষের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। মথি, মার্ক, লুক, পল, যোহন ইত্যাদি 'লেখক' ঈশ্বর বিষয়ে কিছুই লেখেন না, বরং ঈশ্বরই তাঁদের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। 'লেখকের সমস্যার' প্রকৃত গুরুত্ব এতেই কেন্দ্রীভূত করতে পারি যে, কাল, পরিস্থিতি, সমাজ, কৃষ্টি ইত্যাদি 'উপাদান' প্রত্যেকজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষায় রেখাপাত করেছে। সুতরাং চতুর্থ সুসমাচার, পত্রত্রয় ও প্রত্যাদেশ পুস্তকগুলিকে যোহনের লেখা বলে সমর্থন করায় আমরা উল্লিখিত পুস্তকগুলো একই দৃষ্টিকোণ অনুসারে পাঠ করতে আমন্ত্রিত। উপরন্তু, যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের বাণী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য উপরোল্লিখিত সমুদয় 'উপাদান' বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আসুন, সেই উপাদানগুলি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পদার্পণ করি।

সময় ও স্থান

কোন্ তারিখে পত্রাবলি লিখিত হয়েছে এ ক্ষেত্রে কোনো যথার্থ উত্তর দেওয়া যেতে পারে না, এমনকি

শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলে চতুর্থ সুসমাচারের পূর্বেই, আবার কেউ বলে পরেই পত্রাবলি লিখিত হয়েছে। তথাপি সকলের সমর্থন, সম্ভবত প্রথম পত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সম্ভাব্য তারিখ দিতে গিয়ে বলতে পারি যোহনের পত্রাবলি প্রথম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের লেখা।

প্রেরিতদূত যোহন বহুদিন এফেসসে ছিলেন বলে অনুমান করা যায় পত্রাবলি এফেসসে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া সেকালে এ শহরে সেই গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থী খ্রীষ্টানদের আবির্ভাব হয়েছিল যাদের বিপক্ষে যোহন আপন পত্রাবলিতে সংগ্রাম করেন। উপরন্তু এফেসসে সেই কুম্রান সম্প্রদায়ও উপস্থিত ছিল যার সঙ্গে যোহনের ঐশতাত্ত্বিক সম্বন্ধ অনস্বীকার্য।

রচনাশৈলী

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র বিষয়ে আপনা আপনি অনুমান করা যায় সেগুলি সাধারণ চিঠিপত্র; পক্ষান্তরে সাধারণ চিঠিপত্রের তুলনায় যোহনের প্রথম পত্র অতিশয় দীর্ঘ এবং ঐশতাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক দিক গিয়ে খুবই গভীর। এজন্য অনেকের মনে এ প্রশ্নের উদয় হল, যোহনের প্রথম পত্র কি নামেই মাত্র পত্র? অর্থাৎ না কি, চিঠিপত্রের চেয়ে এ লেখা কি একটি উপদেশ নয়, যে উপদেশ পরবর্তীকালেই লিপিবদ্ধ হল? বস্তুতপক্ষে উপদেশমূলক চিহ্ন বহুবিধ: ঠিক শ্রোতাদের কাছে একজন বক্তার মতই লেখক প্রিয় সন্তানদের বলে পাঠকদের সম্বোধন করেন আর বার বার নৈতিক পরামর্শ প্রদান করেন (সাধারণত সেইকালে ধর্মগত চিঠিপত্রে নৈতিক পরামর্শ দেওয়া হত না)। তাছাড়া এমন কতগুলো দীক্ষাস্নান সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত রয়েছে যেগুলোর ভিত্তিতে অনেকে বলে এ পত্র প্রকৃতপক্ষে দীক্ষাস্নান বিষয়ক উপদেশ। কিন্তু তবুও লেখক বহুবার 'তোমাদের লিখছি' ইত্যাদি ধরনের বচন ব্যবহার করেন এবং পত্র পাঠ করে এমন একটি আভাস পাই, লেখক যেন একই নৈতিক, অধ্যাত্ম ও ধর্মগত সমস্যায় জড়িত লোকদের কাছে কথা বলেন; এ কারণ দু'টোই বিশেষত যুক্তিসঙ্গত, ফলে এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, লিপিবদ্ধ একটি উপদেশের চেয়ে যোহনের প্রথম পত্র একটি স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছে প্রেরিত একটা পত্র। উক্ত সিদ্ধান্তের গুরুত্ব এই, মৌখিক উপদেশের তুলনায় একটি পত্রে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থ বহন করে, সুতরাং বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে সেগুলো গ্রহণযোগ্য। ভাষা বিষয়ে কিছু বলতে গিয়ে স্বীকার করতে হয় যে চতুর্থ সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত যীশুর উপদেশসমূহের মত পত্রত্রয়েরও শিল্প-নৈপুণ্যের লেশমাত্র নেই। এমনকি ভাষাটা পরিষ্কার হলেও খুবই বিবর্ণ ও নিস্তেজ। যোহনের লেখার গুণ ও প্রভাব গভীরতম ঐশতাত্ত্বিক ও প্রেরণাপূর্ণ দিকগুলিতেই কেন্দ্রীভূত, যার জন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, মনোযোগপূর্ণ এমনকি নিতান্ত ধ্যানপূর্ণ মনোভাব নিয়েই পত্রাবলি পাঠ করা প্রয়োজন।

যোহন-রচিত সুসমাচার ও প্রথম পত্র

প্রথম পত্র পাঠ করলে পর পাঠক চতুর্থ সুসমাচারের সঙ্গে এটির প্রচুর লক্ষণীয় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ না করে পারেন না। এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

বৈসাদৃশ্য: শাস্ত্র, বিধান, গৌরব, বিচার, ঊর্ধ্ব থেকে, আরোহণ ও অবতরণ করা, উত্তোলিত ও গৌরবান্বিত হওয়া প্রভৃতি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সুসমাচারের শব্দ প্রথম পত্রে স্থান পায় না। অপরপক্ষে প্রথম পত্রে বারংবার উল্লিখিত তৈলাভিষেক, সহভাগিতা, পুনরাগমন, জয়, খ্রীষ্টবৈরী ইত্যাদি শব্দ চতুর্থ সুসমাচারে ব্যবহৃত নয়। আবার, সুসমাচার অপেক্ষা প্রথম পত্রের ভাষা খুব কম গাম্ভীর্যপূর্ণ।

ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে পত্রটি আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকালে প্রচলিত যীশুর সন্নিকট পুনরাগমনের কথা সমর্থনকারী, পক্ষান্তরে সুসমাচারে যীশুর পুনরাগমনের কথা আত্মিকভাবেই অনুধাবিত। গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক

সম্বন্ধে পত্রটির তুলনায় সুসমাচার বৈসাদৃশ্যে অর্থাৎ খ্রীষ্টবিশ্বাসের স্বকীয়তায় বেশি জোর দেয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে অপরাপর সুসমাচারত্রয় ও পলের পত্রাবলির সঙ্গে সদৃশ ঐশতাত্ত্বিক ধারণাগুলির ভিত্তিতেই শাস্ত্রবিদগণ বলেন, প্রথম পত্র চতুর্থ সুসমাচারের পূর্বলেখা।

সাদৃশ্য : ভাষা ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সমষ্টিগতভাবে বিচার করলে স্বীকার করতে হয় বৈসাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্য বহুসংখ্যক। ঈশ্বর থেকে জাত, সত্য, জগৎ, সাক্ষ্য, বাণী মেনে চলা ইত্যাদি শব্দ ব্যতিরেকে দু'টো লেখার মধ্যকার সদৃশ শব্দগুলির একটা তালিকা দেওয়া এখানে স্থানাভাবে সম্ভব নয়। উপরন্তু সুসমাচারে ও পত্রে কতগুলো পদ রয়েছে যেগুলো কেমন যেন একই পদ বলে মনে হয়, যথা ১ যোহন ১:৬ এবং যোহন ১২:৩৫; ১ যোহন ১:৮ এবং যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ২:১১ এবং যোহন ১২:৩৫; প্রভৃতি। আবার, উভয় লেখায় যীশু 'বাণী' ও 'ত্রাণকর্তা' বলে আখ্যায়িত এবং মাংসে তাঁর আগমনই ও মাংসে তাঁর আগমন গুণে পাপমুক্তিই জোর দিয়ে প্রচারিত হয়। লেখা দু'টোর এ সাদৃশ্যও উল্লেখ্য, খ্রীষ্টবিশ্বাস মৃত্যু থেকে জীবনপ্রবেশ, ঈশ্বর থেকে নবজন্ম এবং বিশ্বাস ও ভালবাসায় স্থাপিত জীবনযাত্রা বলে উপস্থাপিত। একই দ্বন্দ্বসূচক শব্দগুলিরও অভাব নেই যথা আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু, সত্য-মিথ্যা, শিষ্য-জগৎ, ঈশ্বরের সন্তান-শয়তানের সন্তান। অবশেষে উভয় লেখা পবিত্র আত্মার প্রেরণাদায়ী ভূমিকা এবং পারস্পরিক ভালবাসার প্রাধান্য এক সুরে ঘোষণা করে। উল্লিখিত সাদৃশ্য ব্যতীত আরও অনেকগুলোই উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য এ সমুদয় সাদৃশ্যই সেই প্রকৃত প্রমাণ যা অনুসারে খ্রীষ্টমণ্ডলীর আদিযুগ থেকে চতুর্থ সুসমাচার ও প্রথম পত্র একই লেখকের লেখা বলে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে।

পত্রাবলির গ্রাহকগণ

সেই সকল স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছে পত্রাবলি প্রেরিত হল যেগুলো প্রেরিতদূত যোহনের ধর্মীয় নেতৃত্ব স্বীকার করত। অনুমান করা যায় এ স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীগুলো পলের বিভিন্ন স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর মত নব প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী নয়, বরং বহুদিন ধরে খ্রীষ্টবিশ্বাস পালন করে আসছিল। প্রথম পত্র বিশেষ করে মণ্ডলীর কতিপয় অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জড়িত এবং ভালবাসায় স্থাপিত ও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরোপলব্ধিতে উদ্দীপিত জীবনধারাই জোর দিয়ে প্রচার করে। স্পষ্টই প্রকাশ পায় লেখক ভুলভ্রান্তিপূর্ণ খ্রীষ্টশিক্ষায় আক্রান্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আদি শিক্ষায় বলীয়ান করে তুলতে চান।

ইহুদী ঐতিহ্য ও কুম্রান সম্প্রদায়ের সঙ্গে পত্রাবলির সম্পর্ক

ইহুদী ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক: চতুর্থ সুসমাচারের মত পত্রাবলিও গ্রীক ভাষায় লিখিত, সুতরাং যেমন সুসমাচারের বেলায় তেমনি পত্রাবলির বেলায়ও আপাতদৃষ্টিতে যোহন গ্রীক কৃষ্টি ও জ্ঞান-দর্শনবাদই বিশেষত অবলম্বন করেন বলে প্রতীয়মান হয়। তথাপি সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখায় গ্রীক কৃষ্টি ও জ্ঞান-দর্শনবাদের ধারণা ব্যবহার করলেও যোহনের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইহুদী ঐতিহ্যেই রোপিত; প্রাক্তন সন্ধি থেকে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি খুব কম ঠিকই, অথচ প্রাক্তন সন্ধির মূল ধারণা পত্রাবলিব্যাপীই বিদ্যমান। বিশেষভাবে একথা সমর্থন পায়, প্রথম পত্র ঈশ্বর সম্পর্কে সেই আন্তরিক জ্ঞান লাভের সুসংবাদ ধ্বনিত করে যা পূর্বকালে নবী যেরেমিয়া ও এজেকিয়েল দ্বারা ভাবী নবসন্ধির মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন:

যেরে ৩১:৩১-৩৪: দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। (...) আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার নির্দেশগুলি রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। (...)

‘তোমরা প্রভুকে জানতে শেখ!’ একথা ব’লে আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না, কারণ তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে।

এজে ৩৬:২৬ …: তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। (…) তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

যোহনের লেখার ভঙ্গি নিজেই ‘হাগ্গাদা’ নামে সেই অতি প্রচলিত ইহুদী ঐতিহ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা অনুসারে প্রাক্তন সন্ধির কাহিনী নতুন নতুন কথায় পুনর্বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হত। এ কথার ভিত্তিতেই সমর্থন করা যায় প্রথম পত্র এমন যা ইহুদী উপদেশের ভঙ্গি অনুসারেই লিখিত। অবশেষে, “অলীক দেবতাগুলো থেকে দূরে থাক” প্রথম পত্রের এ শেষ বচনও নবী এজেকিয়েলের কথা পুনঃপ্রচার করে। পবিত্র আত্মাকে দানের কথা বলতে গিয়ে (এজে ৩৬:২৬) এজেকিয়েল বলে রেখেছিলেন, পবিত্র আত্মাকে দান করার পূর্বে ঈশ্বর মানুষের হৃদয় শুচিশুদ্ধ করবেন এবং সেখান থেকে যত পুতুল বের করে দেবেন (এজে ১১:১৯-২১; ৩৬:২৫), অর্থাৎ নবী এজেকিয়েলের মতে ঈশ্বরের সন্ধি অনুযায়ী জীবনযাপন এবং পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের পূর্বপদক্ষেপ হল মনের শুদ্ধিকরণ, বিবেক-অর্জন এবং প্রতিমাপূজা ত্যাগ।

কুম্রান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক: ইহুদী ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ ক’রে কুম্রান সম্প্রদায়ের সঙ্গে পত্রাবলির সম্পর্ক সম্বন্ধেও আলোচনা করা আবশ্যক। এবিষয়ে যোহন-রচিত সুসমাচারের ‘ভূমিকায়’ কিঞ্চিৎ বলা আছে; এখানে এ কথাই শুধু লক্ষ করব যে, কুম্রান সম্প্রদায়ের ভাষায় সেই অতি প্রচলিত ‘ইয়াহাদ্’ হিব্রু শব্দ (যার অর্থ ঐক্য-সম্বন্ধ বা সহভাগিতা) প্রথম পত্রের সূচনাই প্রত্যক্ষভাবে এবং সমগ্র পত্রেও পরোক্ষভাবে রেখাপাত করে। তবু কুম্রান সম্প্রদায় অপেক্ষা যোহনের বিশেষ এটা নবীনত্ব অনস্বীকার্য: কুম্রানপন্থীরা ইহুদী ধর্মীয় বিধানের অসংখ্য নির্দেশের উপর অধিক জোর দিত, পক্ষান্তরে যোহনের মতে সবকিছু বিশ্বাসে ও ভালবাসার অদ্বিতীয় আজ্ঞায়ই কেন্দ্রীভূত, যে-ভালবাসা যীশুখ্রীষ্টে ঈশ্বরেরই ভালবাসার অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ। কিন্তু তথাপি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কুম্রান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সন্দেহের অতীত, এমনকি ঠিক এ স্পষ্ট সম্পর্ক ভিত্তি করে শাস্ত্রবিদগণ একথা উপস্থাপন করেন, ৭২ খ্রীষ্টাব্দে যেরুসালেম ধ্বংসের পরে যে শহরে অধিকাংশ কুম্রানপন্থীরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেই এফেসস শহরে উপস্থিত খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছেই যোহনের পত্রাবলি প্রেরিত হয়েছিল।

পত্রাবলির সমস্যাদি

পূর্বে বলেছিলাম, যে যে স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছে যোহন পত্রাবলি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো ভুলভ্রান্তিপূর্ণ খ্রীষ্টশিক্ষায় আক্রান্ত। বিশেষভাবে প্রথম পত্রেই যোহন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন খ্রীষ্টমণ্ডলীতে এমন ভ্রান্তমতপন্থী ও নকল শিক্ষাগুরুদের উপস্থিতি দেখা দিয়েছে যারা সাধারণের মন উত্তেজিত করে। যোহনের ভাষায় তারা প্রতারক, খ্রীষ্টবৈরী, মিথ্যাবাদী এবং জগতের লোক; তাদের শিক্ষা খাঁটি খ্রীষ্টবিশ্বাসকে এমন পরিমাণে বিকৃত করে যে যোহনের ধারণায় অন্তিম ক্ষণ সন্নিকট। এ নকল শিক্ষাগুরু নামেই মাত্র খ্রীষ্টান, তারা প্রকৃতপক্ষে যীশুকে ‘বিলুপ্ত করে’, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যে মানুষ হলেন তারা একথা অস্বীকার করে এবং এ ভ্রান্তমতই কেবল প্রচার করে যে, সাময়িকভাবেই মাত্র ঐশ আত্মা নাজারেথীয় যীশুতে অতিথি হিসাবে অবস্থান করেছিলেন: দীক্ষাগুরু যোহনের সাধিত দীক্ষাস্নানের দিনেই শুধু ঈশ্বর যীশুতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং যন্ত্রণাভোগের পূর্বে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছিলেন, কেননা ঈশ্বরের বেলায় যন্ত্রণা ভোগ করা ও মৃত্যু বরণ করা যুক্তিহীন কথা। সহজে বুঝতে পারি, এরূপ ভুলধারণা প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, খ্রীষ্টবিশ্বাস ‘বাণী হলেন মাংস’ ঐশসত্যের

উপরই স্থাপিত বিধায় (যোহন ১:১৪): খ্রীষ্টবিশ্বাস অনুসারে, ২০০০ বছর পূর্বকালীন পৃথিবীস্থ যীশু এবং বিশ্বাসঘোষিত যীশুখ্রীষ্ট একই যীশুখ্রীষ্ট, এমনকি যীশুখ্রীষ্ট যর্দন নদীর জলে এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আপন রক্তে 'দীক্ষাস্নাত' হলেন, অর্থাৎ তিনি সারা জীবন ধরেই হলেন প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত ঈশ্বর। আপাতদৃষ্টিতেও অনুভব করতে পারি এ সমস্যা বর্তমান যুগেও উপস্থিত: কেউ বলে যীশুখ্রীষ্ট নবী মাত্র, আবার কেউ বলে তিনি বিভিন্ন দেবতার অন্যতম; এমনকি খ্রীষ্টবিশ্বাস অগ্রাহ্য করার প্রধান কারণ বা আপত্তি ঠিক এটি যে, দেহধারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব এবং যীশুর অপমানপূর্ণ যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জগতের পরিত্রাণলাভ নিতান্ত যুক্তিহীন। স্পষ্টই দেখতে পাই খ্রীষ্টবিশ্বাস গ্রহণের জন্য বর্তমানকালের বাধাবিঘ্ন আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকালের একই বাধাবিঘ্ন; যারা যীশুকে অগ্রাহ্য করে তাদের নামই মাত্র ভিন্ন, কিন্তু বাধাবিঘ্ন বা অগ্রাহ্য করার কারণগুলো এখনও একই। এজন্যই আমরা অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাসী জীবনের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের সেই ভালবাসা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করব যা যীশুখ্রীষ্টে শেষ মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সাক্ষ্যদান পারস্পরিক ভালবাসায় বা ঐক্য-জীবনে উত্তমরূপে প্রমাণিত, এতেই জগৎ বিশ্বাস করবে পিতা যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছেন (যোহন ১৭:২৩)।

ভ্রান্তমতপন্থী শিক্ষাগুরু ও সকল নবীদের আর একটা দোষ ছিল তাদের পারস্পরিক ভালবাসার অভাব। তারা মরমিয়া ও তাত্ত্বিকভাবেই ঈশ্বরকে জানে বলে দাবি করত, অর্থাৎ তারা ঈশ্বর বিষয়ে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা ও উপদেশ বা দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করতে পারত। এমনকি তারা মনে করত মরমিয়া জ্ঞানই পরমার্থলাভের শ্রেষ্ঠ পথ, কাজেই প্রেমাজ্ঞা পালন সাধারণের কাজ। তাদের কথার প্রতিক্রিয়ায় যোহন ঘোষণা করেন, বাইবেল অনুসারে কেউই কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি এবং পাণ্ডিত্য-প্রকাশ নয় ও মরমিয়া জ্ঞানও নয় বরং তাঁর আজ্ঞাপালনই একমাত্র ও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান: যেখানে রয়েছে ভালবাসা, সেইখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন; যে কেউ 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্য (যোহন ১:১৪) সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে ঈশ্বরের মত সেও মানবজাতি ও প্রত্যেকটি মানুষের পরিত্রাণ সাধনের জন্য আত্মনিয়োজিত থাকবে এবং অনুভব করবে যীশুর মত সেও প্রতিটি ভাই মানুষের কাছে আলো ও খাদ্য স্বরূপ হয়ে প্রেরিত। যখন আমরা ঐশপ্রেমপ্লাবিত হয়ে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীকে নিয়েই শুরু ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে পূর্ণ ভালবাসায় ভালবাসি তখনই আমরা বলতে পারি, ঈশ্বরকে জানি।

সংক্ষিপ্ত হলেও অবশিষ্ট পত্রদ্বয়ও প্রথম পত্রের একই সমস্যাদি বিশ্লেষণ ও সমাধান করতে চেষ্টা করে। তৃতীয় পত্রটি অন্য আর একটা সমস্যার সম্মুখীন: সম্ভবত সেই স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর একজন সভ্য প্রেরিতদূত যোহনের বিরোধিতা করত।

উপসংহার

খ্রীষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তরে বিবিধ ধরনের 'রোগ' দেখা দিতে পারে, পত্রাবলি লিখে যোহন এবিষয়েই আমাদের সতর্ক করতে চান। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সেইকালে ইহুদীরা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের তীব্রভাবে আক্রমণ করত এবং রোম সাম্রাজ্য সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত যে নির্যাতনে প্রেরিতদূত পিতর ও পল বহু খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ধর্মশহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। এ পরিস্থিতিতে যোহন এমন খ্রীষ্টমণ্ডলীর পক্ষাবলম্বী হয়ে দাঁড়ান যে মণ্ডলী ভালবাসায় সুসজ্জিতা হয়ে নির্ভয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে এবং ভ্রাতৃপ্রেম ও ঐশজীবনে রত থাকে। তিনটি বিষয় বার বার উপস্থাপিত: ১। খ্রীষ্টবিশ্বাসী পাপাচরণ ক'রে জীবনযাপন করতে পারে না, ২। খ্রীষ্টবিশ্বাসী পারস্পরিক ভালবাসার আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই পালন করবে, ৩। খ্রীষ্টবিশ্বাসী মাংসে আগত

ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টে স্থাপিত অটল বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবে।

সুতরাং পত্রাবলির লক্ষ্য চতুর্থ সুসমাচার ও প্রত্যাদেশের একই লক্ষ্য অনুধাবন করে। প্রত্যাদেশ পুস্তকে ঈশ্বর খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ভালবাসার অভাবের জন্য অভিযুক্ত করেন এবং চতুর্থ সুসমাচারে ভালবাসাই যীশুর প্রকৃত শিষ্যের প্রমাণ বলে উপস্থাপিত। প্রথম পত্র এ বিষয়টিকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে অথচ উত্তমরূপেই ব্যক্ত করে, 'আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা। ঈশ্বর ভালবাসা' (৪:১৬)। পবিত্র আত্মার দেওয়া বিশ্বাসে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা সেই ভালবাসাস্বরূপ ঈশ্বরকে জানে যিনি মানবীয় ভালবাসারও উৎস; সেই ভালবাসা মাংসে আগত ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে ও জানে সেই ভালবাসাই সবকিছুর উৎপত্তি আর সবকিছুর লক্ষ্য, কারণ ঈশ্বরই ভালবাসা। সুতরাং তারা এ কথাও জানে, এ ভালবাসায় বিশ্বাস ব্যতীত পরিত্রাণের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য পথ নেই: ভালবাসায় যে স্থিতমূল থাকে সে ঈশ্বরে বসবাস করে এবং ঈশ্বর তার মধ্যে বসবাস করেন। অবশেষে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা জানে দৈনন্দিন ভ্রাতৃপ্রেম পালনেই অর্থাৎ যেভাবে যীশু নিজে চললেন সেইভাবে চললে (২:৬) তারা ঐশভালবাসায় স্থিতমূল থাকে।

কাঠামো

খুবই সংক্ষিপ্ত বলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পত্রে যে কোন সাধারণ পত্রের কাঠামো আপনা আপনি প্রতীয়মান: আশীর্বাদ, সতর্কবাণী, এবং উপসংহার।

পক্ষান্তরে প্রথম পত্রের কাঠামো একটু জটিল:

১। মুখবন্ধ: ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন-সহভাগিতা (১:১-৪)

২। ঈশ্বর আলো (১:৫–২:২৯)

- আলোতে আচরণ (১:৫-৭)
- পাপাচরণ ত্যাগ (১:৮–২:২)
- আজ্ঞাপালন (২:৩-১১)
- জগতের বিষয়ে সাবধান (২:১২-১৭)
- খ্রীষ্টবৈরীর বিষয়ে সাবধান (২:১৮-২৯)

৩। আমরা ঈশ্বরের সন্তান (৩:১–৪:৬)

- ঈশ্বরের সন্তানসুলভ আচরণ (৩:১-৩)
- পাপাচরণ ত্যাগ (৩:৪-১০)
- আজ্ঞাপালন (৩:১১-২৪)
- জগৎ ও খ্রীষ্টবৈরীর বিষয়ে সাবধান (৪:১-৬)

৪। ঈশ্বর ভালবাসা (৪:৭–৫:১৩)

- ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত এবং বিশ্বাসে স্থাপিত (৪:৭-২১)
- ভালবাসা খ্রীষ্টবিশ্বাসের ফল (৫:১-১৩)

৫। উপসংহার (৫:১৪-২১)

- প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা (৫:১৪-১৭)
- ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা (৫:১৪-২১)

যোহনের প্রথম পত্র

একটি পুস্তকে বা একটি লেখায় মুখবন্ধ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। থাকলে তা পুস্তকের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ সাধারণত তার মধ্য দিয়ে লেখক সংক্ষিপ্তভাবে নিজের মর্মকথা ব্যক্ত করেন। যোহনের প্রথম পত্রের বেলায় একথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য বলে আমরা মুখবন্ধ মনোযোগের সঙ্গেই পাঠ করতে আমন্ত্রিত।

মুখবন্ধ

(১:১-৪)

ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জীবন-সহভাগিতা

সংক্ষিপ্ত হলেও যোহনের প্রথম পত্রের মুখবন্ধ গভীর, গম্ভীর ও হৃদয়স্পর্শী। তার মর্ম ৩য় পদে সরাসরি ব্যক্ত হয় তথা, আমরা যেন যোহনের সহভাগিতালাভে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করি। সুতরাং ঐশ জীবন-সহভাগিতাই মুখবন্ধ ও সমগ্র পত্রটির আলোচ্য বিষয়, আর একথা আদৌ অত্যুক্তি নয়।

৩য় পদ যত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য, ১ম ও ২য় পদগুলি তত কঠিন ও দুর্জ্ঞেয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, যোহন কথাশিল্পী নন এবং আজন্ম গ্রীকভাষী নন বিধায় ভাষাগত দিক দিয়ে যে তাঁর লেখায় কিছুটা আড়ষ্টতা প্রকাশ পাবে তা স্বাভাবিক। যীশুর জীবনকালে তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য হয়েছিলেন এবং তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রেরিতদূত হয়ে নানা স্থানে তাঁর নাম প্রচার ক'রে কতগুলো স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। এভাবে তিনি জীবন-বাণী যীশুখ্রীষ্টের যে ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীগত জীবনময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেই সকল অনির্বচনীয় অনুভূতি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করতে এবং সেই যীশুখ্রীষ্টের কথা যথাযথভাবে ঘোষণা করতে অভিপ্রেত। সুতরাং উক্ত পদ দু'টোর সরলার্থ এই: 'জীবন-বাণী বিষয়ে যা দেখেছি ও শুনেছি, তা-ই জানাচ্ছি।' আপাতদৃষ্টিতে এতে আমরা অনুমান করি, যোহন একটি ঘটনারই সংবাদ জানাতে ইচ্ছা করেন। তবুও তাঁর কথায় এ বৈশিষ্ট্য বিশেষত লক্ষণীয়: ঘটনা ও সংবাদ উভয়ই অপূর্ব এবং অসাধারণ। ঘটনা হল অপূর্ব এবং অসাধারণ, কারণ বিশ্বাসীমণ্ডলীর মাঝে নিত্যস্থায়ী যীশুখ্রীষ্টকেই নির্দেশ করে। সংবাদও অপূর্ব এবং অসাধারণ, কারণ ঠিক তার মাধ্যমেই যীশুখ্রীষ্ট এখনও আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই সংবাদ গ্রহণের উপরেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতা নির্ভর করে।

১ [১] যা আদি থেকে ছিল,
যা আমরা শুনেছি,
যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,
যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি
ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,
আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি।

২ কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল ;
আমরা তা দেখেছি,
তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি
আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি
যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—
৩ যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি,
তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার ;
পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গেই
আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।
৪ আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,
আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।

যারা চতুর্থ সুসমাচার অবগত আছি আমরা সেটির বাণী-বন্দনা এবং এ মুখবন্ধটির মধ্যকার সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষ করেছি। পাঠকের সুবিধার জন্য সদৃশ অংশ দু'টো উদ্ধৃত করি :

প্রথম পত্রের মুখবন্ধ (১ম অধ্যায়)		**৪র্থ সুসমাচারের বাণী-বন্দনা(১ম অধ্যায়)**	
১	আদি থেকে	১	আদিতে
	দেখেছি	১৪	তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম
	জীবন-বাণী	৪	তাঁর (=বাণীর) মধ্যে ছিল জীবন
২	জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল	১৪	বাণী হলেন মাংস
	(জীবন) পিতামুখী ছিল।	২ ও ১৮	তিনি ছিলেন পিতামুখী।

উল্লিখিত সাদৃশ্য ব্যতীত কয়েকটি বৈসাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য, যথা : চতুর্থ সুসমাচার এ অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের মধ্যে মাংসে ঐশবাণীর আগমনেরই উপর জোর দেয় : ঐশবাণীর আলোতেই 'আলো ঈশ্বরের' সন্তানদের ও অন্ধকারময় জগতের সন্তানদের মধ্যকার বিচ্ছেদ ঘটেছিল। পক্ষান্তরে পত্রটিতে যোহন ঐশবাণীর আগমন নয়, বরং সেই আগমনের ফলাফলেরই উপর প্রত্যক্ষভাবে আলোকপাত করেন। সুতরাং একথা বলা চলে, যদিও চতুর্থ সুসমাচার ও প্রথম পত্র উভয়ই ঐশবাণী-যীশুতে কেন্দ্রীভূত তবুও যে সুসংবাদকে সুসমাচার 'পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্গত এবং পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাগত ঐশবাণী' বলে ঘোষণা করে, সেই সুসংবাদের হস্তান্তরই হল পত্রটির প্রচারের লক্ষ্য। আবার, সুসমাচার যা মানবেতিহাসের পরম ঘটনা (অর্থাৎ মাংসে ঐশবাণীর আগমন) বলে ঘোষণা করেছিল, সেই বিষয়ে পত্রটি বলে, এখনও বাণীঘোষণা ও বাণীপ্রচারের সময়ে সেই পরম ঘটনা ঘটে থাকে; এর অর্থ এই, বর্তমানকালেও যখন খ্রীষ্টমণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের কথা প্রচার করে তখন ঐশবাণী মানবজাতির মধ্যে আগমন করে উপস্থিত হন ; যখন মণ্ডলী দ্বারা যীশুখ্রীষ্ট ঘোষিত হন, তখন তিনি পিতা থেকে উদ্গত হয়ে আমাদের মাঝে এসে বিরাজ করেন এবং পুনরায় পিতার কাছে ফিরে যান (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১:২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ; আর প্রেরিতদূতগণের উপর প্রতিষ্ঠিত ও মণ্ডলী দ্বারা ঘোষিত খ্রীষ্টের বাণীকে যারা গ্রহণ করে তারা অনন্ত ঐশজীবনে প্রবেশ করে, ঈশ্বরসন্তানের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং জ্যোতির্লোকে অনুপ্রবেশ ক'রে ত্রিত্বের গৌরব প্রত্যক্ষ করে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি, পিতা থেকে উদ্গত ঐশবাণীকে যে গ্রহণ করে ঐশবাণী তাকে সঙ্গে নিয়ে পিতার কাছে ফিরে যান ; যারা প্রচারিত ঐশবাণীকে অগ্রাহ্য করে তারা অসৎ, অন্ধকার ও মৃত্যুর মধ্যে থাকে এবং ঈশ্বর দ্বারা আলোকিত সঞ্জীবিত পরিত্রাণকৃত জগৎ থেকে

নিজেদের বঞ্চিত করে।

১:১ক—যা আদি থেকে ছিল: এ উক্তিতে যোহন অবশ্যই চতুর্থ সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১ম পদের কথা প্রতিধ্বনিত করতে চান, তথা: 'আদিতে ছিলেন বাণী'। তবু তাছাড়া তিনি পবিত্র বাইবেলের প্রথম বাণীর সঙ্গেও প্রত্যক্ষ মিল রাখতে চান, 'আদিতে, যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন ...' (আদি ১:১)। এভাবে তিনি ঘোষণা করেন, ঐশবাণী ও অনন্ত জীবন বলে যীশুখ্রীষ্ট জগৎসৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, পিতার সঙ্গেই বিদ্যমান, এমনকি পিতার কোলে বিরাজমান অদ্বিতীয় পুত্র বলেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন (যোহন ১:১৮)। 'যীশুখ্রীষ্ট অনাদি অনন্ত', এটিই এ পদের মর্মকথা।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়, তথা: আদিপুস্তক ও চতুর্থ সুসমাচার বলে 'আদিতে' এবং প্রথম পত্রটি বলে 'আদি থেকে'। এতে আমরা অনুমান করি আদিপুস্তক ও চতুর্থ সুসমাচার অপেক্ষা যোহন এজগতে যীশুর আত্মপ্রকাশকর্মেরই আদিলগ্নের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন; বাস্তবিকই যোহন বলতে চান, যখন যীশু দীক্ষাগুরু যোহনের দীক্ষাস্নান গ্রহণ ক'রে নিজেকে এবং পিতাকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন তখন তিনিও উপস্থিত ছিলেন; যীশুর প্রচার ও জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়াতেই যোহন বিশেষ করে বিশ্বাসযোগ্য।

১:১খ—যা আমরা শুনেছি ...: যে জীবন-বাণী মাংস হলেন, অর্থাৎ যে যীশু আপন জীবনযাত্রায় মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর ছিলেন তাঁর বিষয়ে যোহন অসাধারণ এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যীশুর জীবনের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবন এক জীবন হয়ে গেছিল। প্রভু যীশুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাহচর্য ও আন্তরিকতার স্মৃতি তাঁর কাছে এখনও জীবন্ত, এবং সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর এ উক্তিটি চারটি সুসমাচারে বিবৃত কতিপয় ঘটনার দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করে, তথা: যীশুর নিজের মুখ থেকেই তিনি তাঁর জীবন-বাণী শুনেছিলেন; তিন বছর ধরে পালেস্তাইন দেশে ভ্রমণকারী যীশুকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন; কানা গ্রামে, দিব্য রূপান্তরের দিনে, বিশেষভাবে যন্ত্রণাভোগের সময়ে ও পুনরুত্থানের পরবর্তী দিনগুলিতে তাঁর ঐশগৌরব প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অন্তিম ভোজে যীশুর কোলে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, প্রভৃতি। এ সকল কথা উল্লেখ করে যোহন এক দিকে চান, আমরাও যেন যীশুর সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতম সাহচর্য লাভ করি। বস্তুত তাঁর দৃঢ় ধারণা, সুসমাচার পাঠে আমরাও বিশ্বাস গুণে তাঁর সঙ্গে যীশুর গৌরব প্রত্যক্ষ করব। কিন্তু তবুও এ সকল কথার উল্লেখে অন্য একটা উদ্দেশ্যও নিহিত। উদ্দেশ্যটি যীশুর কোলে হেলান দিয়ে বসাতেই প্রকাশ পায়। এবিষয়ে স্মরণ করা উচিত, ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে যখন কুলপতির মত মহামান্য একজন ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে আপন বুকেই টেনে দিয়ে তার কাছে মর্মকথা জানাতেন: ইসায়াকের সঙ্গে আব্রাহাম, যাকোবের সঙ্গে ইসায়াক এবং বেঞ্জামিনের সঙ্গে যাকোব এরূপ ব্যবহার করেছিলেন। এ ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে যোহন 'বাণী হলেন মাংস' মর্মসত্যের (যোহন ১:১৪) উত্তরাধিকারী ও বিশিষ্ট সাক্ষীরূপে আত্মপরিচয় দেন। অর্থাৎ এ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তিনি আপন দাবি যথার্থ দাবি বলে প্রতিষ্ঠা করেন, তথা: যীশুকে স্বচক্ষে দেখেছেন ও স্বকর্ণে শুনেছেন বলে, এমনকি তাঁর কোলে হেলান দিয়ে বসেছেন বলে তিনিই যীশুর বিষয়ে প্রকৃত সাক্ষ্য রক্ষা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যেন এ প্রকৃত সাক্ষ্যদান যথাযথ ও নির্ভুলভাবে প্রচারিত আর চিরকাল ধরে হস্তান্তরিত হয় এজন্যও তিনি বিশেষভাবে নিযুক্ত। অন্য কথায় বলতে পারি, যোহন এবং অন্যান্য প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাই যীশুর কথা রক্ষা ও ব্যাখ্যা করেন।

আমাদের এ ব্যাখ্যা থেকে আমরা যোহনের কালের কয়েকটা সমস্যা অবগত আছি এবং জানতে পারি কী করে তিনি সেই সমস্যাগুলি সমাধান করেছিলেন। যিনি জীবনেশ্বর, সেই অনাদি ঐশবাণী মাংস হলেন এবং

সাধারণ মানুষ হয়ে জগৎ ও মানবজাতির ইতিহাসে প্রবেশ করলেন: এটিই সেই আসল কথা যা বিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেন, তিনি নিজেই দেখেছেন ও শুনেছেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদান করা ছাড়া তিনি পরোক্ষ্যভাবে তাদেরই বিপক্ষে উঠে দাঁড়ান যারা সেকালে সমর্থন করত যে, যীশুর প্রকৃত মানবসত্তা, তাঁর দ্বারা প্রচারিত সংবাদ এবং সেই সংবাদ হস্তান্তরের জন্য প্রৈরিতিক অধিকার স্বীকার না করলেও যীশুকে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ যীশু যে সত্যিকারে মানুষ হয়েছিলেন এবং প্রেরিতদূতগণের কাছে আপন আত্মিক উত্তরাধিকার ন্যস্ত করেছিলেন, তাদের কাছে এ সকল কথা গুরুত্বহীন ও অর্থশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা যীশুর সঙ্গে মরমিয়াই ও কাল্পনিক সম্পর্ক মাত্র রাখতে সম্মত ছিল। খুব সহজে আমরা বুঝতে পারি, এ ধরনের বিশ্বাস যীশুকে একটা সাধারণ দেবতার পর্যায়ে উপনীত করে এবং 'বাণী হলেন মাংস' ঘটনায় (যোহন ১:১৪) স্থাপিত খ্রীষ্টবিশ্বাসকে ধ্বংস করে। এজন্য এই ধরনের সমস্যাদির সম্মুখীন হয়ে যোহন জীবন-বাণী যীশুর কথা বলতে গিয়ে তাঁকে প্রকৃত মানুষের মত মানুষ বলে উপস্থাপন করেন: যীশু প্রকৃত ঈশ্বর হয়েও একাধারে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত মানুষ। এ পত্রটির ৫ম অধ্যায়ে যোহন অধিকতর স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, যীশু জলের মধ্য দিয়েই শুধু নয়, জল আর রক্তেরই মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন। এর অর্থ এই, মৃত্যু পর্যন্তই যীশু মানুষ হলেন, কারণ তাঁর ক্রুশবিদ্ধ দেহখানি থেকে রক্ত নিঃসৃত হল (যোহন ১৯:৩৪)।

আবার, জীবন-বাণী বলে যীশুকে উপস্থাপন ক'রে যোহন ঘোষণা করেন, প্রকৃত মানুষ হয়েও যীশু প্রকৃত ঈশ্বর, কারণ যীশুতে ঐশজীবন অর্থাৎ ঈশ্বর নিজে বিরাজ করেন। ঐশজীবনে বা ঈশ্বরত্বে পরিপূর্ণ বলে মাংসে আগত যীশু সেই ঐশজীবন আমাদের দান করতে সক্ষম: যীশুই হলেন ঐশবাণী অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ও আত্মদান, কারণ তিনি ঈশ্বর থেকে উদ্গত জীবন আমাদের দান করেন এবং ফলত আমাদের ঐশবাণী ও ঈশ্বরের বিরোধী জগতের সম্মুখীন করান। ঐশবাণী-যীশুর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে উত্তমরূপে জানতে পারি, কিন্তু যোহনের ভাষায় 'জানা' বলতে দার্শনিকদের জ্ঞান নয় বরং জীবন-ঐক্য বোঝায়, যার জন্য আমরা অনুমান করি, ঐশবাণী-যীশুর মাধ্যমে, অর্থাৎ যীশুর বাণী শ্রবণে ও পালনে আমরা ঈশ্বরের নিজের জীবনপ্রাপ্ত এবং তাঁর সঙ্গে ঐক্য-সম্বন্ধে একীভূত। কিন্তু এ কথাও স্মরণযোগ্য, ঐশবাণী-যীশু নিজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস চান ঠিকই, কিন্তু একাধারে তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতিও আমাদের বাধ্যতা দেখতে চান। অর্থাৎ কিনা খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক মধ্যস্থতা স্বীকার না করলে তবে কেউই নিজেকে খ্রীষ্টবিশ্বাসী বলে গণ্য করতে পারে না এবং যীশুর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

১:২ক,খ,গ—সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল …: যেমন 'জীবন-বাণী'র ক্ষেত্রে তেমনই এখানেও 'জীবন' হলেন জীবনময় ঈশ্বর। মাংসে যীশুর আগমনে জীবনেশ্বর আমাদের মাঝে এসে জীবন যে কী, তা আমাদের জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে যোহনের ভাষায় 'আত্মপ্রকাশ করেছিল' এর অর্থ মানসিক, কাল্পনিক বা মরমিয়া অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর নয়: মাংসে আগমনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ মানুষ হওয়াতেই সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল। অন্য শব্দ ব্যবহার ক'রে চতুর্থ সুসমাচার একই কথা ঘোষণা করে, বাণী হলেন মাংস (যোহন ১:১৪)।

এ পত্রটির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা সাধু আগস্তিন কাব্যিক ভাষায় এবিষয়ে লিখেছিলেন, 'আমাদের মানবীয় চোখ যাঁকে দেখতে অক্ষম ছিল, মানবদেহ গ্রহণ ক'রে সেই ঐশবাণী নিজেকে দৃশ্যমান করেছেন; সূর্যের যিনি স্রষ্টা, সূর্যের প্রভায় তিনি নিজেকে প্রকাশমান করেছেন, অর্থাৎ এ মানব-মাংসেই আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কুমারী মারীয়ার গর্ভই তাঁর মিলন-কক্ষ, সেইখানে বর ও কনে অর্থাৎ ঐশবাণী ও মাংস মিলিত হলেন।'

১:২ঘ—(যে অনন্ত জীবন) পিতামুখী ছিল: এ উক্তিতেও সুসমাচারের বাণী-বন্দনা ধ্বনিত হচ্ছে (যোহন ১:১-২)। এ উক্তির প্রথম তাৎপর্য যীশুর ঐশস্বরূপ নির্দেশ করে (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১:১-২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য): যীশু প্রকৃত ঈশ্বর। কিন্তু অধিক গভীরতর একটা অর্থও অনুমেয়: যীশু পিতামুখী, কারণ পিতার সান্নিধ্যে থাকাই তাঁর পরমানন্দ; জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও যীশুর ইচ্ছা ছিল, তিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, পিতার অনুগত ও বাধ্য পুত্র বলে ব্যবহার করবেন। যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁকে এ জগতে আসতে হবে, তখন আপত্তি না ক'রে এবং প্রেমপূর্ণ মনোভাব নিয়ে নেমে এলেন; যখন জানতে পারলেন তাঁকে ক্রুশে উত্তোলিত হতে হবে, স্বেচ্ছায় ক্রুশে আরোহণ করলেন। কিন্তু, জগতে থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও পিতাকে ত্যাগ করেননি, সর্বদাই ঈশ্বরমুখী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর মন সর্বদাই পিতার প্রতিই ধাবমান ছিল এবং পিতার কাছে ফিরে যাওয়াই ছিল তাঁর অবিরত গভীর আকাঙ্ক্ষা। এ বাধ্যতার জন্য তিনি আমাদের আদর্শ, এ প্রেমপূর্ণ বাধ্যতা অনুকরণেই আমরা আহূত। 'অনন্ত জীবন' বিষয়ে যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ৩:৩৬ ও ৫:২৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; 'জীবন' পরিশিষ্টও পৃঃ ১৮০ দ্রষ্টব্য)। সংক্ষিপ্ত একটা সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পারি, অনন্ত জীবন হল আসল প্রকৃত জীবন, স্বয়ং জীবনেশ্বরেরই জীবন, যিনি আপন পরিত্রাণদায়ী ক্ষমতায় যীশুর মাধ্যমে মানবজগৎকে নবীভূত ও নবসৃষ্ট করেন। ফলে জীবনেশ্বরের এ অনন্ত জীবন যীশুর সঙ্গে সংযোগ গুণেই মাত্র প্রাপ্ত: বিশ্বাসের মাধ্যমে যীশুর সঙ্গে যে সংযুক্ত থাকে সে-ই পেয়েছে অনন্ত জীবন। এ থেকে অনুমান করা যায় আমাদের পক্ষে যীশু কতই না প্রয়োজন: কেননা যীশুর সঙ্গে সংযোগ না রাখলে তবে আমরা সেই জীবন পেতে অক্ষম; এ উদ্দেশ্যেই পিতা যীশুকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর দ্বারা যেন জগৎ জীবন পায়। উপসংহারে বলতে পারি, ২য় পদে যোহন আপন 'সাক্ষী' ভূমিকার উপর পুনরায় জোর দেন এবং তিনি পিতামুখী সেই অনন্ত জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিধায় এবং পিতার কোলে বিরাজমান সেই অদ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে অনেক দিন অতিবাহিত করেছিলেন বিধায় তাঁর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত, এ সমস্ত কথা তাঁর লেখায় সহজে প্রতীয়মান। নবসন্ধির অন্যান্য লেখকদের অপেক্ষা যোহনই 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্যের (যোহন ১:১৪) অচিন্তনীয় অলৌকিকতায় বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, একথাও স্বীকার্য। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে তিনি অবিরতই সেই সংবাদ ধ্যান ও প্রচার করেন, তথা 'বাণী হলেন মাংস', 'জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল', ঈশ্বর আমাদের মত মানুষ হলেন।

১:৩ক,খ—যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি: এ ৩য় পদের আপাত অর্থ অনুসারে বলা যায়, যেমন যে কোন জিনিস অবগত না হলে, তবে সেই বিষয়ে কিছু বলা যায় না, তেমনি যীশুকে অবগত না হলে তবে তাঁর কথা প্রচার করা যায় না। কিন্তু এ সাধারণ ব্যাখ্যা ছাড়া গভীরতর একটা তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য: শুধু একজন মানুষের আত্মতৃপ্তির জন্য ঈশ্বর আপন বাণী-যীশুকে মানুষের কাছে দান করেন না, অর্থাৎ যখন আমরা যীশুকে জগৎত্রাতা বলে অবগত হয়ে গ্রহণ করি, তখন সেই কথা প্রচারের দায়িত্বও আমাদের দেওয়া হয়। উভয় ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়েও যোহনের আসল মনের উপর আলোকপাত করে না। বাস্তবিকই তিনি এমন প্রৈরিতিক অধিকার নির্দেশ করতে অভিপ্রেত, যে অধিকার একদিন যীশুর বারোজন প্রেরিতদূতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং এখন তাঁদের প্রকৃত উত্তরসূরী সেই বিশপগণের বাণীঘোষণাকে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিষ্ঠা করে: এ জগতে জীবনযাত্রাকালে যীশু প্রেরিতদূতগণের কাছে কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঐশগৌরবে ভূষিত হয়ে স্বর্গধামে থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনও তাঁর মণ্ডলীর কাছে, বিশেষত প্রেরিতদূতগণের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের কাছেই আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই যীশু বর্তমানকালে কথা বলেন একথা যোহন নিজে দৃঢ়রূপে

সমর্থন করেন, কিন্তু একথাও তিনি দৃঢ়তরভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁর নিজের কাছে এবং তাঁর নিযুক্ত শিষ্যদের কাছেই পবিত্র আত্মা যীশুর সকল কথা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা যেন সমগ্র বিশ্বাসীমণ্ডলীর কাছে সেই কথাগুলো উপযুক্তভাবে প্রচার করেন (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৬:১৩,২৫ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এ প্রসঙ্গে দু'টো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যস্থতা ছাড়া কেউই যীশুর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সদস্য হতে হলে প্রৈরিতিক অধিকারের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে সহভাগিতা রাখা অপরিহার্য শর্ত। এ দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যোহনের পরবর্তী কথা দ্বারা জোর দিয়েই প্রতিপন্ন করা হয়।

১:৩গ—তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার: প্রেরিতদূতগণের ও সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে জীবন-সহভাগিতা, অর্থাৎ প্রৈরিতিক প্রচার দ্বারা সৃষ্ট একই-বিশ্বাসের বন্ধন-ই বাণী-প্রচারের এবং ফলত এ পত্রটির উদ্দেশ্য। যোহনের একথা পাঠ করে আমরা যে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ব তা স্বাভাবিক। বস্তুত আমরা সম্ভবত মনে করতাম, যে উদ্দেশ্যে যোহন যীশুকে প্রচার করেন তা হল যেন যীশুরই সঙ্গে আমরা জীবন-সহভাগিতা লাভ করি; কিন্তু এরূপ ধারণা সঠিক নয়। যীশুর কথা প্রচার করার উদ্দেশ্য হল শ্রোতাদের ও প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা, কারণ প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঐক্য ও জীবন-সহভাগিতার মাধ্যমেই পিতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করা যেতে পারে। যেমন যীশুর মধ্যস্থতা অস্বীকার করলে আমরা পিতার কাছে যেতে অক্ষম, তেমনিভাবে বর্তমানকালের প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন বিশপগণের মধ্যস্থতা বা তাঁদের সঙ্গে সহভাগিতা অস্বীকার করলে আমরা পুত্রের কাছে যেতে অক্ষম। পত্রটির একথা অবশ্যই চতুর্থ সুসমাচারের বিরোধী কথা নয়, যে কথা অনুসারে পুত্রের সঙ্গে যে সংযুক্ত থাকে সে-ই পিতাকে লাভ করেছে (১০:৩০; ১৪:৯)। তবুও পত্রটি দৃঢ়তার সঙ্গে দেখাতে চায়, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা খ্রীষ্টসম্পর্কিত কাল্পনিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না, বরং যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত সাক্ষীগণের সঙ্গে ও তাঁদের আত্মিক উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায় বাস্তব, কার্যকারী ও জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং ফলত খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে যাপিত জীবনে প্রমাণিত। একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনুমান করা যায়, বর্তমানকালের মত যোহনের সময়েও খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে এমন ব্যক্তিদের দেখা দিত যারা যোহন ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সহভাগিতা স্বীকার না করে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন-সহভাগিতা লাভ করবে বলে দাবি করত। কিন্তু যেমনটি দেখেছি, পবিত্র বাইবেল এ ধরনের কথা আদৌ সমর্থন করে না। মহাপ্রাণ বিড্-এর কথায়, 'যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করতে ইচ্ছা করে সে প্রথমে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সহভাগিতায় যোগদান করুক।' যোহনের একথা থেকে আর একটা ধারণা অনুমেয়, তথা: খ্রীষ্টমণ্ডলী এমন জনমণ্ডলী হওয়ার কথা নয়, যা যে কোন একটা ধর্মীয় আন্দোলন বা সংঘের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, বরং সর্বদাই সচেতন হবে সে সক্রিয় ও জীবন্তই মণ্ডলী, এমনকি সর্বদা সচেতন হবে সে হল সেই স্থানটি যেখানে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা দান করা হয়, এবং অনুপ্রেরণার সঙ্গে সচেষ্ট থাকবে যত মানুষকে আপন বুকে টানার জন্য তাদের কাছে যেন পিতা ও পুত্রকে দান করতে পারে। বিশেষত বিশপগণের পক্ষে ও তাঁদের সহকারী বাণীপ্রচারকদের পক্ষে নিজেদের পরিচয় ও ভূমিকা বিষয়ে সর্বদা সচেতন হওয়া উচিত; তাঁরা পদাধিকারবলে নয়, শাসনমূলক মনোভাব নিয়েও নয়, বরং পবিত্র আত্মার বিশেষ প্রাপ্তির সচেতনতায় ও তাঁর শক্তিতে খ্রীষ্টবিশ্বাসের সঠিক সংজ্ঞা ও প্রেরিতদূতগণের পরম্পরাগত শিক্ষা রক্ষা ও ব্যাখ্যা করার জন্য চিরপ্রবৃত্ত থাকবেন। তাঁদের বাণীপ্রচার-সেবাকর্মের মাধ্যমেই 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্য (যোহন

১:১৪) এখনও জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁদের বাণীপ্রচারের মাধ্যমেই মাংসে আগত সেই সনাতন ঐশবাণী মানুষের কাছে এখনও ঐশজীবনকে প্রকাশ ও প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে 'জীবন-সহভাগিতা' শব্দ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। শুধু এ প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও শব্দটি পরোক্ষভাবে অন্যান্য শব্দের মাধ্যমে সমগ্র পত্রটিতে বিরাজ করে। 'জীবন-সহভাগিতা'র নামান্তর হল 'ঈশ্বরে স্থিতমূল থাকা', 'আমাদের অন্তরে ঈশ্বর', ঈশ্বরে আমরা' ইত্যাদি শব্দগুলি। পত্রটি শেষে (৫:১৩) স্পষ্ট বলে, খ্রীষ্টবিশ্বাসী পাঠকগণের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতালাভের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া প্রয়োজন নেই, কারণ তারা ইতিমধ্যেই সেই জীবন-সহভাগিতা প্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি একথা বলা চলে, পত্রটির প্রধান উদ্দেশ্যই যেন এখন থেকেই প্রাপ্ত এ সহভাগিতাকে আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু, 'সহভাগিতা' বলতে মরমিয়া ঐশদর্শনলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোঝায় না, বরং এমন নৈতিক আচরণ নির্দেশ করে যা ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালনে স্থাপিত। সুতরাং ঈশ্বরের ও ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস্তব জীবন-সহভাগিতা এবং একাত্মতার একটা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এক জিনিস নয়, বরং যখন আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি এবং বিশেষভাবে ভ্রাতৃপ্রেম-আজ্ঞাই পালন করি তখন আমাদের জীবনাচরণ-ই সেই জীবন-সহভাগিতার উত্তম প্রকাশ হয়ে ওঠে।

১:৪—আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়: পিতা ও পুত্র ও প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাকে ছাড়া ঐশবাণী খ্রীষ্টমণ্ডলীর আনন্দকেও প্রতিষ্ঠা করেন। যোহনের ধারণায় আনন্দ একটা আশীর্বাদ নয়, সুভেচ্ছাও নয়, বরং দিব্য একটি দান। আনন্দ হল সেই চরম পরিত্রাণ যা পিতার সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতায় ইতিমধ্যেই সিদ্ধি লাভ করেছে। চতুর্থ সুসমাচারের 'বিদায়ের উপদেশগুলিতে' যীশু বলেন, 'আমার আনন্দ যেন তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়' এবং এ আনন্দকে এমন একটি দান বলে উপস্থাপন করেন যা 'কেউই তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না'; অবশেষে তিনি বলেন, সেই আনন্দ আমাদের যাচনার ফল (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৫:১১; ১৬:২২,২৪; ১৭:১৩ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং খ্রীষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যীশুর মাধ্যমে সে এ বর্তমান জগৎ থেকে মুক্ত এবং এখন থেকেও সে ঈশ্বরের জীবনে সঞ্জীবিত হচ্ছে, এজন্য সে আনন্দ করে। তবু একথা স্মরণযোগ্য, আনন্দ কারও ব্যক্তিগত একটা সম্পদ নয়, বরং সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর সহভাগিতার ফল, যে খ্রীষ্টমণ্ডলী ঐশবাণী শ্রবণে ও পালনে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের দেওয়া অন্যান্য দানের মত, আনন্দকেও সংরক্ষিত করতে হয়; আনন্দকে পেয়েছি বটে, অথচ আমাদের পাপাচরণে সেই আনন্দ ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু ঐশআজ্ঞাবলি পালনে এবং সকলের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রেখে পবিত্র জীবন যাপনে অধিক গভীরতর আনন্দ অনুভব করব। তেমন পূর্ণ আনন্দ অনুভব করা আমাদেরই দায়িত্ব, একথা পত্রটির লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমেয়: যখন তিনি এবং অন্যান্য বিশ্বাসীরা এক হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত জীবন-সহভাগিতা অনুভব করেন, তখনই তাঁর আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ সংযোগের অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে।

যোহনের 'মুখবন্ধের' বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেষ করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে এর সারমর্ম পুনরুত্থাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। সর্বপ্রথমে এমন বাস্তব ও ব্যবহারিক ভাব লক্ষণীয় যা পত্রটির অবশিষ্টাংশে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ব্যাখ্যা সূচনায়ও বলেছিলাম, চতুর্থ সুসমাচারের লক্ষ্য ছিল যীশুকেই উপস্থাপন করা, কিন্তু পত্রটির মধ্য দিয়ে যোহন যারা যীশুকে অনুসরণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদেরই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করেন। সুতরাং চতুর্থ সুসমাচার এবং পত্রটি পরস্পরের প্রতিমুখী ও পরিপূরক: পত্রটির সাহায্যে আমরা সুসমাচারের কথা বাস্তবায়িত

করার জন্য উপকৃত এবং অপর দিকে সুসমাচার পত্রটির প্রত্যাশিত জীবনাচরণকে প্রতিষ্ঠা করে। একটা তালিকার মাধ্যমে 'মুখবন্ধ'টির মর্মকথা এভাবেই উপস্থাপন করা যেতে পারে:

ক। জীবন-বাণী সেই স্বর্গীয় গৌরবান্বিত যীশু পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ প্রেরিতদূতগণ ও তাঁদের আত্মিক উত্তরসূরী সেই বিশপগণের মধ্য দিয়ে নিজেকে অনুসরণের জন্য এখনও সকল মানুষকে আহ্বান করেন; এজন্য তাঁর সাক্ষীগণ ও তাঁদের উত্তরসূরী বিশপগণ ঐশবাণী-যীশুকে এখনও ও চিরকাল ধরে প্রচার করতে থাকবেন।

খ। শ্রোতারা প্রচারিত ঐশবাণী-যীশুকে গ্রহণ করবে।

গ। ঐশবাণী-যীশুগ্রহণ সাক্ষীগণের ও শ্রোতাদের মধ্যকার জীবন-সহভাগিতায় এবং ফলত পিতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায়ও বাস্তবায়িত; ঐশআজ্ঞাবলি অর্থাৎ ঐশবাণী পালনেই সেই জীবন-সহভাগিতার প্রকাশ।

ঘ। যারা তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায় স্থিতমূল থাকে, অর্থাৎ যারা সাক্ষীগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের পরিচালনায় ঐশবাণীকে পালন করে, ঈশ্বর তাদের কাছে পূর্ণ আনন্দ দান করেন।

সুতরাং বিশ্বাসীরা নিজেদের মধ্যে জীবন-সহভাগিতা সৃষ্টি করে এমন নয়, বরং সেই জীবন-সহভাগিতা ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত, ঐশবাণী গ্রহণে তাঁর কাছ থেকে উদ্গত এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীতে যোগদানে প্রাপ্য।

ঈশ্বর আলো

(১:৫–২:২৯)

মুখবন্ধের মধ্য দিয়ে যোহন যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত সাক্ষীগণের সঙ্গে অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশপগণ ও তাঁদের সহকারী বাণীপ্রচারকদের সঙ্গে শ্রোতাদের জীবন-সহভাগিতা প্রতিষ্ঠা করতে অভিপ্রেত হয়েছিলেন, কারণ শুধু সেই সাক্ষীগণের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রাখলেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা অর্জনীয়। এ মূল উদ্দেশ্য বিবিধরূপে সুস্পষ্ট ও প্রতিপন্ন করাই পত্রটির পরবর্তী অংশগুলির আলোচ্য বিষয়।

প্রথম অংশে (১:৫–২:২৯) তিনি 'ঈশ্বর আলো' দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে তাঁর স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর সমস্যাগুলি সমাধান করতে চেষ্টা করেন: ঈশ্বর আলো বিধায় আলোর সন্তানরূপে যে আলোতে চলে (১:৫-৭) সে-ই প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসী। আলোর যে সন্তান সে অন্ধকারময় জগৎ ও পাপের সঙ্গে মিল রাখতে পারে না, কারণ অন্ধকার ও আলো মূলত বিপরীত ও প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু (১:৮–২:২)। আমরা যে আলোতে চলি তা আজ্ঞাবলি পালন (২:৩-১১), সংসার ত্যাগ (২:১২-১৭) ও খ্রীষ্টবৈরী থেকে দূরে থাকায় (২:১৮-২৯) প্রমাণিত। খ্রীষ্টমণ্ডলীকে আপন শক্তি বিষয়ে সচেতন হতে হয়, কারণ যীশুখ্রীষ্ট নিজ মৃত্যু দ্বারা তাকে পাপ থেকে মুক্ত করেন (২:২), নিজ বাণী দ্বারা তাকে প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধিতে প্রবিষ্ট করেন (২:১৪) অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই আলোময় পথ নির্দেশ করেন যা তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায় পৌঁছায় এবং পবিত্র আত্মা লাভে তাকে বলিষ্ঠ ও স্বনির্ভরশীল করে তোলেন (২:২২,২৭)।

আলোতে আচরণ (১:৫-৭)

যোহনের স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী দুরবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল তার মধ্যে ভুলভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল বলে। উত্তম পালকরূপে যোহন এ দুরবস্থা নিঃশেষ করতে অভিপ্রেত। বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানদের সেই ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর পদ্ধতি এরূপ: ভ্রান্তমতপন্থীদের একটি কথামাত্র উল্লেখ না করে তিনি সেই বাস্তবতা তাদের স্মরণ করান যে বাস্তবতায় তারা ইতিমধ্যেই জীবনযাপন করছে তথা, ঈশ্বর আলো; ঈশ্বরের সন্তান বলে আমরা আলোর সন্তান; সুতরাং আমাদের আলোতে চলতে হয়।

১ ৫ আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ:
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
৬ আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
৭ কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি!—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত
সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

১:৫ক,খ—আর যে সংবাদ ···: যোহন যা বলতে উদ্যত হচ্ছেন তা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নিজ থেকে কিছু না বলে প্রভু যীশুরই কাছে যা প্রত্যক্ষভাবে শুনেছিলেন তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এভাবে তাঁর সেই প্রৈরিতিক অধিকার প্রতিপন্ন করেন যার বলে তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে একতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন বলে দাবি

করেন। যীশুর ‘সংবাদের’ উল্লেখে যোহনের লেখার পদ্ধতি নতুন একটা দিক অবলম্বন করে: পূর্ববর্তী পদগুলিতে (১:১-৪) যোহনই যীশুর কথা প্রচার করেছিলেন অর্থাৎ যীশু ছিলেন প্রচারের বস্তু, পক্ষান্তরে এ পদটিতে যীশু নিজেই যোহনের মাধ্যমে সংবাদের প্রচারক। যেহেতু যীশু ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য মানুষ হয়েছিলেন, এমনকি অনাদি অনন্ত ঐশবাণী বলে তিনি স্বয়ং ছিলেন ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, এজন্য অনুমান করব, এ পদটিতে তাঁর প্রচারিত সংবাদ অনন্তকালব্যাপী সকল শ্রোতাদের জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। একাধারে আমরা যোহন-রচিত সুসমাচার পুনঃপাঠ করতে আমন্ত্রিত, কারণ সেইখানে যীশুর ‘সংবাদ’ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ।

১:৫গ—ঈশ্বর আলো: যোহন-রচিত সুসমাচার প্রায় কুড়ি বার করে যীশুকে আলো বলে উপস্থাপন করে: যীশুই জগৎকে জীবন দান করার জন্য ঈশ্বর থেকে উদ্গত আলো, কিন্তু জগৎ তাঁকে চিনল না এবং অন্ধকার তাঁকে গ্রহণ করল না (যোহন ১:৪,৫,৯,১০)। যারা তাঁকে গ্রহণ করল তারা শিষ্যরূপে যীশুকে অনুসরণ করে তাঁর আলোতে নিজেদের উদ্ভাসিত হতে দিয়ে প্রতিপন্ন করল, সত্যই যীশু জগতের আলো (যোহন ৮:১২)। ‘আলো যীশু’ পিতার প্রতিচ্ছবি হওয়াতে সহজে অনুমান করা যায় ঈশ্বরও আলো। বলা বাহুল্য যে, যখন আমরা বলি ‘ঈশ্বর আলো’ তখন আমরা ঈশ্বরের স্বরূপের কোনো সংজ্ঞা আদৌ নিরূপণ করতে চাই না, কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ মানুষের পক্ষে অনির্বচনীয় এবং স্রষ্টা ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সমান করা যায় না। বরং এ ধারণাই ব্যক্ত করতে চাই, ঈশ্বর মানুষের কাছে আলো দান করেন। কাজ করার জন্য মানুষের পক্ষে আলো যেমন প্রয়োজন তেমনি সদাচরণের জন্য তার কাছে ঈশ্বরের একান্ত প্রয়োজন। বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধি এবং অন্যান্য ধর্মও ঈশ্বর সম্পর্কে আলো শব্দটা ব্যবহার করে, কারণ—যেমন চলেছি—আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা শেখায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জীবনযাত্রার পথের অনুসন্ধান পাবার জন্য আলো বাস্তবিকই দরকার। তাছাড়া ধর্মগত ভাষায় ‘আলো’ শব্দ ‘জীবন’ শব্দের সঙ্গে সর্বদাই জড়িত: আলো হল ঈশ্বরের জীবন এবং আলো প্রত্যক্ষ করাই মানে তাঁর জীবনের সহভাগী হওয়া। ফলত আলোর বিপরীত সেই অন্ধকার সর্বদাই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। এর প্রমাণস্বরূপ ভারতীয় ঐতিহ্যের বিখ্যাত একটি সূত্র উল্লেখযোগ্য; প্রমাণিত হবে ‘আলো’, ‘জীবন’ এবং ‘সৎ’ একই অর্থ বহন করে এবং ‘অন্ধকার’, ‘মৃত্যু’ এবং ‘অসৎ’ তার বিপরীত অর্থ বহন করে:

অসৎ হতে আমাকে সৎ-এ নিয়ে যাও,
অন্ধকার হতে আমাকে আলোতে নিয়ে যাও,
মৃত্যু হতে আমাকে জীবনে নিয়ে যাও।

সুতরাং ‘ঈশ্বর আলো’ উক্তি অনুসারে ‘আলো’ শব্দ ঈশ্বরকে নির্দেশ করে এবং চরম পরিত্রাণ বা অনন্ত জীবনকে নির্দেশ করে যার উৎস হলেন ঈশ্বর: ঈশ্বর আলো দান করেন, অর্থাৎ চরম পরিত্রাণ বা অনন্ত জীবন দান করেন (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১:৪ ··· এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু তবুও আমাদের ঈশ্বর অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বরের মত নন; তিনি কোন এক প্রকারে স্বর্গ থেকে আলো দান করে স্বর্গধামেই বসে থাকেন এমন নয়, বরং আমাদের মাঝে তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করাতেই আলো দান করলেন: যীশুই সেই আলো দেখবার চোখ আমাদের দান করেন, যীশুই তাঁর অনুসরণকারীদের সেই আলো দান করেন। বস্তুত ‘আলো ঈশ্বর’ এ জগতে তাঁর পুত্রকে জীবনের আলো বলেই প্রেরণ করলেন আমরা সবাই যেন চরম পরিত্রাণ বা অনন্ত জীবন, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করতে পারি। এমনকি মথি ও লুক-রচিত সুসমাচার থেকে আমরা অবগত আছি, ‘আলো যীশুর’ অনুসরণে আমরাও আলো হয়ে উঠি (মথি ৫:১৪; লুক ১১:৩৬):

তোমরা জগতের আলো …।
লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না,
দীপাধারের উপরেই রাখে ;
তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে।

যীশুকে অনুসরণ করে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা পাবার জন্য আলো পাই এবং এ গুরু দায়িত্বও পাই, পরের জন্য আমাদের আলো হতে হয় অর্থাৎ প্রতিবেশীর কাছে নিজেদের দান করে সেই 'আলো ঈশ্বরকেই' দান করি।

বিশেষত যোহন-রচনাবলি দ্বারাই আপন ঐশতত্ত্ব-গবেষণা অনুপ্রাণিত বলে মধ্যপ্রাচ্য খ্রীষ্টমণ্ডলী 'আলো' ধারণা গভীরতমভাবে অনুধাবন করেছে। আলো বিষয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘ ধ্যানের ফলে তারা 'মানুষের ঈশ্বরত্বগ্রহণ' ধারণা ফুটিয়ে তুলেছে। এ ধারণা অনুসারে এ জীবনকাল থেকেও আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাত্মতায় মিলিত আছি, এখন থেকেও আমরা ঐশশক্তিগুলি ও ঐশআলো দ্বারা অধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হচ্ছি, যার ফলে আমরা 'আলোবাহক' হয়ে উঠি; বিশেষভাবে মরণকালেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হয় বিধায় মানুষ তাঁর দিব্য আলোতে সর্বাঙ্গীন জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে; এ কারণে সাধুসাধ্বীর মৃত্যুলগ্ন অঙ্কন করতে গিয়ে তারা তাঁদের মুখমণ্ডল আলোময় করে তোলে। উপরন্তু তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য আলোর কথা যথেষ্ট গুণকীর্তন করেছে; কয়েকটা বন্দনা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। প্রত্যহ সন্ধ্যারতি উপাসনাকালে প্রদীপ জ্বালাবার সময়ে তারা এ 'জ্যোতি বন্দনা' গান করে :

আনন্দের জ্যোতি! অমর স্বর্গীয় পিতার
পরম গৌরবের আনন্দের জ্যোতি।
যীশু জ্যোতি ধন্য হে, জ্যোতি যীশু ধন্য হে।
আনন্দের জ্যোতি! সূর্য অস্ত গমন করল,
এসো, সান্ধ্য দীপ জ্বালিয়ে
সবে মিলে করি পূজা।
ঈশ্বরপুত্র, জীবনদাতা, বিশ্বপতি, পরিত্রাতা,
সবে বলে, ধন্য হে। আনন্দের জ্যোতি …

দশম শতাব্দীর নব-ঐশতত্ত্ববিদ সাধু সিমেয়োন 'ঈশ্বর আলো' বাক্যটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে এমন জীবন-সহভাগিতায় সংযুক্ত হন, যার ফলে মানুষ ঐশআলোর সঙ্গে একই আলোতে রূপান্তরিত হয় :

উপদেশ ২৫: ঈশ্বর আলো, আর যারা তাঁর সঙ্গে সংযোগপ্রাপ্ত, তাদের পবিত্রতা অনুসারে তিনি আমাদের দান করেন তাঁর নিজের উজ্জ্বলতা। যখন আত্মার প্রদীপ অর্থাৎ মন প্রজ্বলিত হয়, তখন সে অনুভব করে দিব্যই আগুন তাকে ধারণ ও প্রজ্বলিত করেছে। আহা, কি মহা বিস্ময়ের কথা! মানুষ দেহে ও আত্মায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত (…)। ঈশ্বরত্বে গৃহীত হয়ে মানুষ পরম আত্মার সহভাগী (…)।

আবার তিনি এ সুন্দর বন্দনা রচনা করেছেন :

বন্দনা ২৫: আহা, আলোর কি প্রমত্ততা! অগ্নির কি লীলা
আহা, তোমা থেকে, তোমার মহিমা থেকে আসছে
অগ্নিশিখার কি ঘূর্ণিপাক আমার অন্তরে,
—আমি যে নশ্বর!
আমি তোমার আরাধনায় পড়ি তোমার চরণে।
ধন্য তুমি, ধন্য! তুমি যে তোমার ঈশ্বরত্বের গরিমার আভাস

—একটি আভাস মাত্রই—পাবার যোগ্য আমাকে করে তুলেছে।
তুমি ধন্য! অন্ধকারে যখন বসে ছিলাম আমি
তোমার তখন হয়েছে আবির্ভাব,
তোমার আলোতে আমাকে করেছ প্রকাশ।
তুমি ধন্য! সবার পক্ষে অসহ্য তোমার মুখমণ্ডলের আলো
দর্শন করার আমাকে দিয়েছ প্রসাদ।
আমি জানি, অন্ধকারের মাঝে বসে রইলাম আমি,
আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও, আলোরূপে তোমার হয়েছে উদ্ভাস।
তোমার পূর্ণ আলোতে আলোময় হয়ে উঠলাম,
নিশিতে আলো হয়ে উঠলাম আমি,
সেই আমি যে অন্ধকারেই আচ্ছাদিত ছিলাম।
আলোতেই আমি এখন, অথচ অন্ধকারেও আছি;
অন্ধকারেই আমি এখন, অথচ আলোতেও আছি!
কি করে অন্ধকার নিজের মধ্যে আলো গ্রহণ করতে পারে,
এবং আলো দ্বারা বিদূরিত না হয়ে
সেই আলোর মধ্যে অন্ধকারই হয়ে থাকতে পারে?
আহা, কি মহা বিস্ময়ের কথা!

অন্যত্র সাধু সিমেয়োন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অন্তরে জাজ্বল্যমান সেই অধ্যাত্ম আলোর কথা ব্যাখ্যা করেন, যে আলোতে আমরা আমাদের অন্তরে অবস্থানকারী যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ঐক্য ধ্যান করি:

উপদেশ ২৮: আমাদের উপর সেই আলোর উদ্ভাস;
তার অন্ত সেই, পরিবর্তন সেই, রূপান্তর নেই, রূপ নেই।
সেই আলো বাক্‌শক্তিমণ্ডিত, কার্যকারী, জীবন্ত, জীবনদায়ী,
আর যাদের উদ্ভাসিত করে তাদের আলোতে রূপান্তরিত করে।
আমরা স্বীকার করি, 'ঈশ্বর আলো',
আর তাঁর দর্শন পেতে যাদের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে
তারা সবাই তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছে।
যারা তাঁকে দেখতে পেয়েছে
তারা তাঁকে আলো বলে গ্রহণ করেছে,
কারণ তাঁর গৌরবের আলো তাঁর আগে আগে চলে
এবং বিনা আলোতে আবির্ভূত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।
যারা তাঁর আলো দেখেনি
তারা তাঁকেই দেখেনি, কারণ তিনিই আলো,
আর যারা সেই আলো পায়নি তারা এখনও তাঁর অনুগ্রহ পায়নি।
যারা তাঁর অনুগ্রহ পেয়েছে তারা ঈশ্বরের আলো পেয়েছে
এবং ঈশ্বরকে এমনকি স্বয়ং আলো খ্রীষ্টকেই পেয়েছে
যিনি বলেছিলেন,
আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব,
তাদের মধ্যে গমনাগমন করব।

সাধু সিমেয়োনের উপস্থাপিত ধারণা অনুসারে একথা বলতে পারি: আলো যীশু, আলো পিতা ও আলো পবিত্র আত্মা, অর্থাৎ আলো-ত্রিত্ব প্রতিটি বিশ্বাসীর অন্তরে বসবাস ক'রে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে 'আলোসঞ্জাত

আলো ও প্রকৃত ঈশ্বরসঞ্জাত প্রকৃত ঈশ্বর' গড়ে তোলেন। ঈশ্বরে মানুষে এ মিলন 'মহা বিস্ময়ের কথা', এমন রহস্য যা মানুষের বোধের অতীত হলেও আমাদের বাস্তব জীবনাচরণে প্রকাশ করা চাই। সাধু পলের সঙ্গে তিনি আমাদের অবিরত একথা স্মরণ করান, 'ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন (এফে ৫:১৪)।'

এ গুরুত্বপূর্ণ পদের ঐশতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, 'ঈশ্বর আলো' উক্তির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি মানুষের পক্ষে ঈশ্বর কী, অর্থাৎ: প্রথমত, ঈশ্বরের আলোতে আমরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব আমাদের পক্ষে ঈশ্বর কী, আমরাই বা কী এবং প্রতিবেশীই বা কী। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের জীবন-আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে, অর্থাৎ এবিষয়ে সচেতন হয়ে যে আমরা তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ আমরা আপনাতেই তাঁর সাক্ষী হয়ে দাঁড়াব, আমাদের কথাগুলো ও জীবনাচরণ এমনভাবে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠবে যে, আধারে স্থাপিত প্রদীপের মত ঐশআলোর স্বয়ং উৎস সেই ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্য দান না করে পারবে না: তা বাস্তবায়িত হবে বিশেষত প্রেমাজ্ঞা পালনেই, যেইভাবে যীশু আপন মৃত্যু দ্বারাই উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, 'ঈশ্বর আলো' উক্তির গভীর ও যথাযথ উপলব্ধি তদানুরূপ গভীর ও যথাযথ ঈশ্বরোপলব্ধি লাভের জন্য সত্যিকারে উপকারী; এমনকি সেই উক্তির গভীর উপলব্ধির আলোতে আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের অপূর্ব একটা দিক প্রতিফলিত হয় তথা আমাদের জীবন হল স্বয়ং ঈশ্বরেরই জীবনে অংশগ্রহণ বা সহভাগিতা এবং ফলত আমাদের অন্তরে অবস্থানকারী ত্রিত্বের জীবনের উজ্জ্বলতম একটি সাক্ষ্য: যীশুকে জেনে ও প্রেমাজ্ঞা পালনে, অর্থাৎ পরের জন্য প্রাণবিসর্জনে আমরা এখন থেকেও এজগতে অন্ধকারবিজয়ী আলো দ্বারা ও অমর জীবন দ্বারা সঞ্জীবিত।

অবশেষে সেই বাহ্যিক কারণ দু'টোও উল্লেখযোগ্য যেগুলো সম্ভবত যোহনকে 'আলো' ধারণা ব্যবহার করার জন্য প্রভাবিত করেছিল। প্রথম কারণটা এই, যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীতে নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকে কুম্রান সম্প্রদায়ের প্রাক্তন সভ্য ছিল। জানা কথা, কুম্রান সম্প্রদায় 'আলো ঈশ্বর' ও 'আলোর সন্তান' ধারণা দু'টোর উপর বিশেষ জোর দিত। একথা 'যোহন-রচিত সুসমাচার' ব্যাখ্যায় বারবার উপস্থাপিত ধারণাকে প্রতিপন্ন করে তথা, যারা এখনও যীশুকে গ্রহণ করেনি তাদের আধ্যাত্মিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য যোহন খুবই চিন্তান্বিত; তিনি তাদের ধর্মীয় বা দার্শনিক ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করেন, এবং সেটার মধ্য দিয়ে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোর দিকে তাদের চালনা করতে চান যিনি জগতের আলো যীশুখ্রীষ্ট।

'আলো' ধারণা ব্যবহারে দ্বিতীয় একটি কারণ খুব সম্ভবত হয়েছিল 'দীক্ষাস্নান' অনুষ্ঠান ও ঐশসত্য: দীক্ষাস্নান গ্রহণে খ্রীষ্টবিশ্বাসী পাপের অন্ধকার থেকে ঈশ্বরের আলোতে গিয়ে পৌঁছয়। সেকালের দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান ঐশসত্যের মর্মের সঙ্গে অত্যন্ত জড়িত ছিল: অন্ধকারময় জলের মধ্যে ডুব দিয়ে দীক্ষাপ্রার্থী নদী বা পুকুর থেকে বের হয়ে যীশুখ্রীষ্টের আলোতে উদ্ভাসিত ছিল।

১:৬—আমরা যদি বলি যে ...: এ পদটি পূর্ববর্তী পদটিকে ব্যাখ্যা করে। যোহন বলতে চান, ঈশ্বরের জীবন-আলোতে সহভাগিতা মরমিয়া উত্তেজনাপূর্বক উচ্ছ্বাসে সঙ্কুচিত করতে সেই, বরং উত্তম নৈতিক আচরণে সিদ্ধিলাভ করে। যে আলো অর্থাৎ যে পরিত্রাণ আমাদের দেওয়া হয় তা আমাদের আয়ত্তাধীন চিরসম্পদ নয়, বরং এমন গতিশীল একটা বাস্তবতা যা আমাদের নৈতিক আচরণে প্রতিপন্ন এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় রূপায়িত, যার ফলে জীবনকালে আমরা সিদ্ধপুরুষ নয়, বরং পরমসিদ্ধি-পথের পথিক বলেই নিজেদের পরিগণিত করব। অন্য কথায়, যখন আমরা বলি 'ঈশ্বর আলো' তখন আমরা দিব্য দর্শনলাভে তাঁকে সাধারণ

একটা জিনিসের মত নিজস্ব সম্পদ বলে গণ্য করতে পারি এমন অর্থ সমর্থন করি না, বরং আমরা বুঝি, তিনি আমাদের ও মানবজাতির জীবনের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অংশ এবং 'আলো' বলে আত্মপ্রকাশ করার পর আমাদের কাছে সক্রিয় ও জীবন্ত সাড়া প্রত্যাশা করেন। দুঃখের কথা, অনেকেই কথায় ঈশ্বরকে জানে অথচ কাজের বেলায় পাপাচরণ করে। এদের কাছে যোহন স্পষ্ট বলেন, অন্ধকারে চলাতে অর্থাৎ পাপ করাতে তারা ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি-সহভাগিতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। বস্তুত আমরা অবগত আছি, বাইবেলের ভাষায় 'ঈশ্বরকে জানা' হল কাজকর্ম ও জীবনাচরণ ক্ষেত্রে মনে-প্রাণে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা ঐক্যস্থাপন। আমরা ঈশ্বরকে জানব তা নয়, তাঁর আলো দ্বারা নিজেদের উদ্ভাসিত হতে দেব এটিই আসল কথা; তাঁর দ্বারা নিজেদের জ্ঞাত অর্থাৎ তাঁর দ্বারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের মিলিত হতে দেব, আমরা যেন তাঁর আলো মিলন ভালবাসা ও সত্যে জীবনধারণ করতে পারি। এ পদের 'আমরা সত্যের সাধন নই' বাক্যটিও খ্রীষ্টীয় জীবনাচরণের গতিশীল দিক অপরিহার্য বলে প্রতিপন্ন করে। আলো ও ভালবাসার মত সত্য শব্দটাও ঈশ্বরকে নির্দেশ করে; এবং যেমন সত্যটি তখনই বাস্তব হয় যখন কথায় যা স্বীকার করেছি তা কাজেই সপ্রমাণ করি, তেমনি ঘটে ঈশ্বরের বেলায়: যাঁকে আমরা মুখে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি তাঁকে সদাচরণের মধ্য দিয়েও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু, যা সত্য বলে স্বীকার করি সেই সত্যের যদি সাধক না হই, তাহলে আমরা মিথ্যাবাদী, অন্ধকারেই চলি এবং আমাদের সমস্ত জীবন মায়াচ্ছন্ন ও ঐশপরিত্রাণ থেকে দূরবর্তী।

আমাদের সামনে পথ দু'টোই, কোন্‌টা ধরব তা আমাদের উপর নির্ভর করে; এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন সন্ধি (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৫-২০) একথা বলে,

> দেখ, আমি আজ জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল তোমার সামনে রাখলাম; কেননা আমি আজ তোমাকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে, তাঁর সমস্ত পথে চলতে এবং তাঁর আজ্ঞা, তাঁর বিধি ও তাঁর নিয়মনীতি পালন করতে আজ্ঞা দিচ্ছি, তবেই তুমি বাঁচবে, বৃদ্ধি লাভ করবে …। কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পিছনে ফেরে, (…) ও অন্য দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করতে ও তাদের সেবা করতে যদি নিজেকে পথভ্রষ্ট হতে দাও, তবে (…) তোমাদের বিনাশ নিশ্চিত হবে (…)।

সুতরাং যীশুর কথা শুনলে পর, তাঁকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা মানুষের উপর নির্ভর করে। তবু তাঁকে যে গ্রহণ করে তার পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতাকে শুধু কথায় প্রচার করা চলবে না, সত্যের সাধকই হওয়া দরকার অর্থাৎ মৃত্যু-অন্ধকারাচ্ছন্ন পাপাচরণ ত্যাগ করে সে যীশুর আজ্ঞাগুলি পালনে—বিশেষত প্রেমাজ্ঞা পালনে সেই যীশুখ্রীষ্টেরই অনুসরণে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত থাকবে যিনি জগতের আলো ও এই জীবন-আলো বিতরণকারী।

১:৭—যদি আলোতে চলি …: প্রকৃত খ্রীষ্টানের পথ মিথ্যাবাদীদের পথ থেকে ভিন্ন; খ্রীষ্টান আলোতে চলে, এমনকি জ্যোতির্লোকেই তার আবাস। অর্থাৎ সে 'আলো ও জীবন ঈশ্বরের' অনন্ত জীবনের সহভাগী, এবং তা প্রকাশ পায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সদাচরণের মধ্য দিয়ে। আমাদের নিত্যই সচেতন হতে হয়, খ্রীষ্টান বলে 'আলো ঈশ্বরের' আজ্ঞাবলি পালনেই ও ঐশআলোর জাজ্বল্যমান পথে 'আলো-যীশুর' অনুসরণেই আমরা ঐশআলোর বাহক, আলো-ঈশ্বরবহনকারী, আলো-যীশুখ্রীষ্টবহনকারী। বস্তুত ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা মরমিয়া বা অতীন্দ্রিয় ধরনের সহভাগিতা নয় বরং প্রতিবেশীর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায়ই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতার প্রকাশ। উপরন্তু ঐশআলোতে জীবনযাপন করা মানবীয় সাধ্যের অতীত, তা যীশুখ্রীষ্টের দেওয়া এমন অপূর্ব অনুগ্রহদান যা শুধু প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তরেই সাধনযোগ্য। মানুষ হিসাবে আমরা দুর্বল পাপীমাত্র; 'আলো ঈশ্বর' তাঁর নিজের আলো আমাদের দান করেন বিধায়ই আমরা তাঁর আলোতে উদ্ভাসিত এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মত জাজ্বল্যমান কাজকর্ম সাধন করতে সক্ষম হয়ে উঠি। যোহনের স্বকীয় ধারণা

অনুসারে, যে কোন সদাচরণ ঈশ্বরেই স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত: ঈশ্বরই আলো, এজন্যই আমরা আলোতে চলতে পারি; ঈশ্বরই ভালবাসা, এজন্যই আমরা ভালবাসতে পারি। সুতরাং যেমন ঈশ্বর থেকে দূরে থাকলে আমাদের আলোও নেই ভালবাসাও নেই, তেমনিভাবে ঈশ্বরও বিনা পরস্পর-সহভাগিতাও আমাদের নেই। তাছাড়া যেমন আলো ও ভালবাসার ভিত্তি স্বয়ং ঈশ্বর, তেমনি পরস্পরের মধ্যে আমাদের সহভাগিতার ভিত্তিও আমাদের মধ্যে নয়, ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সহভাগিতার ভিত্তি নিজেদের মধ্যেই স্থাপন করতে চাইলে, সেই সহভাগিতা কৃত্রিম, মুহূর্তমাত্রও টিকবে না, অকস্মাৎ ভেদাভেদ দেখা দেবে। বলা বাহুল্য, পরিবার বা পাড়া বা মহিলাসংঘ বা যুবসংঘ বা ধর্মপল্লী বা মঠ-আশ্রমে অশান্তির আবির্ভাবের মূল কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক এটিই, পারস্পরিক সম্পর্ক ঈশ্বরে নয়, নিজেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কি করে 'আলো ঈশ্বর' আমাদের আলো দান করেন, অর্থাৎ কি করে ঈশ্বর আমাদের পারস্পরিক জীবন-সহভাগিতা বা একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করেন, তা এ পদের তৃতীয় অংশে ব্যক্ত হয়: মানুষ হিসাবে আমরা পাপীমাত্র বলে ঈশ্বরকে পাবার জন্য নিজেদের পবিত্রীকৃত করতে হয়; কিন্তু এমন পবিত্রীকরণ প্রয়োজন যা শুধু নিজেদের তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্তের উপর নয়, যীশুখ্রীষ্টের উপরই নির্ভর করবে: কেবল সেই পুত্র যীশুই তাঁর রক্ত দ্বারাই পাপকর্ম থেকে আমাদের শুচি করতে সমর্থ। যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীতে এমন এক দল ভ্রান্তমতপন্থী বর্তমান ছিল যারা সমর্থন করত, যীশু তাদের পাপ সবসময়ের জন্য একবারই ক্ষমা করেছিলেন বিধায় তারা এখন নিষ্পাপ, বা প্রয়োজনবোধে তাদের নিজেদের প্রার্থনাই তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। এ ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গেই যোহন উঠে দাঁড়ান: যে বলে সে নিষ্পাপ বা মনে করে তার তপস্যা ও ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা সে শুচীকৃত, সে যীশুকে ও মাংসে তাঁর আগমনও অনর্থক করে ফেলে। যীশুখ্রীষ্টের রক্তসাধিত প্রায়শ্চিত্তই আমাদের পাপের একমাত্র উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত: ক্রুশের উপরে যীশুর পাতিত রক্ত দ্বারাই আমাদের পাপরাশি মোচন করা হল। তাঁর প্রেরিতজন যীশুর মধ্যস্থতায়ই যেমন ঈশ্বর আমাদের আলো ও ভালবাসা দান করেন তেমনি যিনি আমাদের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁরই রক্তপাত গুণেই ঈশ্বর আমাদের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেন। আর যারা নিজেদের অহঙ্কারজনিত নির্বুদ্ধিতায় থেকে মনে করে তারা আলোতেই আছে, তাদের প্রতিই উচ্চারিত হল সেই বাণী যা একদা যীশু ফরিসিদের উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করেছিলেন, "তোমরা যে বলছ, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি' (অর্থাৎ, আমরা আলোতে আছি, আমরা নিষ্পাপ), তোমাদের পাপ রয়ে গেছে" (যোহন ৯:৪১)।

উপসংহার স্বরূপ বলতে পারি, খ্রীষ্টান হিসাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধরনেরই মরমিয়া জীবন-সহভাগিতা লাভের প্রত্যাশা করতে পারি না, কারণ ঐশসহভাগিতা একে অপরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার প্রতিফল। আমাদের মধ্যে পাপ এখনও বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু এ পরম সত্যই স্মরণযোগ্য যে, যীশুখ্রীষ্টের রক্তসাধিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমরা উপকৃত: শয়তান যীশু দ্বারা পরাজিত হয়েছে, এটিই সেই দৃঢ় নিশ্চয়তা যা সকল ভাইবোনদের একতায় পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ জাজ্বল্যমান রাখতে আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে থাকবে; আর দৈবাৎ আমাদের পতন হলে তবে যেন স্মরণে রাখি, যীশুখ্রীষ্টের রক্ত আমাদের শুচি করে।

পাপাচরণ ত্যাগ (১:৮—২:২)

ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করতে হলে তাঁর আলোতে চলতে হবে, অর্থাৎ আমাদের সদাচরণকে ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাঁর আলোতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও মানবজাতির কল্যাণের জন্য আলো হয়ে উঠব।

‘আলো ঈশ্বরের’ মধ্যে যেমন অন্ধকারের লেশমাত্র নেই, তেমনি আমরা যারা তাঁর আলোতে আলো হয়ে চলতে চাই আমাদের মধ্যেও অন্ধকার স্থান পেতে পারে না, অর্থাৎ আমাদের পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে।

১ [৮] আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
[৯] আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি
—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
[১০] আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।
২ [১] বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন:
সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
[২] তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!

১:৮ক,খ—আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই …: যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীতে এমন কয়েকজন ছিল যারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত মনে করত; সম্ভবত এরা সেই জ্ঞানমার্গপন্থী ছিল যারা নিজেদের (পরিকল্পিত!) অধ্যাত্ম স্বরূপ গুণেই নিজেদের পরিত্রাণপ্রাপ্তি সমর্থন করত। তাদের ধারণায়, তাদের অন্তরে যা আধ্যাত্মিক তা যে কোন বাহ্যিক কাজকর্ম দ্বারা, এমনকি পাপজনক কাজকর্ম দ্বারাও কখনও বিলুপ্ত হবে না। এরূপ ধারণা সমর্থনে মানুষ ভুলভ্রান্তির মধ্যে বা—যোহনের ভাষায়—‘অন্ধকারের’ মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ মানুষ জগতের লোক হয়ে যায়, যে জগৎ ‘আলো ঈশ্বর’ থেকে উদ্গত পরিত্রাণদায়ী আলোকে পরিত্যাগ করে। যারা ভুলভ্রান্তির জালে পড়ে তারা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য ও বিদ্রোহী, জগতের অসৎ ও মায়ার অধীনস্থ এবং নিজেদেরই অস্বীকার করে: একমাত্র ‘সৎ ঈশ্বর’ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে তারা অসৎ-এর শাস্তি ভোগ করতে নিজেদের দণ্ডিত করে।

১:৮গ—আমাদের অন্তরে সত্য নেই: যোহনের ভাষায় ‘সত্য’ হল সেই পরিত্রাণদায়ী প্রত্যাদেশ (বা ঐশপ্রকাশ) যা যীশু এ জগতে এনেছিলেন (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ৮:৪০ … এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। পরিত্রাণ লাভের জন্য মানুষের পক্ষে সেই সত্য আপন করা একান্ত কর্তব্য। জীবন, বাণী, আত্মা ইত্যাদি যীশু-দেওয়া দানগুলির মত সত্যও এমন একটা বাস্তবতা ও ঐশশক্তি যা খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে অবস্থান করে সকল ধরনের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করে (যোহন ৪:১৪; ৮:৩২)। তাছাড়া যীশু নিজেকেই সত্য বলে ঘোষণা করলেন (যোহন ১৪:৬), ফলত ‘আমাদের মধ্যে সত্য নেই’ বলতে বোঝায় আমরা যীশুকে জানি না, তিনি আমাদের অন্তরে নেই এবং আমরা তাঁর ঐশপরিত্রাণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

১:৯ক—যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি …: ভ্রান্তমতপন্থী খ্রীষ্টানদের বৈষম্যে প্রকৃত খ্রীষ্টান ঈশ্বরকে ক্ষমাশীল ও করুণানিধান বলে জানে; সে যেমন যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে

(৪:২), তেমনি নিজের পাপকর্মও স্বীকার করে। প্রাক্তন সন্ধিতেও লেখা আছে, 'নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না; তা স্বীকার ক'রে যে ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে (প্রবচন ২৮:১৩)।' উপরন্তু যোহন অবশ্যই ঐকালেও প্রচলিত 'পাপস্বীকার' প্রথা নির্দেশ করেন (যাকোব ৫:১৬; বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষাবাণী ১৪:১), যা অনুসারে 'আমি পাপী' এ সাধারণ স্বীকৃতি ছাড়া খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামনে সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ পাপগুলি স্বীকার করা হত। বাস্তবিক, ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নিরপরাধী মনে করা সত্ত্বেও মানুষের প্রশংসার জন্য নিজেদের অপরাধী বলে স্বীকার করা যেমন অনর্থক, ঈশ্বরের সামনে নিজেদের অপরাধী বলে স্বীকার ক'রে মানুষের কাছে নিজ নিজ অপরাধ গোপন রাখাও তেমনি অসঙ্গত। এপ্রসঙ্গে সাধু আগস্তিন বলেন, "তুমি যে কি, তা মানুষকেও বল, ঈশ্বরকেও বল। ঈশ্বরের কাছে তা না বললে, তবে তিনি তোমাতে যা দেখতে পাবেন তার দণ্ড দেবেন। তিনি তোমার দণ্ড ঘোষণা করবেন না তুমি কি তা চাও? তবে নিজ থেকেই নিজেকে অভিযুক্ত কর। তুমি কি তাঁর ক্ষমা পেতে ইচ্ছা কর? নিজ অন্তরের দিকেই তাকাও, তুমি যেন ঈশ্বরকে বলতে পার, 'আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ, কারণ আমার অপরাধ আমি স্বীকার করি' (সাম ৫১:১১,৫)।"

উল্লিখিত ধারণা গ্রহণ না ক'রে সেকালেও ভ্রান্তমতপন্থী খ্রীষ্টানরা বলত, চিরকালের জন্যই শুচি হয়ে উঠেছে বিধায় তারা ঈশ্বরের আলোতে সর্বদাই অবস্থান করবে। অপরপক্ষে প্রকৃত খ্রীষ্টান বিশ্বাসের মাধ্যমে জানে সে এজগতে থাকাকালে সম্পূর্ণরূপে ঐশপরিত্রাণপ্রাপ্ত নয় এবং ঈশ্বরের সামনে সিদ্ধার্থ ব্যক্তির মত কখনও দাঁড়াতে পারে না, বরং জীবনযাত্রার পথিক হয়ে সে সবসময় ঐশক্ষমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, এবং এজন্য নিজ পাপগুলির অবিরত স্বীকার থেকে ভেসে উঠবে তার অবিরত ঐশক্ষমা প্রার্থনা এবং আলোতে চলবার ও সত্যে থাকবার অবিরত দৃঢ় সঙ্কল্প।

১:৯খ—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!: আমরা ঈশ্বরের ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারি কারণ তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্মময়। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত ও ধর্মময় স্বীকার করতে হলে তবে নিজেদেরই অবিশ্বস্ত ও পাপী স্বীকার করা প্রয়োজন, এমনকি নিজেদের পাপী স্বীকার করাতেই যীশুর সাধিত পরিত্রাণ কার্যকারী হয়ে ওঠে। 'বিশ্বস্ত' ও 'ধর্মময়', এ শব্দ দু'টো গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই এগুলির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি: প্রাক্তন সন্ধি নিয়ত বলে, ঈশ্বর ধর্মময় এবং আপন নির্দেশ ও সকল প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত। 'বিশ্বস্ত' শব্দটি যত বোধগম্য, 'ধর্মময়' শব্দটি তত সহজবোধ্য নয়। পবিত্র বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর এ অর্থেই ধর্মময় যে, তিনি করুণা ও দয়ারই বিচারে মানুষের অধর্ম আবৃত করতে সক্ষম। ধর্মময় বলেই তিনি মানুষের পাপ ক্ষমা করতে এবং পাপী মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও শুচি করে তুলতে সক্ষম। আমাদের প্রতি করুণা ও দয়া প্রকাশই হল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা ও আন্তর আকাঙ্ক্ষা, আর যেহেতু তাঁর এ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কখনও বাতিল হবে না এজন্যই আমরা বলি তিনি তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত। স্মরণযোগ্য যে ঈশ্বরের করুণা ও দয়ার বিচার ন্যায়বিচারের নামান্তর। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সন্ধির কয়েকটা বাণী উল্লেখযোগ্য: যখন মোশী ঈশ্বরের কাছে তাঁর গৌরব দেখবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, তখন তিনি এ বাণী বলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন (যাত্রা ৩৪:৬-৭),

প্রভু, প্রভু, স্নেহশীল, দয়াবান ঈশ্বর;
ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান।
তিনি সহস্র সহস্র পুরুষ ধরে কৃপা রক্ষা করেন;
অপরাধ, অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করেন

নবী ইসাইয়াকে মুখপাত্র করে (ইসা ১:১৮) ঈশ্বর এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,

এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—

সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে;
টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।

এবং নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে (যেরে ৩১:৩৪গ) তিনি আপন দয়া ও করুণা প্রকাশের ইচ্ছা অধিক স্পষ্টতরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন,

কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব,
তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।

প্রাক্তন সন্ধিকালে ঈশ্বরের সকল প্রতিশ্রুতি সেই যীশুখ্রীষ্টে সিদ্ধি লাভ করে গেছে যিনি আমাদের মত মানুষ হয়ে আমাদের পাপরাশির জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, যার জন্য আমরা যখন তাঁকে 'প্রভু' স্বীকার করি তখন তাঁকে 'দয়াময়' ও 'করুণানিধান'ও স্বীকার করি এবং একাধারে একথাও স্বীকার করি, আমরা পাপী।

১:১০ক,খ—আমরা যদি বলি পাপ করিনি ···: যে কেউ নিজেকে নিষ্পাপ বলে সে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনা, মাংসে ঐশবাণী-খ্রীষ্টের আগমন এবং যীশুর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু ব্যর্থ করে, এমনকি সে সত্যময় যীশুর স্থান দখল করবে বলে দাবি করে এবং ফলত সে নিজেকেই সত্যময় ও ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। কিন্তু, ঈশ্বর কি মিথ্যাবাদী হতে পারেন? এবং মানুষ কি সত্যময় হতে পারে? পবিত্র শাস্ত্র এর বিপরীত কথাই প্রচার করে, 'ঈশ্বর সত্যনিষ্ঠ, প্রতিটি মানুষ মিথ্যাচারী (রো ৩:৪)।' সুতরাং ঈশ্বরই নিজ থেকে সত্যবাদী ও সত্যময় আর আমরা ঈশ্বরের কৃপায়ই শুধু সত্যময়; নিজ থেকে আমরা মিথ্যাচারী। কাজেই যে কেউ নিজেকে নিষ্পাপ বলে সে সেই অহঙ্কারের বশে কথা বলে, যে অহঙ্কার আদমের সময় থেকে ঈশ্বরের স্থান দখল করতে এবং তাঁকে ধর্মময়, বিশ্বস্ত ও করুণাময় অস্বীকার করতে মানুষকে প্ররোচিত করে।

১:১০গ—তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই: উল্লিখিত কথা ছাড়া, যে কেউ নিজেকেই নিষ্পাপ বলে সে অস্বীকার করে যে, যে বাণী ঐশক্ষমা প্রতিশ্রুতি ও প্রদান করে সেই বাণী সত্যিকারে ঈশ্বরেরই বাণী। চতুর্থ সুসমাচার অনুসারে যীশু মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ঈশ্বরের বাণীই সত্য (যোহন ১৭:১৭), এবং যেহেতু 'সত্য' বলতে যীশুর প্রকাশিত ঐশবাস্তবতা বোঝায়, এজন্য অনুমান করতে পারি, ঈশ্বরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই যে তিনি মানুষের পাপ আপন বাণী অর্থাৎ যীশুর ঐশপ্রকাশের মাধ্যমে ক্ষমা করেন। আবার, চতুর্থ সুসমাচার থেকে আমরা এবিষয়ও অবগত, ঐশবাণীতে স্থিতমূল থাকলে তবে আমরা সে বাণী দ্বারা নিজেদের পাপী বলে অভিযুক্ত হতে দিই এবং কার্যত প্রতিশ্রুত ক্ষমা লাভ করি (যোহন ৮:৩১; সাম ৩২:১): যেমন যীশুর সময়ে অবিশ্বাসী ইহুদীরা নিজেদের ধার্মিক মনে করত বিধায় যীশুর বাণী দ্বারা নিজেদের পাপী বলে অভিযুক্ত হতে না দেওয়ায় তাঁর ক্ষমাদান ও তাঁকেও অগ্রাহ্য করেছিল, তেমনি বর্তমানকালে আমরাও যদি নিজেদের শুচি, সুস্থ ও ধার্মিক মনে করি তাহলে প্রমাণ করি ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রয়োজন সেই, সেই যীশুকে অগ্রাহ্য করি যিনি তাদেরই মঙ্গলের জন্য এসেছেন যারা নিজেদের অসুস্থ ও পাপী স্বীকার করে, ঘোষণা করি ঐশপরিত্রাণ আমাদের দরকার সেই এবং অবশেষে সেই জীবন থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি যে জীবন হল ঐশবাণীর মাধ্যমে ধর্মময় ঈশ্বরের সঙ্গে পাপী মানুষের মিলন-সংযোগ।

২:১ক—তোমরা যেন পাপ না কর: আমরা নিজেদের নিষ্পাপ মনে করব না, একথা ঠিক। আমরা নিজেদের সুস্থ ও ধার্মিক নয় বরং ঈশ্বরের করুণা ও যীশুর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর উপর নির্ভরশীল নিজেদের মনে করব একথাও ঠিক বটে, কিন্তু অনুমান করব না আমরা যত পাপ করি না কেন সেই পাপগুলি স্বীকার ক'রে আপনাতেই ঐশক্ষমা পাব, কেননা এরূপ মনোভাব পোষণ করলে তবে আমরা ঈশ্বরের করুণাকে পাপাচরণের

আহ্বানস্বরূপ ভুল বুঝব, ঈশ্বর কেমন যেন বলেন 'পাপ কর আর চিন্তা কর না' কারণ খ্রীষ্ট তোমার সকল পাপ থেকে তোমাকে শুচি করবেন।' অপরপক্ষে এটিই যোহনের ধারণা, 'তুমি যদি ঈশ্বরকে ক্ষমাকারী বলে জান এবং যীশুখ্রীষ্টকে তোমার পাপগুলির প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে মান, তাহলে তুমি পাপের প্রভাব বা আক্রমণ রোধ করতেও সক্ষম।' সুতরাং 'তোমরা যেন পাপ না কর' বলতে 'যীশুর সাধিত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন কর' বোঝায়। মানুষ হিসাবে আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে পাপের উপর বিজয়ী হতে পারব না, কিন্তু 'মৃত্যুজনক পাপ' ছাড়া (৫:১৬ ...) অন্যান্য দৈনন্দিন ছোটখাটো ও সাধারণ পাপগুলোর জন্য আমরা যেন নিরাশার মুখে না পড়ি, বরং সেগুলো স্মরণে আমরা যেন অবিরত নিজেদের দুর্বল ও পাপপ্রবণ মানুষ স্বীকার ক'রে ঈশ্বরের ক্ষমাদানেই পাই জীবন ও প্রেরণা অধিক পবিত্র খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করার জন্য।

২:১গ—পিতার কাছে ... সহায়ক একজন আছেন: ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে স্বর্গধামে ঈশ্বর যেন বিচারাসনে আসীন ছিলেন এবং এক দিকে দাঁড়াত অভিযোগকারী এক স্বর্গীয় প্রাণী যার নাম শয়তান (শয়তান-এর অর্থই অভিযোগকারী)। শয়তান নিয়তই ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচর করত মানুষের যত পাপ। অপর দিকে আব্রাহাম বা মোশী বা মিখায়েল ইত্যাদি মহামান্য কুলপতি বা স্বর্গদূতদের একজন সহায়ক বা উকিল পদে দাঁড়াতেন; এঁরা মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা বা ওকালতি করতেন, নিত্যই মানুষের জন্য ঐশক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এ ঐতিহ্য অবলম্বন করে যোহন বলেন, যদি একথা সত্য যে যখন আমরা পাপ করি তখন অভিযোগকারী শয়তান সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের মৃত্যুদণ্ড চায় (প্রত্যা ১২:১০), তবু একথাও সত্য যে আব্রাহাম ইত্যাদি ব্যক্তির চেয়ে এখন অধিকতর জোর দিয়ে আমাদের সহায়ক বা উকিল হয়ে উঠে দাঁড়ান স্বয়ং যীশু, এবং আমাদের পক্ষে যীশুর ওকালতি সর্বদাই জয়ী হবে, কারণ যীশুখ্রীষ্টই জগতের অধিপতি সেই শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে ফেলেছেন, এমনকি যেমন ঈশ্বর ধর্মময় তেমনি যীশুও ধর্মাত্মা, অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও যীশু উভয়েরই করুণাপ্রকাশে তাঁদের ঈশ্বরত্ব উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।

এখানে হয়ত কয়েকজন পাঠকের মনে এ প্রশ্নটির উদয় হয়: 'আমরা চতুর্থ সুসমাচার থেকে পবিত্র আত্মাকেই 'সহায়ক' জানলাম; এখন কি করে যীশুকেও 'সহায়ক' বলব?' এ প্রশ্নের উত্তরটিকে সুসমাচার নিজেই ব্যক্ত করে: যখন যীশু শিষ্যদের কাছে পবিত্র আত্মার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, 'আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন (যোহন ১৪:১৬)।' সুতরাং, আমাদের সহায়ক দু'জন আছেন: তাঁর জীবনকালে যীশু নিজেই ছিলেন শিষ্যদের সহায়ক এবং এখন স্বর্গে থেকে তিনি সকলেরই সহায়ক; দ্বিতীয় সহায়ক হলেন পবিত্র আত্মা, তিনি আমাদের জীবনকালে যীশুর বিষয়ে প্রকৃত সাক্ষ্য বহন করতে ও যীশুর সকল কথা স্মরণ করতে আমাদের সহায়তা করেন (যোহন ১৪:১৬,২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭)। উপসংহারস্বরূপ এ পদের সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হোক: 'খ্রীষ্টই আমাদের সহায়ক, তুমি কিন্তু পাপ না করার জন্য সচেষ্ট হও। অথচ যদি মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতাবশত তোমার অন্তরে পাপ দেখা দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই এর জন্য দুঃখ কর, সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দা কর। তার নিন্দা করলে তবে শান্ত মনেই বিচারকের দরবারে দাঁড়াতে পারবে। সেখানে তুমি সেই সহায়ককে পাবে; তোমার পাপ স্বীকার করলে পর আর ভয় করো না, তুমি মামলায় হার মানবেই না। এ জীবনকালে সুবক্তা উকিলের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে যদি একজন মুক্তি পেতে পারে তাহলে ঐশবাণীর উপর নির্ভরশীল হয়ে তুমি কি কখনও দণ্ডিত হতে পারবে? সবাই চিৎকার করে বল, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন!'

২:২—তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ: আব্রাহাম, মোশী ইত্যাদি কুলপতিদের অপেক্ষা

যীশুখ্রীষ্টই সর্বতোভাবে তাঁর ভাইদের সমরূপ হয়ে এবং করুণাময় ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হয়ে (হিব্রু ২:১৭), স্বর্গে উন্নীত হয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করে থাকেন (হিব্রু ৭:২৫) এবং তাঁর রক্তে আমাদের অন্তরকে আরও কত বেশিই না শুদ্ধ করে তোলেন মৃত কর্মসমূহ থেকে, জীবনময় ঈশ্বরের সেবার জন্য (হিব্রু ৯:১৪)। আমাদের পাপগুলির জন্য ঈশ্বর তাঁকেই প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন (রো ৩:২৫), এজন্য তিনিই অভিযোগকারী শয়তানের বিপক্ষে উত্তম সমর্থনকারী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে পরাস্ত করেন। সুধী পাঠক অবশ্যই লক্ষ করেন কি করে যোহন ইহুদী ঐতিহ্যগত বিচারের দৃশ্য ত্যাগ ক'রে ক্রুশের উপর যীশুর আত্মবলিদানের দিকেই জোর দিয়ে অঙুলি নির্দেশ করেন: পূর্ববর্তী পদে তিনি যীশুকে সহায়ক বা উকিল বলে উপস্থাপন করেছিলেন, এখন তাঁকে প্রায়শ্চিত্তবলিরূপেই বর্ণনা করেন। এতে যোহন দেখাতে চান, ঈশ্বরের দরবারে আমাদের পক্ষসমর্থন কথায় শুধু নয়, যীশুর মৃত্যুর পরিত্রাণদায়ী ফলের উপরই নির্ভর করে; যীশুই প্রাক্তন সন্ধির পূর্বকথিত সেই ধর্মাত্মা (লেবীয় ৪:১-৫,১৪; ১৬) যিনি পাপীদের জন্য নিজ রক্তক্ষরণে আমাদের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, অর্থাৎ আমাদের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের চিরন্তন পুনর্মিলন সাধন করেছেন। হিব্রুদের প্রতি পত্র যীশুকে বলি-উৎসর্গকারী মহাযাজক বলে বর্ণনা করে; তাছাড়া যোহন একথাও বলেন, যেহেতু যীশু একাধারেই রক্তদান করেছেন এবং ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন এজন্য তিনি বলি-উৎসর্গকারী মহাযাজক শুধু নন, প্রায়শ্চিত্তবলিও তিনি! আবার প্রত্যাদেশ পুস্তকে যোহন এমন যীশুকে বর্ণনা করেন যিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে একাধারে নিপাতিত ও দণ্ডায়মান মেষশাবক (প্রত্যা ৫:৬,১২; ১৩:৮)। জীবনকালে যীশু যে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সাধন করে গিয়েছিলেন, তা এমন মহা অনুরোধে পরিণত হয়েছে যে অনুরোধ স্বর্গে থেকে তিনি 'সহায়ক' হিসাবে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য আপন রক্তের সঙ্গেই পিতার চরণে নিবেদন করেন; আর পিতা খ্রীষ্টের রক্তসাধিত সেই মহা অনুরোধ অবশ্যই গ্রহণ করেন কারণ তিনি জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে ত্রাণকর্তারূপে ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত তাঁর সকল সন্তানদের একত্রিত করার জন্য বলিরূপেই আপনার একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন (যোহন ৩:১৬; ১১:৫২)।

আজ্ঞাপালন (২:৩-১১)

পূর্ববর্তী পদগুলোতে যোহন বলেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করতে হলে পাপাচরণ ত্যাগ করা আবশ্যক। এ অংশেও ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাই হল আলোচ্য বিষয়, কিন্তু অন্য দিক অনুসারে অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান অনুসারেই তা অনুধাবিত। যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রীষ্টানেরা তাদের তাত্ত্বিক ও মরমিয়া ভঙ্গির উপর নির্ভর করেই বলত, তারাই ঈশ্বরকে উত্তমরূপে জানত। তাদের এ ধারণার বিপক্ষে যোহন সেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রচার করেন যা স্বয়ং ঈশ্বর প্রাক্তন সন্ধির কুলপতি ও নবীদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন: জ্ঞান হল ভালবাসা, জীবন্ত একাত্মতা ও গভীর মিলনের নামান্তর। ঈশ্বরজ্ঞান হল স্রষ্টা ও প্রকাশকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের চেতনাপূর্ণ ও গতিশীল সম্পর্ক, অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বরকে জানি' বলতে একথা বোঝায়, আমার জীবনযাত্রার যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আমি আত্মপ্রকাশকারী ও আপন ইচ্ছা প্রকাশকারী জীবনময় ঈশ্বরের উপস্থিতি বিষয়ে সচেতন হব এবং তাঁর সঙ্গে এক হবার জন্য প্রবৃত্ত থাকব। কিন্তু এমন মরমিয়া অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনলাভের মাধ্যমে নয় যা প্রতিবেশী মানুষ ও জগতের সমস্যাগুলির প্রতি আমাকে উদাসীন করবে, বরং আমার ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক করায় ঈশ্বরের সঙ্গে এক হবার জন্য প্রবৃত্ত থাকব।

২ ৩ এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি,
আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
৪ যে বলে, 'আমি তাঁকে জানি,'
অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না,
সে মিথ্যাবাদী, তার অন্তরে সত্য নেই।
৫ কিন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।
এতেই জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি।
৬ যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে,
তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।
৭ প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে আমি নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়,
সেই পুরাতন আজ্ঞারই কথা লিখছি,
আদি থেকে যা তোমরা পেয়েছ:
যে বাণী তোমরা শুনেছ, তা-ই সেই পুরাতন আজ্ঞা।
৮ তবু একদিকে নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমাদের লিখছি,
আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমাদের অন্তরে সত্যিই রয়েছে,
কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে
ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান।
৯ যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে।
১০ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে,
আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।
১১ কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে,
সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে;
কোথায় যাচ্ছে তা জানে না,
কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে।

২:৩-৪—এতই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি …: পূর্বে বলেছি, যে নিজের জীবনযাত্রার যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশকারী ও আপন ইচ্ছা প্রকাশকারী ঈশ্বর বিষয়ে সচেতন হয়ে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মেলাতেই তাঁর সঙ্গে এক হয় সে-ই ঈশ্বরকে জানে। কিন্তু, কি করে তাঁর ইচ্ছা জানতে পারব? কি করে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা একীভূত করব? এধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর খুবই সহজ: তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করব। চতুর্থ সুসমাচারে বারবার যীশু দেখিয়েছেন, পিতার ইচ্ছা পালনের গুণেই তিনি পিতাকে জানেন, এমনকি তাঁর সঙ্গে এক। এটিই যীশুর প্রকৃত পরিচয়: তিনি অনুগত ও বাধ্য পুত্র, পিতার ইচ্ছা পালনেই তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা পালনেই পিতাকে গৌরবান্বিত করেন এবং যীশুর পুত্রোচিত এ বাধ্যতায় পিতা এত প্রীত হন যে সকল মানুষকে ঐশজীবন দানের অধিকার তাঁকে অর্পণ ক'রে তাঁকে গৌরবান্বিত করেন। নব-সন্ধির উদাহরণ ছাড়া প্রাক্তন সন্ধির কয়েকটি কথাও স্মরণযোগ্য: নবী হোসেয়া অনুসারে ঈশ্বরজ্ঞান হল দয়া, করুণা ও প্রেমপূর্ণ ভক্তির নামান্তর (হো ৬:৬) এবং নবী যেরেমিয়া বলেন, ঈশ্বরজ্ঞান ও নৈতিক সদাচরণ ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত (যেরে ২২:১৫)। সুতরাং যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তমতপন্থী খ্রীষ্টানদের মত ঈশ্বরের অসাধারণ দিব্য দর্শন ও অতীন্দ্রিয় মরমিয়া অভিজ্ঞতা কামনা করা সম্পূর্ণরূপে অনর্থক, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর নিজেকে জ্ঞাত করার জন্য অতিসাধারণ পথ রচনা করেছেন তথা, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালনই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান; তাঁর প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও

অকৃত্রিম অনুরাগ আমাদের বাধ্যতায় প্রকাশ পায়; সর্বদা স্মরণে রাখতে হয় তিনি স্রষ্টা আর আমরা সৃষ্টজীবমাত্র, ফলত ভক্তিপূর্ণ বাধ্যতামার্গই তাঁর সঙ্গে আমাদের ঐক্যস্থাপনের জন্য প্রকৃত পথ। বাধ্যতাই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের প্রমাণ ও বহিঃপ্রকাশ, একথা যখন সত্য, তখন একথাও সত্য যে, অবাধ্যতাই বিকৃত ও কৃত্রিম ঈশ্বরজ্ঞানের মূলকারণ এবং কার্যত আমাদের দুরাচারেরও মূলকারণ। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে যথোচিত সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে আমাদের কথা ও সদাচরণের মধ্যকার মিল বজায় রাখা অপরিহার্য: ‘আমি ঈশ্বরকে জানি’ বা ‘ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি’ এধরনের স্বীকারোক্তি উচ্চারণ ক’রে যে নিজেরই ইচ্ছা পালন করে সে সঙ্গতভাবে চলে না, কখনও ঈশ্বরকে জানবে না এবং তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাও কখনও লাভ করবে না। বরং ‘ঈশ্বরকে জানি’ বা ‘তাঁকে বিশ্বাস করি’ বলার পর তাঁর আজ্ঞাগুলি পালনেই তাঁকে ভালবাসতে হয়। অর্থাৎ বিশ্বাস-ঘোষণা ও নৈতিক আচরণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান আছে: ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি অনুযায়ী নৈতিক আচরণেই আমাদের বিশ্বাস ও ঈশ্বরজ্ঞান (২:৩) এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতা প্রকাশিত ও প্রমাণিত (১:৭)।

পক্ষান্তরে যখন আমরা কথায় মাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার ক’রে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলি না, তখন ‘সত্য’ অর্থাৎ সত্যময় ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিরাজ করেন না, ফলত আমাদের খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ব নিতান্ত শূন্য হয়ে যায়। অবশেষে এ ধারণাও স্মরণযোগ্য, যোহন ও প্রাক্তন সন্ধি অনুসারে ‘আজ্ঞা’ ঈশ্বরের এমন একটি বোঝা নয় যা তিনি অত্যাচারী রাজার মত প্রজাদের মাথায় চাপিয়ে দেন; বরং আজ্ঞা হল জীবনস্বরূপ, জীবনলাভের জন্য ঈশ্বরের অর্পিত উপায়স্বরূপ। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে মনুষ্যত্বের গ্লানি হয় না, এমনকি মানুষ ঐশআজ্ঞাপালনে ঈশ্বরকে জেনে তাঁর সঙ্গে এক হয়। পত্রটির পরবর্তী বাণীতেও এধারণা স্মরণীয়।

২:৫—কিন্তু যে কেউ তার বাণী পালন করে …: আজ্ঞাবলিতে প্রকাশিত ঐশবাণী যে কেউ পালন করে তার মধ্যেই সত্যময় ঈশ্বর এবং ‘সত্য’ বিরাজ করেন, সে-ই ঈশ্বরের ভালবাসাকে ও উত্তম ঈশ্বরজ্ঞানকে পায়, কারণ ভালবাসাই প্রকৃত জ্ঞান। এখানে যে ‘ঈশ্বরের ভালবাসার’ কথা বলা হয় সেটা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরেরই ভালবাসা। স্বভাবত মানুষ হিসাবে আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে ভালবাসতে অক্ষম (৪:২০; ৫:২ …); ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র বলে আমরাও ভালবাসতে বাধ্য, কিন্তু আমাদের ভালবাসা আমাদের প্রতিবেশীকেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালবাসা ভ্রাতৃপ্রেমেই পূর্ণতা লাভ করে: ঈশ্বর আমাদের কাছে ভালবাসা নিবেদন করেন আমরা যেন ভাই-মানুষকেই ভালবাসতে পারি এবং মানুষকে ভালবাসাতে ঈশ্বরকেও ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠি। উপরন্তু যেহেতু ‘ভাইকে ভালবাস’ হল ঐশবাণী অর্থাৎ আজ্ঞাবলির সার, এজন্য একথা সমর্থন করা যায় যে, নিজের ভালবাসা আমাদের দান করায় ঈশ্বর আমাদের সেই শক্তি দান করেন যে শক্তির প্রভাবে আমরা ভাইদের ভালবাসতে অর্থাৎ ঐশবাণীকে পালন করতে এবং ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হয়ে উঠি।

এ অতিসংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করতে পারি ঈশ্বরের ভালবাসা জীবন্ত ক্রিয়াশীল ও গতিশীল একটি শক্তি; এ শক্তি আমাদের অন্তরে কার্যকারী হয় এবং যেভাবে ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন সেইভাবে প্রতিবেশীকে ভালবাসতে আমাদের সক্ষম করে: এরূপ ভালবাসা দেখে জগৎ জানবে আমরা যীশুর শিষ্য ও ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং যোহন অনুসারে খ্রীষ্টান হওয়াটা অচল ও স্থিতিশীল কিছু নয়, বরং প্রকৃত খ্রীষ্টান হতে হলে আমরা সর্বদাই পথিকরূপে যীশুকে অনুসরণ করতে ও তাঁর বাণী পালনে তাঁর অনুকরণ করতে সচেষ্ট থাকব, এবং নিশ্চিত হব এরূপ আচরণে স্থাপিত ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমন শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতা লাভ করেছে যে, কোন

মরমিয়া অভিজ্ঞতা ও দিব্য দর্শন তা অতিক্রম করতে পারবে না।

২:৬—যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে ...: যীশুই খ্রীষ্টীয়-উচিত আচরণের আদর্শ ও ভিত্তিস্বরূপ: যে আপন জীবনাচরণে যীশুর জীবনাচরণ অনুকরণ করে সে-ই ঈশ্বরে বসবাস করে। চতুর্থ সুসমাচার অনুসারে স্বয়ং যীশু নিজের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন: 'তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে; আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে; যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই (যোহন ১৪:১৫,২১,২৩; ১৫:১০)।' বিশেষত শেষ উক্তিটি ('যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর তবে ...') স্পষ্টই ব্যাখ্যা করে 'তাকে সেইভাবে চলতে হয় যেভাবে তিনি নিজে চললেন' এর অর্থ: আজ্ঞাগুলি পালনে সেইভাবে আমাদের তাঁর অনুকরণ করতে হয় যেভাবে তিনি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন। যীশুর অনুকরণ করতে করতে প্রকৃত শিষ্য তাঁর আজ্ঞাগুলির পথে তাঁকে অনুসরণ করে; তাতে সে ঈশ্বরকে জানে ও ঈশ্বরপ্রেমের পূর্ণতা লাভ করে; শুধু এ পর্যায়েই আমরা 'খ্রীষ্টে বসবাস করা' যোহনের এ বাক্যের অতি গভীর অর্থের একটি আভাস পেতে পারি: 'বসবাস' বিশিষ্ট বাক্যটি একটি স্থান শুধু নিরূপণ করতে চায় না, বরং নিরূপিত স্থানে স্থিতিকাল বা নিরূপিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের স্থিতিকাল জোর দিয়ে নির্দেশ করতে চায়: একই স্থানে বা একই ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিময় জীবন্ত সম্পর্কে অটলভাবেই 'বসবাস করা'। সুতরাং 'খ্রীষ্টে বসবাস করা' বাক্যটি গুরুর প্রতি শিষ্যের বিশ্বস্ততা নির্দেশ করে বটে, কিন্তু এ অর্থে নয়, কেমন যেন শিষ্য সর্বদাই একই স্থানে যীশুর সঙ্গে বসবাস করবে বরং এই অর্থ অনুসারে: শিষ্যরূপে আমরা যে কোন স্থানে অবস্থায় পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে থাকব, আমাদের এ সামর্থ্যই আমাদের বিশ্বস্ততার পরিমাপ। আবার 'খ্রীষ্টে বসবাস করা' বলতে তাঁর অনুকরণের জন্য আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প বোঝায়, আর একথাও বোঝায়, তাঁর বিষয়ে লজ্জাবোধ না করে এমন ইচ্ছা পোষণ করব যেন তাঁকে সকলের কাছে পরিচিত করতে পারি। অবশেষে 'খ্রীষ্টে বসবাস করা' বাক্যটি আমাদের এ আন্তর নিশ্চয়তা নির্দেশ করে যে, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন আমাদের কাছে হল আনন্দের উৎস, আলো ও জীবন।

এ পর্যায়েই আমরা অনুভব করতে শুরু করি, 'আজ্ঞাগুলি পালন' বলতে অত্যাচারী রাজার প্রতি প্রজাদের বশ্যতাস্বীকার নয়, বরং ঈশ্বরজ্ঞান বোঝায় (এ প্রসঙ্গে ১১৯ সামসংগীত ধ্যান করা অত্যন্ত উপকারী)। এখনই উপলব্ধি করতে পারি, 'সেইভাবে চলতে হয় যেভাবে তিনি নিজে চললেন' এবং 'তাঁর মধ্যে বসবাস করা' একই কথা; এবং এ সত্যও অনুমান করতে পারি, এ মনোভাব অনুসারে যে আচরণ করে 'তার মধ্যেই শুধু ঐশ ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করেছে।' এ সমস্ত কথা উত্তমরূপে যীশু নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন 'আঙুরলতার' উপমায় (যোহন ১৫ অধ্যায়): শাখা হয়ে আমরা 'আঙুরলতা' যীশুর সংযোগেই সঞ্জীবিত: সঞ্জীবিত ও ফলশালী হতে গিয়ে তাঁর মধ্যে আমাদের বসবাস করতে হয় যেইভাবে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন; তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে বসবাস করলে অর্থাৎ 'বাণী যীশুর' সঙ্গে অটল ও বিশ্বস্ত নিত্য সম্পর্ক বজায় রাখলে এবং ফলত তাঁর বাণীতে প্রকাশিত শিক্ষা ও আজ্ঞাগুলি পালন করলে তবেই আমরা পিতাকে গৌরবান্বিত করব। কিন্তু চতুর্থ সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়, এবং পত্রটির মধ্যকার ব্যবধানও লক্ষণীয়: সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে যীশুতে কেন্দ্রীভূত (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৫ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), পক্ষান্তরে পত্রটি ব্যবহারিক তাৎপর্য বহন করে। সুসমাচারের ১৫ অধ্যায় আমাদের 'প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন' যীশুর গৌরব কীর্তন করে; পত্রটি ব্যবহারিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে সেই গৌরবকীর্তন ব্যাখ্যা করে। যীশু সত্যিকারে আমাদের প্রাণের প্রাণ

কিনা, একথা-সকল আমাদের সদাচরণে—তাঁর বাণী ও আজ্ঞাগুলি পালনেই—প্রকাশিত ও প্রমাণিত হওয়া চাই।

উপসংহারস্বরূপ এ কথা বলা হোক, 'বসবাস করা' (এবং একই গ্রীক শব্দ 'স্থিতমূল থাকা') যোহনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা এ প্রথম পত্রটিতে ২৫ বার, দ্বিতীয় পত্রে ৩ বার ও চতুর্থ সুসমাচারে ৪১ বার উল্লিখিত।

২:৭—নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয় …: যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তমতাবলম্বীরা ধর্মক্ষেত্রে সম্ভবত নিজেদের প্রগতিপন্থী মনে করত (২ যোহন ৯); যীশুর সাক্ষীগণ এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত বাণীপ্রচারকদের পরম্পরাগতভাবে হস্তান্তরিত খ্রীষ্টবিশ্বাস তারা খুব সহজে গুটিয়ে ফেলত, সেই পরম্পরাগত খ্রীষ্টবিশ্বাস অতীতকালের একটা পুরাতন জিনিসমাত্র বলে। তাদের এ ভুলধারণা রোধ করে যোহন স্বয়ং যীশুর বাণীকে উদ্দেশ ক'রে আপন বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানদের কাছে যীশুর দেওয়া নতুন আজ্ঞা—প্রেমাজ্ঞার কথা স্মরণ করান (উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত আজ্ঞাগুলি প্রেমের অনন্য আজ্ঞায় একীভূত বলে যোহনের ভাষায় 'আজ্ঞাগুলি', 'আজ্ঞা' ও 'বাণী' একই অর্থবহ শব্দ): প্রেমাজ্ঞা পালনে খ্রীষ্টানগণ জগতের কাছে প্রমাণ করবে তারা যীশুর শিষ্য (যোহন ১৩:১৮ …; ১৫:১২,১৭)। যেহেতু খ্রীষ্টমণ্ডলী আদি থেকেই আপন স্বকীয় ও বিশিষ্ট আজ্ঞা পেয়েছে, এজন্য সেই আজ্ঞাটিকে 'পুরাতন' বলেও বলা যেতে পারে।

এ পদের তাৎপর্য গভীরতরভাবে অবধারণ করতে হলে তবে বলতে পারি, খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে দু'টো দাবি পূরণ করতে হবে। সর্বপ্রথমে বিশ্বাসীর দৃঢ় বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত চাই: খ্রীষ্টবিশ্বাসী নির্দ্বিধায় সেই যীশুখ্রীষ্টের পক্ষে দাঁড়াবে এবং তাঁকেই মাত্র প্রভু বলে স্বীকার করবে যাঁকে দীক্ষাস্নানের সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টবিশ্বাসীর বিশ্বাসনিষ্ঠা চাই: অটলভাবে যীশুর বাণী পালনেই সে পূর্বগৃহীত বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত সত্য বলে প্রতিপন্ন করবে। যীশুর আজ্ঞা পালনে অধ্যবসায়ী খ্রীষ্টানই প্রকৃত খ্রীষ্টান।

২:৮ক—নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমাদের লিখছি: খ্রীষ্টমণ্ডলীর আদিতেই দেওয়া হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রেমাজ্ঞা পুরাতন বটে, কিন্তু প্রভু যীশুর অনাদি অনন্ত বাণী বলে এবং প্রভু যীশুর সাক্ষীগণ দ্বারা শ্রুত, ঘোষিত ও সর্বযুগের মানুষের জন্য হস্তান্তরিত জীবন-বাণীর সারঘোষণা বলে সেই প্রেমাজ্ঞা স্বভাবতই চিরনূতন। সুতরাং, যীশুর আগে কেউই প্রেমের কথা প্রচার করেনি বা জীবনকালে যীশু সেকালের শিষ্যদের কাছে প্রেমের দাবি রাখেননি এ অর্থে যে প্রেমাজ্ঞা নতুন তা নয়, বরং যীশুর মন অনুসারে প্রেম যে কি এবং কিভাবে প্রেম বাস্তবায়িত করা উচিত তা-ই বোঝায় আজ্ঞাটির নতুনত্ব। বস্তুত 'তোমরা পরস্পরকে ভালবাস যেমন আমি তোমাদের ভালবেসেছি' যীশুর দ্বারা উপস্থাপিত এই পারস্পরিক প্রেম বাস্তবায়িত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য; তাঁর মৃত্যু ও ঐশজীবনদানে যীশুই সেই প্রেম বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সক্ষম করে তুলেছেন। আবার, প্রেমাজ্ঞা নতুন, কারণ প্রত্যেকদিনই তা পালন করা উচিত; যীশুর প্রতি আমাদের সদানতুন ও সদাগভীরতর সংযোগস্থাপন থেকেই আমরা তাঁর অনন্য আজ্ঞার সদানতুনতর নবীনতা আবিষ্কার করব।

এখানে উপস্থাপিত 'ঐশতাত্ত্বিক' ব্যাখ্যা ছাড়া চতুর্থ শতাব্দীর 'অন্ধ দিদিমস' নামক একজন ভাষ্যকারের 'আধ্যাত্মিক' কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন প্রেমাজ্ঞাটি পুরাতন, কারণ আমাদের আদিপিতা আদমের বুকে রোপিত হয়েছিল। যখন ঈশ্বর আদমকে আপন সাদৃশ্য দান করেছিলেন তখন এ আজ্ঞাটিকেও দান করেছিলেন। সেই সাদৃশ্য হল ঈশ্বরের নিজেরই ঐশশক্তি। ঈশ্বর মানুষকে নিজ সাদৃশ্যে সৃষ্টি ক'রে আপন ঈশ্বরত্বে সঞ্চারিত ঐশপ্রেমশক্তিগুলিকেই তার অন্তরে সঞ্চার করেছিলেন, আর এ কারণে মানুষকে ঐশসৃষ্টজীব বলে! সেই পুরাতন প্রেমাজ্ঞা নতুন হয়ে উঠেছে কারণ যীশুখ্রীষ্ট মানবজাতিকে তার পূর্ণতায় এনেছেন: জগৎসৃষ্টির দিনগুলিতে ঐশপ্রজ্ঞা যে ঐশশক্তির বীজ মানুষের অন্তরে সঞ্চার করেছিলেন, অনাদি ঐশবাণী যীশু নবমানবজাতির প্রথমজাত

হয়ে তার পূর্ণ প্রকাশ সাধন করেছেন; যীশুতে আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্য অর্থাৎ সেই পুরাতন প্রেম নব, পূর্ণ ও অপূর্ব রূপে লাভ করি।

২:৮খ—আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমাদের অন্তরে সত্যিই রয়েছে: ঐশপ্রেম একটা ধারণামাত্র নয়। রহস্যময় হলেও ঐশপ্রেম এজগতে ক্রিয়াশীল ও শক্তিশালী একটা সত্য বা বাস্তবতা। 'তাঁর মধ্যে' অর্থাৎ যীশুর মধ্যে ঐশপ্রেম সত্যই রয়েছে: বস্তুত যীশু ক্রুশের উপর আত্মবলিদান করাতে ঐশপ্রেম বাস্তব করে তুলেছেন। আমাদের অন্তরেও ঐশপ্রেম সত্যই রয়েছে অর্থাৎ বাস্তবরূপেই রয়েছে, কেননা খ্রীষ্ট যেমন ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ভালবেসেছেন, ঠিক সেইভাবে সেই প্রেমই সকল ভাইদের ভালবাসতে আমাদের উদ্দীপিত করে, আমরা যেন যীশুর মত সকলকে ভালবেসে সেই 'প্রেমের আন্দোলন' চালিয়ে যেতে পারি, যে আন্দোলন স্বয়ং ঈশ্বর থেকেই শুরু হয়েছিল। আবার, ঐশপ্রেম আমাদের অন্তরে অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সত্যই রয়েছে, কারণ আপনজনদের কাছে যীশু যে প্রেম প্রকাশ ও প্রমাণ করেছিলেন, সেই প্রেমই হল খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং যীশুর প্রেমদানেই প্রতিষ্ঠিত বলে খ্রীষ্টমণ্ডলী সেই ঐশপ্রেমকে বাস্তব, কার্যকারী ও প্রকাশমান করতে দায়ী। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত ঐশপ্রেম দেখেই জগৎ খ্রীষ্টের শিষ্য বলে আমাদের জানবে। আমাদের অন্তরে সত্যিকারে উপস্থিত ঐশপ্রেম সম্বন্ধে অধিক গভীর সচেতনতা আর অভিজ্ঞতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

২:৮গ—কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে: চতুর্থ সুসমাচারের 'বাণী বন্দনায়ও' জগতের মাঝে ঐশআলোর গৌরবময় জয়যাত্রার সূত্রপাত কীর্তির হয়েছিল: মাংসে ঐশবাণীর আগমন গুণে ঐশআলো অন্ধকারকে পরাভূত করেছে। পত্রটি সেই গৌরবময় জয়যাত্রার কথা পুনঃকীর্তন করে: এখনও ঐশআলো অন্ধকার এবং জগতের অধিপতিকে পরাস্ত করে আসছে এবং মানুষের উপর শয়তানের প্রভাব অধিক হ্রাস পাচ্ছে। এখন সবাই সত্যকার আলোতে উদ্ভাসিত, সবাই জীবনদায়ী ঐশআলোতে সঞ্জীবিত (যোহন ১:৯), কারণ আপন মৃত্যু দ্বারা যীশু মৃত্যুকে বিনাশ করেছেন এবং তাঁর আপন জীবন এখনও আমাদের দান করে আসছেন। ঐশপরিত্রাণ আনবার জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের মধ্যে ঐশআলোর গৌরবময় ও বলপূর্বক জয়প্রবেশের কথা, অর্থাৎ 'আলো যীশুর' আবির্ভাবের কথা স্মরণ করিয়ে যোহন 'আলো যীশুর' আবির্ভাবের কথায় সূচিত অন্যান্য দিকগুলোও আমাদের স্মরণ করান: প্রথম, এখনই মানবজাতি এবং মানবজাতির প্রত্যেক মানুষ আলোর সপক্ষে দাঁড়াতে আহূত; দ্বিতীয়, এখনই মানবজাতিকে আলো ও অন্ধকারপন্থীদের মধ্যে বিভক্ত করা হয়; তৃতীয়, বাহ্যত অন্ধকার জয়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐশআলোই যত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে জয়যাত্রী হয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হবে। ফলে নৈতিকতার কথাও ওঠে: বিজয়ী ঐশআলোর ধ্যান ও সচেতনতায় উৎসাহিত হয়ে আমরা সেই আলোতে মনপরীক্ষা করতে আহূত: আমাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার আলো না অন্ধকারের দিকে আমাদের আকর্ষণ করে? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার জন্য স্বয়ং যোহন পরবর্তী পদে বিচারের মান নিবেদন করেন।

২:৯—যে বলে সে আলোতে আছে …: ঐশআলোবহনকারী যীশু নিজেই আমাদের আচরণের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করেন। যেমন আলো-অন্ধকার তেমনি ভালবাসা-ঘৃণাও পরস্পর-বিরোধী শব্দ, একটি থাকলে তবে দ্বিতীয়টি আদৌ থাকতে পারে না। প্রাক্তন সন্ধি অনুসারে ঘৃণা হল ভালবাসার বিপরীত আচরণ (প্রবচন ১৩:২৪; দ্বিঃবিঃ ২১:২৫-২৭): ভাসা-ভাসা ভালবাসা বলতে কিছু নেই, কিঞ্চিৎ ঘৃণা বলতেও কিছু নেই: ভাসা-ভাসা ভালবাসা হল ঘৃণা, কিঞ্চিৎ ঘৃণাও আসল ঘৃণা। এ ধর্মগত ঐতিহ্যকে ভিত্তি ক'রে যোহন ঘৃণার কথা ব্যাখ্যা

করেন: জিঘাংসু মনোভাব যে ঘৃণা শুধু এমন নয়। খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আপন ভাইকে যে ভালবাসে না সে তাকে ঘৃণাই করে, এমনকি সে হত্যাকারী! অর্থাৎ যা ভালবাসা নয় তা হত্যাকান্ড। যীশুর প্রেমাজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে সে অন্ধকারের উপর বিজয়ী ঐশআলোর সহভাগী নয় এবং 'আলো যীশু' আত্মপ্রকাশ করতে থাকলেও সে এখন থেকে অন্ধকারের লোক হয়ে গেছে, এমনকি 'আলো যীশু' দ্বারাই সে অন্ধকার এবং মৃত্যুর লোক—হত্যাকারী বলে বিচারিত হয়ে গেছে।

২:১০—নিজের ভাইকে যে ভালবাসে ...: যীশুর প্রেমাদর্শজনিত এবং যীশুর প্রেমে স্থাপিতই ভ্রাতৃপ্রেম: এটিই সেই বাস্তবতা যা পরস্পরের মধ্যে ভাইদের একত্র করে ও একাধারে অপ্রকৃত খ্রীষ্টান থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টানকে নির্ণয় করে, ভ্রাতৃপ্রেমই চতুর্থ সুসমাচার ও পত্রটির খ্রীষ্টানোচিত নৈতিক আচরণ সম্পর্কীয় শিক্ষার সারকথা (৩:১ ...; ৪:৭ ...,২০ ...; যোহন ১৩:৩১ ...; ১৫:৯ ...)। আরও, খ্রীষ্টানোচিত ভ্রাতৃপ্রেম খ্রীষ্টানদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ প্রেম নয়, বরং যীশুর প্রেমের আদর্শে সকল মানুষের কাছে আত্মনিবেদনে পরিণত হওয়ার কথা, কারণ সকল মানুষেরই পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্ট মানুষ হলেন ও ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন।

এ পদটি একথাও দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করে যে, প্রেমপিপাসু ভাইয়ের জন্য চিন্তা না করে যীশুকে মুখেই স্বীকার করে বিধায় নিজেকে যে পরিত্রাণপ্রাপ্ত মনে করে, সে মস্তবড় ভুল করে। ঐশআলো ও ঐশজীবনের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা ভ্রাতৃপ্রেমের উপর নির্ভর করে এবং একাধারে প্রেমাজ্ঞা পালন করায় আমাদের এখন থেকেই আনন্দ করতে হয়, এখন থেকেই আমাদের অনুভব করতে হয় আমরা যীশুর মত 'আলো ঈশ্বরের' দ্বারা উদ্ভাসিত, তাঁর ঐশজীবনের এবং ঈশ্বরত্বের সহভাগী, যে ঈশ্বরত্ব হল মানবজাতির কাছে নিবেদিত প্রেম ও আলো: ভাইয়ের প্রতি আমাদের প্রেমসুলভ আচরণ যত ছোটখাটো হোক না কেন, সেটা আমাদেরই দ্বারা সাধিত অলৌকিক কাজ, কারণ ভাইয়ের কাছে নিজেদের দান করায় আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের জীবন ও প্রেম দান করি; আমরা প্রেমাজ্ঞা পালন করায় স্বয়ং যীশুই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে এখনও এ জগতে কাজ করে থাকেন ঠিক যেইভাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৪:১২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ পর্যায়ে আমরা অনুভব করতে পারি, প্রেমাজ্ঞা পালনে আমরা যীশুর মাধ্যমে ও পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ঈশ্বরকে জানি, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে উঠি।

২:১১—কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে ...: প্রেম অভাব হেতু খ্রীষ্টানগণ ঐশআলো থেকে নিজেদের বহিষ্কৃত ক'রে অন্ধকারপতিত হয়ে অন্ধ হয়ে থাকে, ফলত সেই যীশুর খোঁজ পেতে অক্ষম যিনি সত্য ও জীবন লাভের জন্য একমাত্র পথ (যোহন ১৪:৬)।

এ সমস্ত কথা থেকে আমরা যোহনের স্থানীয় মন্ডলীর পরিস্থিতি অনুমান করতে পারি: যারা ভ্রান্তমতপন্থী তারা মন্ডলীর অন্যান্য ভাইদের থেকে নিজেদের পৃথক রেখেছিল; ভ্রাতৃ-একতা পরিত্যাগ করায় তারা প্রেম-জ্যোতির্লোক ত্যাগ ক'রে অন্ধকারে পড়ে গেছিল। সুতরাং খ্রীষ্টশিক্ষা সুস্পষ্ট: খ্রীষ্টমন্ডলী থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই অন্ধকারে তার পতন, যে অন্ধকার যীশুর আগমনের আগে বিরাজ করছিল এবং খ্রীষ্টমন্ডলীর পরিত্রাণদায়ী প্রভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী জগতের মধ্যে এখনও বিরাজ করে। এমনকি ঐশআলো যে কোথায় তার চোখ তাও দেখতে পায় না, কারণ মন্দতা এবং অ-ভালবাসা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। ঐশআলোতে ফিরে আসবার একমাত্র উপায় এ, প্রেমাজ্ঞা পালনে অ-ভালবাসার অন্ধকার পরিত্যাগ ক'রে যীশুকে আঁকড়ে ধরব, কেননা আলো বলে কেবল তিনিই অন্ধকারের বন্ধন থেকে আমাদের অনন্য মুক্তিদাতা এবং ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিচ্ছবি ও ভিত্তিস্বরূপ বলে কেবল তিনিই ভাইকে ভালবাসবার জন্য এবং ফলত ঈশ্বরের সঙ্গে এক

হবার জন্য আমাদের একমাত্র আশা।

জগতের বিষয়ে সাবধান (২:১২-১৭)

এ উদ্ধৃতাংশ পাঠ ক'রে কতিপয় প্রশ্নের উদয় হতে পারে। 'বৎসেরা, পিতারা, তরুণেরা' বলে কাদের বা যোহন সম্বোধন করেন? সাধু আগস্তিন শব্দ তিনটির প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন: আমরা সবাই 'বৎস' কারণ যীশু-নামে পাপমুক্তি লাভে নবজীবনে জাত; আমরা সবাই 'পিতা' কারণ বয়স্কোচিত আচরণ অনুসারে 'আদির' কথা পুনঃস্মরণ করি এবং ঈশ্বরের পরম ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করি; আমরা সবাই 'তরুণ' কারণ খ্রীষ্টীয় জীবন একটি অধ্যাত্ম সংগ্রামস্বরূপ এবং সংগ্রাম তরুণদেরই কাজ। পক্ষান্তরে আধুনিক শাস্ত্রবিদগণ 'বৎসেরা' বলে সকল খ্রীষ্টান এবং 'পিতারা' ও 'তরুণেরা' বলে আসলেই যারা বয়স্ক ও যুবক তাদের কথা সমর্থন করেন। যাই হোক, সাধু আগস্তিন বা আধুনিক শাস্ত্রবিদগণের কথা দু'টোই গ্রহণযোগ্য। এর চেয়ে গুরু কথা এটি, 'বৎসেরা, পিতারা, তরুণেরা' সম্বোধনে আমরা আপন তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত খ্রীষ্টানদের প্রতি যোহনের প্রেমোচ্ছ্বাস ও পালকীয় উদ্বেগ উপলব্ধি করতে পারি; যোহন আপন খ্রীষ্টানদের ভালবাসেন। এবং খ্রীষ্টের প্রেমাজ্ঞার দিকে তাদের আকর্ষণ করায় তাদের প্রতি নিজের প্রেমই প্রকাশ করেন।

আর একটি প্রশ্ন এটি হতে পারে, কেনই বা যোহন ১২ ও ১৩ পদে 'লিখছি' এবং ১৪ পদে 'লিখেছি' ব্যবহার করেন? 'লিখেছি' বলে তিনি কি কোন পূর্বলেখা নির্দেশ করেন? এর উত্তরে বলব, এ পদগুলি যে প্রকৃত কাব্য না হলেও কিছুটা কাব্যিক একথা স্বীকার্য; ক্রিয়াপদের কালপরিবর্তন সেকালের কাব্যকলার বিবিধ অলঙ্কারগুলির অন্যতম ছিল। ফলে এখানে 'লিখেছি'-এর আসল অর্থ হল 'লিখছি'।

বাহ্যিক ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর, আসুন, এই অংশের মর্মকথায় আসি। ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রীষ্টানগণ বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানদের উত্তেজিত করে তুলেছিল; যোহন এ বিশ্বস্তজনদের শান্ত করেন: তারা নিশ্চিত হোক, তারা ঐশপরিত্রাণপ্রাপ্ত। পূর্ববর্তী অংশে তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, অন্ধকার কেটে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই যীশুর আলো সমগ্র জগৎকে প্রভাবিত করছে (২:৮)। এখন, এই অংশে, তিনি তাদের পক্ষে সেই কথাগুলো যে কী অর্থ বহন করে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল যোহনের শিক্ষাদান পদ্ধতি: অতিরিক্ত নৈতিক উপদেশ ও পরামর্শ না দিয়ে তিনি খ্রীষ্টীয় অস্তিত্বের মাহাত্ম্য বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলেন; তাঁর ধারণায়, এ জগতে জীবনসংগ্রামরত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে রক্ষা পাবার প্রধান ও উত্তম উপায় এটি, সে আপন খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোক এবং অবিরত স্মরণ করুক যীশুখ্রীষ্ট তার জন্য কীনা করেছেন।

২ ১২ বৎসেরা, আমি তোমাদের লিখছি:
তাঁর নাম গুণে তোমাদের সমস্ত পাপ মোচন করা হয়েছে।
১৩ পিতারা, তোমাদের লিখছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখছি:
তোমরা সেই ধূর্তজনকে জয় করেইছ!
১৪ বৎসেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো পিতাকে জান।
পিতারা, তোমাদের লিখেছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।

তরুণেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো বলবান,
ঈশ্বরের বাণী তোমাদের অন্তরে বসবাস করে,
এবং সেই ধূর্তজনকে তোমরা জয়ই করেছ।
১৫ জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না!
কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে,
তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই।
১৬ কেননা জগতের যা কিছু আছে
—দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—
এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গাত।
১৭ আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে,
তার লালসাও তাই,
কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।

২:১২—তোমাদের সমস্ত পাপ মোচন করা হয়েছে: ইতিপূর্বে বলেছি, যোহন খ্রীষ্টানদের বলবান করার জন্য তাদের খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ব এবং যীশুখ্রীষ্ট তাদের জন্য যা করেছেন তা-ই তাদের স্মরণ করান। এক্ষেত্রে 'বৎসদের' অর্থাৎ সকল খ্রীষ্টানদের স্মরণীয় কথা হল খ্রীষ্ট-নাম গুণে পাপের ক্ষমালাভ। আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত, খ্রীষ্টান হিসাবে আমরা ঐশক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী মানুষ এবং এজন্যই যীশুখ্রীষ্ট-নাম গুণে অর্থাৎ স্বয়ং মসীহ যীশু গুণে আমরা ঐশপরিত্রাণ পেতে সক্ষম। 'পাপের ক্ষমা' উল্লেখ করে যোহন ১:৭,৯ এবং ২:১…এ যা বলেছিলেন তার দিকে নির্দেশ করেন: খ্রীষ্টসাধিত পরিত্রাণ বিষয়ে যা সেখানে বলা হয়েছিল, তা এখানে 'তাঁর নাম গুণে' উক্তি দ্বারা পুনরুত্থাপিত হয়। হয়ত দীক্ষাস্নানের সূত্রও পরিলক্ষিত হয়: যীশুর নির্দেশ অনুসারে তাঁর নামেই দীক্ষার্থীদের দীক্ষাস্নাত করা হত (লুক ২৪:৪৭; মথি ২৮:১৯; শিষ্য ১০:৪৮)। দীক্ষাস্নান স্মরণে আমরা যেন সেইদিনে গৃহীত যীশুর নামে বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত করি, এটিই যোহনের আনুষঙ্গিক একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু দীক্ষাস্নানের দিকে ইঙ্গিত থাকলেও তবু পত্রটি সেই যীশু-নাম গুণে পাওয়া পাপমুক্তি জোর দিয়ে নির্দেশ করতে চায়, যে নাম যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম (ফিলি ২:৯)। যেখানে যীশু-নাম অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট নিজেই রাজত্ব করেন, সেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে—ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রীষ্টানদের মধ্যে নয়!—পাপের ক্ষমা প্রাপ্য হয় এবং যীশুর পরিত্রাণ সকল বিশ্বাসীদের সঞ্জীবিত করে (২:১ …)।

২:১৪ক—তোমরা তো পিতাকে জান: আবার সকল খ্রীষ্টানদের কাছে ঈশ্বরজ্ঞানের কথাও স্মরণ করা হয়। ঈশ্বরজ্ঞান বিষয়ে পূর্ববর্তী অংশে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখন একথা যথেষ্ট হোক, সকল খ্রীষ্টানদের স্মরণীয় কথা দু'টো—পাপের ক্ষমা ও ঈশ্বরজ্ঞান—আসলে একই কথা: যেমন দীক্ষাস্নান ও পাপস্বীকারের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত পাপের ক্ষমার মাধ্যমে (২:১২) আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করি (১:১-৬), তেমনি ঈশ্বরজ্ঞান বলতেও (২:১৪ক) কাল্পনিক বা অবাস্তব জ্ঞান নয় বরং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা বোঝায়। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, ঐশক্ষমা ও ঈশ্বরজ্ঞানের কথা দু'টো স্মরণ করিয়ে যোহন প্রকৃতপক্ষে সেই কথাগুলিতে নিহিত অপূর্ব একমাত্র বাস্তবতাকেই আমাদের কাছে স্মরণ করাতে অভিপ্রেত, তথা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতা, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক।

২:১৩ক,১৪খ—পিতারা, তোমাদের লিখছি: যারা খ্রীষ্টসমাজে বয়স্ক তাদের কাছে যোহন খ্রীষ্টজ্ঞানের কথা স্মরণ করান: 'আদি থেকে যিনি বিদ্যমান' অর্থাৎ চতুর্থ সুসমাচারের 'বাণী-বন্দনায়' এবং পত্রটির মুখবন্ধে

কীর্তিত ঐশবাণী বলে সেই যীশুই এখানে উপস্থাপিত হচ্ছেন। খ্রীষ্টজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান একই কথা বলে পরিগণিত হতে পারে, সুতরাং ঈশ্বরজ্ঞান বিষয়ে যা ২:৩-৫ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তথা, খ্রীষ্টজ্ঞান বলতে আজ্ঞাগুলি পালনই বোঝায়; তাতে আমরা জানি খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করেছি।

২:১৩গ,১৪ঘ—তরুণেরা, তোমাদের লিখছি: যা মিথ্যা তা সত্য, যা অন্যায় তা ন্যায় প্রমাণ করা, এটিই শয়তানের কাজ। যোহনের স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে ভ্রান্তমতাবলম্বীরা ঠিক এ শয়তানের কাজ চালিয়ে যেত, ওদের বিরুদ্ধেই যুবকদের সংগ্রাম করতে হয়। যুবক বলেই তারা শক্তিশালী বটে, কিন্তু এ কঠোর সংগ্রামে প্রকৃত জয়দানকারী শক্তি হল সেই ঐশবাণী যা নিজেদের অন্তরে তারা নিত্যস্থায়ীভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করে থাকে। সুতরাং ঐশবাণীর সঙ্গে সংযোগ অর্থাৎ অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঐশবাণী পাঠ, ধ্যান ও পালনই যুবকদের স্বকীয় বিশিষ্টতা। এই বাণী গুণেই তারা শয়তানকে জয় করেছে, তাদের এ গুণ স্বীকার করে যোহন পরোক্ষভাবে তাদের বলেন, 'ঐশবাণীর সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে তোমরা সর্বদাই শয়তানকে জয় করতে থাক।' বাস্তবিকই, জীবন, সত্য এবং খ্রীষ্টের দেওয়া অন্যান্য দানগুলির মত ঐশবাণী আমাদের মধ্যে একটি বাস্তবতা ও সৃজনশীল ঐশশক্তি, এমনকি আমাদের মধ্যে সেই বর্তমান বাণী হলেন স্বয়ং যীশু, যিনি গৌরবান্বিত হয়ে এখনও আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করে যান—আমরা যদি তাঁর বাণীতে স্থিতমূল থাকি অর্থাৎ যদি তাঁর বাণী দ্বারা তাঁর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সংযোগ রক্ষা ক'রে তাঁর বাণীসকল ধ্যান ও পালন করি (যোহন ১৪:২২ ...)। কাজেই, যুবকদের কাছে এ-সব কিছু, স্মরণ করিয়ে যোহন বিশ্বস্ততা ও অধ্যবসায় বজায় রাখতেই তাদের আহ্বান করেন: যীশুর প্রতি বিশ্বস্ততাই তাদের শক্তিশালী ও বিজয়ী করে তুলেছে, অর্থাৎ ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যানে অধ্যবসায়ী হওয়াতেই তারা যীশুর প্রতি সেই বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করেছে, যে বিশ্বস্ততা তাদের যীশুর বিজয়েরই সহভাগী করেছে: যেমন যীশু বলেছিলেন, 'আমি জগৎকে জয় করেছি' (যোহন ১৬:৩৩) তেমনি তারাও বলতে পারে, 'তোমার সংযোগে আমরা শয়তানকে জয় করেছি।'

যোহনের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের বাস্তবতার সচেতনতা থেকেই আমাদের খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ব অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন সঞ্জীবিত হওয়ার কথা। আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠি, এজন্যই ঈশ্বর এ সমস্ত আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে সাধু আগস্তিন লিখেছেন, 'যখন জানি তখন না ভালবেসে পারি না: প্রেমবিহীন জ্ঞান আমাদের পরিত্রাণ সাধন করবে না। বস্তুত অশুচি আত্মাগুলিরও খ্রীষ্টজ্ঞান ছিল (মথি ৮:২৯), কিন্তু তাঁকে ভালবাসত না, এমনকি যীশু তাদের দূরে তাড়িয়ে দিতেন! তোমরা যুবকেরা তাঁকে স্বীকার কর, আলিঙ্গন কর তাঁকে, (...) আর তাঁকে ভালবেস, কারণ তিনি তোমাদের স্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করেছেন।'

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়, কি করে শয়তান ও জগতের উপর আমাদের বিজয় প্রকাশ ও প্রমাণ করব? এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পদগুলিতে সূচিত আছে।

২:১৫—জগৎ বা জগতের কোন-কিছু তোমরা ভালবেসো না: আমরা জানি যোহনের ভাষায় 'জগৎ' বলতে সেই সবকিছু বোঝায় যা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন, যা ঈশ্বরবিরোধী, যা ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা থেকে আমাদের দূরে রাখে এবং যা প্রেমাজ্ঞা পালনে আমাদের বাধাবিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং জগদ্‌পন্থী মানুষের দুরাচারের জন্য এবং জগদ্‌জনিত মায়াচ্ছন্ন বাহ্যিক ভোগবিলাসিতা-প্রবণ জীবনধারার জন্য খ্রীষ্টানদের পক্ষে জগৎ একটি বিপদ। বিপদ এটি, আমরা খ্রীষ্টীয় জীবন অবাস্তব ও কাল্পনিক এবং জগতের আড়ম্বর বাস্তব ও ফলত ভোগ্য বিবেচনা করতে পারি: তাহলে আমাদের জ্ঞান-বিবেচনা উল্ট-পাল্ট হয়ে গেছে, বিপথেই গেছে, আমরা মরীচিকার পিছনে ছুটি, আলো অন্ধকার হয়ে যায়, অন্ধকার আলো হয়ে যায়, স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী

নিজেদের মনে ক'রে আসলে মায়ারাজ্যে বাস করি। খ্রীষ্টান জগৎসংসারের বাইরে বাস করতে আহূত নয় বটে, জগৎসংসার ধ্বংস করাও তার কর্তব্য নয় বটে, অথচ জগৎ কী এবং জগতের সবকিছু কী তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা থাকা চাই: অস্থায়ী অভিনয় (১ করি ৭:৩১) ও নশ্বর জীবনকালমাত্র এই জগৎ (১ পি ৪:২), লোপ পেতে চলেছে এই জগৎ! ভোগবিলাসিতা, মিথ্যা, হিংসা, অহঙ্কার, কাম ইত্যাদি রিপুগুলি হল জগতের ঐশ্বর্য, এজন্য জগৎ জাজ্বল্যমান আলো বলে পিতাপ্রেরিত বাণীকে গ্রহণ করল না (যোহন ১:৯,১১) এবং তাঁকে গ্রহণ না ক'রে নিজেকে বিচারিত করল (যোহন ১২:৩১; ১৬:১১)। সমগ্র মানবজাতির পাপের জন্য যীশুর প্রায়শ্চিত্ত ঠিক ছিল বটে (২:২), জগৎই সেই প্রায়শ্চিত্তের সহভাগী হতে চাইল না! আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর ভাষা অনুসারে খ্রীষ্টানগণ এ জগতে প্রবাসী: যাত্রীর মত, ইহলোকে তারা বিদেশী, স্বর্গরাজ্যের নাগরিক তারা, সুতরাং জগতের নয়, ঊর্ধ্বলোকের যা তারই অন্বেষণ করবে, কারণ এখন থেকেও তারা যীশুর সঙ্গে পুনরুত্থিত এবং খ্রীষ্টীয় নবজীবন যাপন করতে আহূত। দুঃখের কথা, এ সমস্ত কিছু জেনেও কতবার না আমরা এখনও জগৎকে ভালবাসি; কিন্তু আসুন, হতাশ না হয়ে সাধু আগস্তিনের এ পরামর্শ গ্রহণ করি, 'পূর্বে যদি জগৎকে ভালবাসতে, তবে এখন তাকে আর ভালবেসো না; পূর্বে যদি জগতের প্রেমে তোমার পিপাসু হৃদয়কে তৃপ্ত করতে, তবে এখন ঈশ্বরপ্রেমের ঝরনায় তোমার পিপাসা মিটিয়ে দাও; তবেই তোমার অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম বাস করবে।' বস্তুত যতক্ষণ আমাদের হৃদয় জগতের প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকে ততক্ষণ প্রমাণিত হবে যে, যে প্রেম ঈশ্বর আমাদের দান করতে ইচ্ছা করেন আমরা আমাদের হৃদয় অবরুদ্ধ রেখে সেই প্রেমদান অগ্রাহ্য করি; 'তুমি একটা পাত্রের মত যা এখনও ভরা; তার ভিতরে যা আছে তা ফেলে দিও, যাতে এখন তোমার যার অভাব আছে তা লাভ করতে পার (সাধু আগস্তিন)।' শুধু ঈশ্বরপ্রেমে নিজেদের পরিপূর্ণ করলে পর আমরা ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠব, কারণ মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রেমই প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের প্রেমের ভিত্তি ও আদর্শ, বা অন্য কথায় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম হল আমাদের প্রতি তাঁরই প্রেমের সাড়া বা প্রতিবিম্ব এবং ভ্রাতৃপ্রেমেই শুধু তা বাস্তবায়িত ও প্রমাণিত হয়।

২:১৬—কেননা জগতের যা কিছু আছে ...: 'জগতের এবং তার রিপুগুলির প্রভাব নদীর স্রোতের মত তার সঙ্গে আমাদের টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট নদীতীরে রোপিত গাছের মতই জন্মগ্রহণ করলেন, স্রোত কি জোর করে তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? তবে সেই গাছ আঁকড়ে ধর। জগতের আসক্তি কি তোমাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? তবে যীশুকে আঁকড়ে ধর। তিনি কালের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন তুমি যেন চিরকাল চিরজীবী হও। তিনি কালের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন কিন্তু চিরজীবী হয়ে রইলেন। পাপের ক্ষমাদানে নিজ দয়া বিতরণ করার জন্যই তিনি কালের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন। মরণশীল দেহধারী হলেও আমরা এখন থেকেও চোখ তুলে আমাদের ভাবী অমরতা দেখতে পাই; সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে টালগোল খেয়েও ভয় করব না, আমাদের আশার নঙ্গর শক্ত করে গাড়া আছে।' সাধু আগস্তিনের এ ব্যাখ্যা জগতের মাঝে আমাদের সেই অবস্থা স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করে, যখন আমরা ভাসা ভাসা জীবন যাপন করে কামপ্রবৃত্তি, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য বা যে কোন লালসা-স্রোতের প্রভাব অনুভব করি। এ স্রোতের প্রভাবে নিজেদের প্রভাবিত হতে দিলে তবে স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করে সৃষ্টবস্তুকেই ভালবাসি। জগতের আকর্ষণকে প্রশ্রয় দিলে তবে এত প্রমত্ত হয়ে যাই যে আর বুঝতে পারব না, সৃষ্টবস্তু যদি এত সুন্দর আর আকর্ষণীয়, তাহলে এ সৌন্দর্যের স্রষ্টা তার চেয়ে কত না সুন্দর আর আকর্ষণীয় হবেন। ঈশ্বরের স্থানে জগৎকে যে ভালবাসে সে যেন প্রতিমাপূজা করে: সৃষ্টবস্তুই যার ঈশ্বর তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে খ্রীষ্টানগণ পিতার কৃপায় অর্থাৎ ঐশপ্রেমের প্রভাবে জীবনযাপন করে; তাদের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে

সেই পিতার উপর নির্ভর করে যিনি আলো, সত্য ও জীবন বলে, আলো, সত্য ও জীবনদানকারী; কিন্তু জগৎ-আকাঙ্ক্ষী মানুষ জগতের ফলগুলি ভোগ করবে: অন্ধকার, মায়া, মৃত্যু। আসুন, সাধু আগস্তিনের একটি পরামর্শ দিয়ে এ পদের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করি: 'ঈশ্বর যেমন চিরজীবী তেমনি তোমরাও চিরজীবী হতে ইচ্ছা করলে ঐশপ্রেম রক্ষা করো। যা ভালবাস তুমি তা-ই হবে। তুমি কি জগৎকে ভালবাস? তাই জগৎ হবে তুমি। তুমি কি ঈশ্বরকে ভালবাস? আমার বলা উচিত, 'তাই ঈশ্বরই হবে তুমি'; কিন্তু আমি নিজ থেকে একথা বলতে সাহস করি না, সুতরাং শাস্ত্রেরই কথা শুনি, 'আমি বলছি: তোমরা ঈশ্বর এবং তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান' (সাম ৮১:৬)।"

২:১৭—আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে: জগৎ মায়ামাত্র, এমনকি ক্রুশ দ্বারা যীশু সম্পূর্ণভাবেই জগতের অধিপতিকে পরাস্ত করেছেন। পিতামুখী ও পিতার বাধ্য যীশুর অনুসরণে আর অনুকরণে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে সে চিরকালস্থায়ী' অর্থাৎ জগতের মত সে কখনও টলবে না, ঘুচেও যাবে না, বরং ঈশ্বরের মত সেও চিরজীবী থাকবে চিরকাল। এ নিশ্চয়তা-সকল কিন্তু যেন কাল্পনিক না হয়! বাস্তব বলে এ নিশ্চয়তা-সকল সেই প্রেমাজ্ঞা পালনেই প্রতিষ্ঠিত হতে হয় যে-প্রেমাচরণ খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা-বাস্তবায়নে পরিণত করে, বা অন্য কথায়, যে-প্রেমাজ্ঞা পালনে খ্রীষ্টমণ্ডলী হয়ে ওঠে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাস্তব প্রকাশ: যীশুর প্রেমাজ্ঞা অনুসারে যে জীবনযাপন করে সে এখন থেকেই অনন্ত ঐশজীবন পেয়ে গেছে, সে এখন থেকেই পুনরুত্থিত ও অমর এবং পরম ত্রিত্বের আবাস। ফলত সে এ মায়াময় ও নশ্বর জগৎ থেকে মুক্ত। জীবনকালে খ্রীষ্টানকে হয় ঈশ্বরের না হয় জগতের উপর নির্ভর করতে হয়; যেমন দু'টো নৌকায় পা দেওয়া অসঙ্গত তেমনি দু'জন প্রভুকে সেবা করাও নিতান্ত অসম্ভব।

খ্রীষ্টবৈরীর বিষয়ে সাবধান (২:১৮-২৯)

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, পাপের ক্ষমা এবং ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হলেও তবু খ্রীষ্টমণ্ডলী এখনও জগতের মায়াতে আকৃষ্ট হতে পারে। যোহনের স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিবেশে উপস্থিত ভ্রান্তমতপন্থীরা জগতেরই বলে এবং তাদের আক্রমণ থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টান যাতে রক্ষা পায় এজন্য যোহন তাদের বিষয়ে কথা বলতে প্রবৃত্ত: তারা কারা, তাদের ভ্রান্তমতের কী রূপ এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রত্যাশিত পরিত্রাণের জন্য তাদের আবির্ভাবের তাৎপর্য কী, এগুলিই এ অংশের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু, আমরা যেন মনে না করি যোহনের উদ্দেশ্যই ভ্রান্তমতাবলম্বীদের আক্রমণ করা; বরং ভ্রান্তমতাবলম্বীদের উপস্থিতি তাঁর কাছে একটি সুযোগমাত্র তিনি যেন বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও প্রমাণ করতে পারেন পত্রটির প্রকৃত প্রসঙ্গ: খ্রীষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাপ্রাপ্ত। প্রথম প্রমাণ ১৮ পদে ব্যক্ত: ভ্রান্তমতাবলম্বীরা খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ত্যাগ করায় একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা কখনও খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সভ্য হয়নি, ফলত ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের কোন জীবন-সহভাগিতা নেই, কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা শুধু খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযোগেই প্রাপ্য (১:৩)। দ্বিতীয় প্রমাণ ২২ পদে ব্যক্ত: ভ্রান্তমতাবলম্বীরা খ্রীষ্টান নয়, কারণ খ্রীষ্ট বলে যীশুকে অস্বীকার করায় পিতাকেও তারা অস্বীকার করতে বাধ্য, ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের কোন জীবন-সহভাগিতা নেই। অপরপক্ষে প্রকৃত খ্রীষ্টানগণ এমন সৃজনী ঐশশক্তি প্রাপ্ত যা সত্যকে নির্ণয় করতে তাদের সক্ষম করে।

২ [১৮] বৎসেরা, এই তো অন্তিম ক্ষণ!
তোমরা শুনেছিলে যে, খ্রীষ্টবৈরী আসছে।

দেখ, এর মধ্যে বহু খ্রীষ্টবৈরী আবির্ভূত হয়েছে;
এতে আমরা জানতে পারি যে, এটি অন্তিম ক্ষণ।
১৯ তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে,
অথচ তারা আমাদেরই ছিল না;
কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত;
কিন্তু এমনটি ঘটেছে যেন প্রকাশিত হয় যে, সকলে আমাদের নয়।
২০ তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে,
যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ
—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।
২১ আমি তোমাদের এমনটি লিখিনি যে তোমরা সত্য জান না,
বরং, তোমরা তা জান, এবং এও জান যে,
সত্য থেকে কোন মিথ্যা আসে না।
২২ যীশু যে সেই খ্রীষ্ট, একথা যে অস্বীকার করে,
সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে?
সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে।
২৩ পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি;
পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে।
২৪ যা তোমরা আদি থেকে শুনেছ, তা যেন তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে;
যা আদি থেকে শুনেছ, তা যদি তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে,
তবে তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে স্থিতমূল থাকবে।
২৫ আর যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন,
সেই প্রতিশ্রুতি এ—অনন্ত জীবন।
২৬ যারা তোমাদের প্রতারণা করতে চায়,
তাদেরই বিষয়ে তোমাদের এই সমস্ত লিখেছি।
২৭ তোমরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ,
তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে,
আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।
কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই
তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে
—আর সেই তৈলাভিষেক সত্য, মিথ্যা নয়!—
এজন্য তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে,
তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক।
২৮ তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক,
তিনি যখন আবির্ভূত হবেন,
তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি, এবং তাঁর আগমনে
আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।
২৯ তোমরা যদি জান, তিনি ধর্মময়,
তবে এও জেনে নাও যে,
যে কেউ ধর্মাচরণ করে, সে তাঁরই থেকে সঞ্জাত।

২:১৮খ—তোমরা শুনেছিলে যে, খ্রীষ্টবৈরী আসছে: 'খ্রীষ্টবৈরী' শব্দ কেবলমাত্র যোহনের পত্রাবলিতে ব্যবহৃত। এ শব্দবিশেষ হিব্রু একটি ধারণা ও ভাষা নির্দেশ করে। তারা বলত নাকি অন্তিমকালে খ্রীষ্ট-মসীহের একটি শত্রুর আবির্ভাব ঘটবে। তাদের ধারণায়, ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরনিযুক্ত ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে জগতের অবিরত

বিদ্রোহ ও আক্রমণ একদিন একটি হিংস্রতম ও ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তি দ্বারা তীব্রতম পর্যায়ে চালিত হবে, তবু অবশেষে সেই বিদ্রোহী স্বয়ং খ্রীষ্ট-মসীহ দ্বারা পরাস্ত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে। এ হিব্রু ধারণার প্রভাব আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীতেও রেখাপাত করল, ফলে আদিখ্রীষ্টবিশ্বাসীরা সেকালে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে নির্যাতনকারী কয়েকটি হিংস্র রোমীয় সম্রাটকে খ্রীষ্টবৈরী মনে ক'রে ঐশগৌরবভূষিত খ্রীষ্ট-মসীহের গৌরবময় পুনরাগমনের জন্য ব্যাকুল অপেক্ষায় ছিল (২ থে ২:৩ …; প্রত্যা ১৩:১ …; ১৯:১৯; মার্ক ১৩:১৪ …)। পত্রটি কিন্তু আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রচলিত ধারণা থেকে একটু ভিন্ন; রোমীয় সম্রাটেরা নয়, খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাইরে থেকে আগত শত্রুরাও নয় বরং স্বয়ং খ্রীষ্টমণ্ডলীর এমন বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্য যারা যীশুকে খ্রীষ্ট-মসীহ বলে অস্বীকার করছিল তারাই যোহনের মতে প্রকৃত খ্রীষ্টবৈরী। কিন্তু তবু তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে সেই খ্রীষ্টানদের দ্বারা যারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর একতায় আদি থেকে প্রাপ্ত সংবাদের বিশ্বস্ততায় অধ্যবসায়ী।

২:১৮গ—এতে আমরা জানতে পারি, এটি অন্তিম ক্ষণ: 'অন্তিম কাল' বা 'অন্তিম ক্ষণ'ও সেকালের প্রচলিত সাধারণ কথা। যোহন-রচিত সুসমাচারেও একথা একাধিকবার উল্লিখিত এবং এবিষয়ে একটি পরিশিষ্ট উপস্থাপিত হয়েছে। (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'অন্তিমকাল' পরিশিষ্ট, পৃঃ ২০৪ দ্রষ্টব্য)। তবু এ প্রসঙ্গে চতুর্থ সুসমাচার অপেক্ষা পত্রটির সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ পৃথক: খ্রীষ্টমণ্ডলীর বর্তমান ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাগুলিই প্রকাশ করে 'অন্তিম ক্ষণ' আগতপ্রায়। চতুর্থ সুসমাচার অনুসারে 'অন্তিম ক্ষণটি' ক্রুশের উপর যীশুর উত্তোলন-গৌরবায়ন ক্ষণ' নির্দেশ করত; পত্রটি অনুসারে, যীশুর উত্তোলন-গৌরবায়ন অবধি তাঁর গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত যে কাল, সেটিকে বলে 'অন্তিম ক্ষণ'। অর্থাৎ যীশুর মৃত্যুতে নতুন এক 'ক্ষণের' আবির্ভাব হয়েছে আর যীশুর পুনরাগমন হবে তার অন্ত। এ 'অন্তিম ক্ষণের' বিশিষ্টতা এ, ঈশ্বরের অন্তিম বিচারের আগে—যে বিচার যীশুর পুনরাগমনের পরপরই ঘটবার কথা—জগৎসংসারের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, আর সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষ হয় খ্রীষ্টবিশ্বাসী, না হয় খ্রীষ্টবৈরী রূপে দাঁড়ায় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সে ঈশ্বর দ্বারা বিচারিত হবে। সুতরাং এতেই 'খ্রীষ্টবৈরী' এবং 'অন্তিম ক্ষণের' মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচিত, এমনকি অনেক খ্রীষ্টবৈরীর আবির্ভাব অধিক প্রমাণ করে অন্তিম ক্ষণ এসে গেছে। যোহনের ধারণায় যে খ্রীষ্টবৈরীরা বাস্তব ব্যক্তি, একথা বলা হয়েছে এবং এবিষয় পরবর্তী পদগুলিতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে; 'অন্তিম ক্ষণ' যে যীশুর আগতপ্রায় পুনরাগমন নির্দেশ করত একথাও বলা হয়েছে। কিন্তু তবু এ কথাগুলি বলে এই পদের ব্যাখ্যা এখানে সমাপ্ত করা চলবে না। আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর কাল অপেক্ষা বর্তমানকাল ভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন বলে এ বর্তমানকালের উপর যেন যোহনের কথা থেকে আলোকপাত করে এজন্য অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া বাঞ্ছনীয়: আজকার দিনে আমরা যীশুর পুনরাগমনের জন্য অতিব্যাকুল অপেক্ষা করি না, একথা স্বীকার্য; কিন্তু এজন্য আমাদের মনে করা উচিত না, 'অন্তিম ক্ষণ' ধারণাটি আমাদের জন্য অর্থহীনপ্রায় হয়ে গেছে, বরং ধারণাটির মর্ম উদ্ঘাটন ক'রে আমাদের অনুভব করা উচিত, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় কালের এক এক ক্ষণ হল অন্তিম ক্ষণের মত। অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রায় আমাদের সততই পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকতে হয়, নিত্যই আমরা সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব, কারণ ক্রুশবিদ্ধ-ক্রুশোত্তোলিত-গৌরবান্বিত বলেই তিনি আমাদের বিজয়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ। এবং অবিরত সচেতন হবে যে, 'অন্তিম ক্ষণের' মানুষ বলে এখন থেকেই আমরা ত্রাণকর্তা যীশুর দেওয়া অনন্ত জীবন যাপন করছি। খ্রীষ্টবিশ্বাসী-অনুচিত আচরণ—বিশেষত ভ্রাতৃপ্রেম অবহেলা ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলীর একতা ত্যাগ করা—এখন-যাপিত অনন্ত জীবন থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে এবং ফলত 'খ্রীষ্টবৈরী' ভূমিকায়ই আমাদের নিক্ষেপ করবে, এ সচেতনতায়ও আমাদের থাকা প্রয়োজন।

‘খ্রীষ্টবৈরী’ ধারণাকে আমাদের জন্য প্রযোজ্য করতে গিয়ে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা উপকারী মনে করি; বর্তমানকালীন খ্রীষ্টবৈরী চার প্রকার:

১। যারা বাহ্যত খ্রীষ্টপন্থী হলেও বিভিন্ন কারণবশত খ্রীষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তরে বাস না করায় তার দেহের বাস্তব অঙ্গ নয়, তারা যীশুর শত্রু বা খ্রীষ্টবৈরী। এর উদাহরণস্বরূপ বর্তমানকালের সকল ভ্রান্ত-খ্রীষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য।

২। যারা সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর সঙ্গে পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণ করলেও সেগুলিতে উপস্থিত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে না, তারা খ্রীষ্টবৈরী।

৩। যারা যীশুকে খ্রীষ্ট-মসীহ বলে অস্বীকার করে, তারা খ্রীষ্টবৈরী (এ প্রসঙ্গে পরবর্তী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪। যারা মুখে যীশুকে স্বীকার করে অথচ খ্রীষ্টমণ্ডলীর একতা ও সার্বজনীনতা রোধ ক'রে নিজ নিজ জীবনাচরণে যীশুকে অস্বীকার করে, এ সকল খ্রীষ্টান প্রকৃত খ্রীষ্টান নয়, তারা খ্রীষ্টবৈরী। এমনকি যারা মুখে যীশুকে স্বীকার করে এবং কাজকর্মে তাঁকে অস্বীকার করে অর্থাৎ যত ঈশ্বরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী, অপকর্মা, জাদুকর, জাদুতে বিশ্বাসী, ব্যভিচারী, মদখোর, গাঁজাখোর, জুয়াখোর, সুদখোর ইত্যাদি অসৎ লোক এবং যারা পুরোহিতদের দেখে আপন খ্রীষ্টমণ্ডলীকে পরিচালনাকারী ও সংশোধনকারী যীশুকে দেখতে পারে না, ফলত তাদের কথা, পরামর্শ ও উপদেশ মানে না, এরা সবাই অন্যান্য খ্রীষ্টবৈরীদের চেয়ে অধিকতর খ্রীষ্টবৈরী; খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে বা বাইরে থাকুক, এরা খ্রীষ্টবৈরী।

২:১৯—তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে: আবার যোহনের স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অনুমান করা যেতে পারে, যারা খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছিল তারা নিজেদের বেলায় খ্রীষ্টান পরিচয় দেওয়াতেও নিজেদের খ্রীষ্টবৈরী প্রমাণ করেছে। এরা আগে খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হয়েছিল আর এখন তার ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে তার সর্বনাশ ঘটাবার জন্য সচেষ্ট আছে। সম্ভবত এরা মণ্ডলীচ্যুতও ছিল না; বস্তুত যোহনের সাবধান বাণীগুলি ইঙ্গিত করে, তারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর জন্য বাস্তব বর্তমান একটা বিপদ; এমনকি এরা হয়ত নিজেদেরই প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলী মনে করত! এদের প্রধান কাজ হল তাদের ভ্রান্তমত প্রচার করা। কিন্তু যোহন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রাক্তন সভ্য হলেও তারা আসলে তার প্রকৃত সন্তান কখনও হয়নি, অর্থাৎ তারা কখনও সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টমণ্ডলীর হয়নি; কারণ তারা যদি সত্যিকারে কখনও মনেপ্রাণে মণ্ডলীর হত, তাহলে সত্য বিশ্বাস বজায় রেখে মণ্ডলীকে ত্যাগ করত না: খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে বাহ্যিক সংযোগ আন্তরিক, অভ্যন্তরীণ ও অধ্যাত্ম সংযোগের প্রমাণ নয়। সুতরাং, যোহনের পক্ষে খ্রীষ্টবৈরীরা হল সেই সকল খ্রীষ্টান যারা নিজেদের নিষ্পাপ (১:৮) এবং অন্যান্য খ্রীষ্টানদের পাপী মনে ক'রে তাদের কাছ থেকে নিজেদের পৃথক করে, যারা ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধন পরিত্যাগ করে (২:৯-১১) এবং প্রেরিতদূতগণের হস্তান্তরিত খ্রীষ্টবিশ্বাসকে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে। একথাগুলো থেকে অনুমান করতে পারি, সেকালের খ্রীষ্টমণ্ডলীর অবস্থা অনেকটা বর্তমানকালের মত: ‘খ্রীষ্টমণ্ডলীর সকল সদস্য’ এবং ‘খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সদস্য’ একই কথা নয়। পলের সময়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সমস্যা অন্যরকম ছিল; সেকালে তিনি নকল প্রেরিতদূতগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন (গা ৩:১; ৫:৭ ইত্যাদি); কিন্তু যোহন এমন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেরই বিপক্ষে সংগ্রামরত যাদের তিনি নিজেই ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন, যাদের তিনি নিজেই দীক্ষিত করে নিজের স্থানীয় মণ্ডলীতে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তবুও যোহন দ্বিধাবোধ করেন না। বড় দুঃখে আক্রান্ত হলেও তিনি বলেন সেই সকল মানুষ কখনও খ্রীষ্টমণ্ডলীর হয়নি, এমনকি তাদের বিচ্ছেদের প্রয়োজনই ছিল যাতে মণ্ডলীর খাঁটি এবং নকল সদস্যদের পরিচয় স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

সমরূপ কথা পলও বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য, তাতে দেখা যাবে তোমাদের মধ্যে কারাই খাঁটি (১ করি ১১:১৯)।'

২:২০—তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে …: এখানেও যোহনের শিক্ষার পদ্ধতি প্রকাশ পায়; আপন খ্রীষ্টভক্তদের রক্ষা ও বলবান করার জন্য, তারা যা পেয়েছে এবং যা হয়ে উঠছে তা-ই তিনি তাদের স্মরণ করার। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি ভ্রান্তমতাবলম্বীজনিত সমস্যার সুযোগ নিয়ে আপন উদ্দেশ্য অধিকতর স্পষ্ট করে তোলেন। তাদের বিষয়ে যা বলেছেন তা যথেষ্ট, কারণ তাঁর মতে প্রত্যেকজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর উপরই ঘটনাগুলি বিচার করার ভার নির্ভর করে। বস্তুত, খ্রীষ্টমণ্ডলীর একটি মহাসম্পদ আছে, তা হল সেই জ্ঞানদায়ী তৈলাভিষেক যা মণ্ডলী সরাসরি পেয়েছে সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে, পরমপবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে অতুলনীয়ভাবে এক হওয়াতে যিনি নিজেও পরমপবিত্র। 'তৈলাভিষেক' বলতে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ খ্রীষ্টবাণী বোঝায়। বা আরও সূক্ষ্ম সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পারি 'তৈলাভিষেক' হলেন যীশুর বাণীতে অবস্থানকারী শক্তির সারস্বরূপ পবিত্র আত্মা; এ তৈলাভিষেকে আমরা অভিষিক্ত হয়েছি দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে অবস্থানকারী পবিত্র আত্মার ভূমিকা হল আমাদের কাছে যীশুর বাণীকে অনবরত স্মরণ করানো (যোহন ১৪:২৬) আমরা যেন সেই ঐশবাণীর আলোতে জীবনযাপন করি। অর্থাৎ পবিত্র আত্মা হলেন ঐশবাণী-খ্রীষ্টের সাক্ষী, যিনি আমাদের অন্তরে বিদ্যমান হয়ে এমনভাবে কাজ করেন ঐশবাণী-খ্রীষ্ট যেন আমাদের অন্তরে বসবাস করে এমন বর্ধমান ক্রিয়াশীল শক্তি হয়ে ওঠেন যা দ্বারা আমরা বিশেষত ভ্রাতৃপ্রেম পালনে উত্তম খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করতে ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হই (যোহন ১৪:১৭; ১৫:২৬)। অর্থাৎ আমাদের অন্তরে বর্তমান সত্যময় আত্মা সেই প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দান করেন যে জ্ঞানের আলোতে আমাদের জীবনযাত্রা উপযুক্তভাবে চালনা করতে পারি। আদি থেকে প্রচারিত (২:৭,২৪) যীশুর সংবাদ সম্বন্ধে যখন ধ্যান করি তখন পবিত্র আত্মাই সেই ধ্যানের আলো দান করেন আর তিনিই সেই বাণীর জীবনবাস্তবায়নে আমাদের চালনা করেন।

এ পদটির শেষ উক্তি কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট লাগতে পারে, 'তোমরা সকলেই একথা জান।' সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, সেই 'তোমরা' কোন্ কথাই বা জানে? সুধী পাঠক স্মরণে রাখবেন যোহন নিজ মাতৃভাষায় পত্রটি লেখেননি, এজন্য এদিক ওদিক তাঁর ভাষা একটু অস্পষ্ট লাগতে পারে। যাই হোক, এর অর্থ হল, 'তোমাদের সকলের প্রকৃত জ্ঞান আছে'—যে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের অন্তরে অবস্থানকারী সত্যময় আত্মাই সতত প্রদান করে থাকেন।

২:২১—আমি তোমাদের এমনটি লিখিনি যে তোমরা সত্য জান না: যেহেতু সত্যময় আত্মাপ্রাপ্ত, এজন্য খ্রীষ্টানগণ সত্যকে জানে এবং ফলত তারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবেই সেই ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে যথাযথ উপায় অবলম্বন করতে পারে, যে ভ্রান্তমত মিথ্যা বলে 'সত্য ঈশ্বরের' বিরোধী মত। আবার এখানে যোহনের স্বকীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রকাশ পায়: আপনজনদের রক্ষা করার জন্য তিনি তাদের স্মরণ করান তারা যা আগে থেকে জানে এবং তারা যে কী। নতুন নতুন তত্ত্বগুলি প্রচার করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের বিশ্বাস জাগরিত ক'রে কার্যকারী করা যথেষ্ট: আপন বাণীদানের মাধ্যমে স্বয়ং যীশুই আমার অন্তরে নিত্যস্থায়ী আছেন এবং পবিত্র আত্মাও আমার অন্তরে সাক্ষী ও সহায়ক রূপে বিদ্যমান আছেন, এ গভীর সচেতনতা থেকেই আমি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ নবমানুষ হয়ে এবং ঐশবাণীর সাক্ষী হয়ে জীবনযাপন করার জন্য যেন অনুপ্রাণিত হই।

২:২২ক—যীশু যে সেই খ্রীষ্ট …: যারা যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করে, এদেরই কাছ থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলী আত্মরক্ষা করতে আহূত। সর্বপ্রথমে একথা বিশদ করতে চেষ্টা করি, যীশুকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার বা অস্বীকার

করার অর্থ কি? আপাতব্যাখ্যা এটি হতে পারে: 'যীশু' এবং 'খ্রীষ্ট' ভিন্ন অর্থবহ শব্দ। আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট একই ব্যক্তি মাত্র বটে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম হল 'যীশু'। যেমন এলিয়, মোশী এবং আমরা এক এক জন একটি নাম দ্বারা পরিচিত, তেমনিভাবে আমাদের প্রভুর নামবিশেষ হল 'যীশু'। তাছাড়া তিনি খ্রীষ্ট বলেও অভিহিত, কিন্তু 'খ্রীষ্ট' শব্দটি পবিত্র ধরনের একটি ভূমিকা নিরূপণ করে। যেমন এলিয় এবং ইসাইয়া 'নবী'-ই ছিলেন এবং আরোন ছিলেন যাজক, তেমনিভাবে 'খ্রীষ্ট' বলতে 'তৈলাভিষিক্ত' বোঝায়, অর্থাৎ যাঁকে প্রভু ঈশ্বর মানবজাতির পরিত্রাণকর্ম সাধনের জন্য নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং এ আপাতব্যাখ্যা অনুসারে, যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করলে সমর্থন করা হয় যীশু জগতের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত হননি। এ ব্যাখ্যা যত সত্যাশ্রয়ী হোক না কেন, তবু যোহনের ভাব এর চেয়ে অধিক গভীর; তাঁর ভাব এ পদের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত।

২:২২গ—সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে: এ উক্তি থেকে অনুমান করতে হয়, যীশুকে খ্রীষ্ট বলে যে অস্বীকার করে সে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলেই অস্বীকার করে (৫:৫), অর্থাৎ পিতা ও পুত্র যে একই ঈশ্বর তা-ই অস্বীকার করে (১:২ ...; যোহন ১৭:১১,২২)। সুতরাং যীশুর বিষয়ে যার মত ভ্রান্তিপূর্ণ, ঈশ্বরের বিষয়েও তার মত ভ্রান্তিপূর্ণ। অর্থাৎ ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু জানতে হলে, তিনি যীশুতে যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই ঐশপ্রকাশ গ্রহণেই শুধু তাঁকে জানা সম্ভব। যোহনের স্বকীয় ভাষায়, যীশু হলেন পিতার শেষ ও চরম প্রকাশকর্তা, পুত্রকে যে সম্মান করে পিতাকেও সে সম্মান করে (যোহন ৫:২৩), পুত্রকে যে জানে পিতাকেও সে জানে (যোহন ৮:১৯; ১৪:৭), পুত্রকে যে দেখেছে পিতাকেও সে দেখেছে (যোহন ১৪:৯), পুত্রকে যে ঘৃণা করে পিতাকেও সে ঘৃণা করে (১৫:২৩); পুত্রকে যে জানে না পিতাকেও সে জানে না (১৬:৩; ১৭:৩)। যোহন অনুসারে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নাজারেথীয় যীশুতে ঐতিহাসিকভাবেই ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আর তিনি চেয়েছেন তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস সেই ঐতিহাসিক ঐশপ্রকাশেই অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টে এবং তাঁর সকল বাণীতেই স্থাপিত হোক। এজন্যই যীশু যে খ্রীষ্ট একথা যে অস্বীকার করে স্বয়ং ঈশ্বরকেও সে অস্বীকার করে। সুতরাং যোহনকালীন ভ্রান্তমতপন্থীরা যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অর্থাৎ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার করায় যীশুকে 'মাংসে আগত' খ্রীষ্ট বলেও (৪:২ ...; ২ যোহন ৭) অস্বীকার করে অর্থাৎ মানবীয় অবস্থায় ঐতিহাসিকভাবে জীবনযাপনকারী যীশুকে এবং ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট সেই ঈশ্বরের পুত্রকে একই ব্যক্তি বলে অস্বীকার করে: তাদের ভ্রান্তমতে, পরমপবিত্র, সৃষ্টিকর্তা, আলো ও সত্যের খ্রীষ্ট-ঈশ্বরের মধ্যে এবং জগতের সৃষ্টজীব একটি নশ্বর মানুষের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আদৌ থাকতে পারে না; তাদের কয়েকজন বলত, যোসেফ ও মারীয়া থেকে জাত একটি সাধারণ মানুষ-মাত্রই যীশু, শুধু পরবর্তীতেই—দীক্ষাস্নানের সময়েই—স্বর্গীয় খ্রীষ্ট-ঈশ্বর সেই সাধারণ মানুষ যীশুতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; অন্য কয়েকজন যীশুখ্রীষ্টকে 'মাংসবহনকারী' বা 'দেহবহনকারী' বলে অস্বীকার করত। এ ভ্রান্তমতগুলি সমর্থনে যীশুকে সত্যকার ও প্রকৃত খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করায় তারা পিতাকেও অস্বীকার করে এবং যীশুতে ঈশ্বরের পুত্রকে গ্রহণ না ক'রে মানবজাতির কাছে সত্যকার ও অনন্ত জীবন প্রদানকারী ত্রাণকর্তাকে অগ্রাহ্য করে (যোহন ১:১৮; ১০:৩০; ১৪:৬-১২; ১৭:১১ ...)।

এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য: যোহন অনুসারে যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করলে এমন মারাত্মক ফলের আবির্ভাব হয় যা খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে ফেলে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যোহন নিজেই এ প্রসঙ্গে—খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য-জীবন প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসেই প্রতিষ্ঠিত—আলোচনা করবেন।

২:২৩—পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে …: এখানে পূর্ববর্তী পদের ধারণা অন্য কথায় পুনরুপস্থাপিত হয়। অন্য কথা ব্যবহৃত বিধায় সেই ধারণার নতুন এক দিক ভেসে ওঠে: পুত্রকে যে স্বীকার বা অস্বীকার করে পিতাকেও সে স্বীকার বা অস্বীকার করে, এটি ছিল পূর্ববর্তী পদের মূলসূত্র; এর অনুবর্তী নতুন দিক এটি, পিতা ও পুত্রকে স্বীকার বা অস্বীকার করা এমন তাত্ত্বিক ক্রিয়া নয় যা আমাদের বাস্তব জীবনের জন্য উপকারী না হলেও চলে; বস্তুতপক্ষে পিতা ও পুত্রকে স্বীকার করার উপরই পিতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা নির্ভর করে, তাঁদের স্বীকার করলে তবে এখন থেকেই আমরা তাঁদের ঐশজীবনের সহভাগী হয়ে উঠি, ফলে তাঁদেরই ঐশজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন করতে অর্থাৎ প্রেমাজ্ঞা পালন করতে পারি। আসলে যোহন পত্রটির প্রথম সূত্রগুলি পুনঃপাঠ ও পুনর্ধ্যান করতে আমাদের পরামর্শ দেন: ঐশজীবনকে যিনি দেখেছেন ও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি জানেন, শুধু যীশুর প্রেমাজ্ঞা পালনেই সত্যকার জীবন যাপন করা সাধ্য। অপর দিকে, যে কেউ ভ্রান্তমত পালন করে, অর্থাৎ যে কেউ যীশুকে মানবেশ্বর বলে স্বীকার না করলেও ঈশ্বরকে জানে বলে দাবি করে এবং তাই ক'রে জীবনের প্রকাশ থেকে অনন্য জীবনদাতাকে বিচ্ছিন্ন করে, সে সেই আলো, সত্য ও জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে।

এ বচনগুলি খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে আনন্দিত করে তোলে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আত্মতৃপ্তির জন্য শুধু নয়; সেগুলি বাণীপ্রচারের জন্য আমাদের দায়িত্ববোধও স্থাপন করে, বিভিন্ন কারণে যারা আজও এ জীবনদায়ী সত্য অবগত নয় তারাও যেন এখন থেকেই ঈশ্বরের ঐশজীবনের সহভাগী হতে পারে। অর্থাৎ খ্রীষ্টান নন যাঁরা, তাঁদের যদি সত্যিকারে ভালবাসি তবে তাঁদের পূর্ণ আনন্দও সাধন করতে চাইব, যে আনন্দ যীশুকে গ্রহণ করলে এবং যীশুর মাধ্যমে পিতাকে গ্রহণ করলে তবেই প্রাপ্য। যতক্ষণ মানুষ স্রষ্টা ঈশ্বরের সঙ্গে যীশুকেও প্রকৃত ঈশ্বর বলে আরাধনা করে না, ততক্ষণ সে পূর্ণ আনন্দ পেতে অক্ষম, কারণ সেই আনন্দ যীশুর সংযোগে ও তাঁর মাধ্যমে জ্ঞাত ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায় রোপিত আছে। এবিষয়ে এখানে অতিরিক্ত আলোচনা করা অসম্ভব, তবু একথা যথেষ্ট হোক: বাণীপ্রচারের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হল আমাদের খাঁটি খ্রীষ্টীয় জীবনের আদর্শ; এমন খ্রীষ্টীয় জীবন যা প্রেমসাধনায়, বিশপগণের সঙ্গে একতায়, খ্রীষ্টপ্রসাদগ্রহণে এবং অবিরত প্রার্থনায় যাপিত জীবন (শিষ্য ২:৪২-৪৭; ৪:৩২-৩৫; ৫:১১-১৬), কারণ শুধু এ শর্তগুলি বজায় রেখে আমরা পিতা ও পুত্রকে জানতে এবং ফলত তাঁদের কথা প্রচার করতে পারি। কিন্তু, আমাদের জীবনে খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্য বহন না ক'রে অর্থাৎ উল্লিখিত শর্তগুলি না মেনে যদি বাণীপ্রচারকর্ম চালিয়ে যাই তাহলে আমরা মিথ্যাবাদী ও খ্রীষ্টবৈরী।

২:২৪—যা তোমরা আদি থেকে শুনেছ: প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জন্য যা অতিপ্রয়োজনীয়, একথা যোহন আর একবারই ঘোষণা করেন: খ্রীষ্টীয় জীবনের শুরুতে যে ঐশবাণী ও খ্রীষ্টশিক্ষা শুনেছে, প্রকৃত খ্রীষ্টান সেগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, কারণ মানুষের প্রচারিত বাণী হলেও সেই বাণী ঈশ্বরেরই বাণী, অর্থাৎ সেই বাণী পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ এমন বাস্তবতা যা খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অন্তরে বিরাজ করে ও তার জীবনের পরিবর্তন ঘটায়। ঐশবাণী-যীশুর মাধ্যমে এবং সেই ঐশবাণী-যীশুর সংযোগে আমরা পিতাতে ও পুত্রেতে স্থিতমূল থাকি, অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সেই জীবন-সংযোগ লাভ করি যা অনন্ত জীবনের নামান্তর। এবিষয়ে ২:৩-এর ব্যাখ্যা স্মরণযোগ্য।

২:২৫—আর যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন …: আমাদের কাছে অনন্ত জীবনদানের বিষয়ে যীশুর যে প্রতিশ্রুতি, তা আমাদের মৃত্যুর পরে পূর্ণ হবে এমন নয়, বরং তাঁর 'মৃত্যু-গৌরবায়ন ক্ষণেই' তা সিদ্ধিলাভ করেছিল, কারণ ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করাতেই তিনি পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন অর্থাৎ

পিতার কাছ থেকে আপন ঐশজীবনদান করার অধিকার লাভ করেছিলেন। সুতরাং যীশুর প্রতিশ্রুতি এখনই কার্যকারী; এখনই আমরা সেই ঐশজীবনে সঞ্জীবিত এবং ঈশ্বরের জীবনের সহভাগী। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করা, এমনকি এই জীবন-সহভাগিতায় অধিকতর বাস্তব, সক্রিয় ও গভীরভাবে সহভাগী হওয়া ইহজগতে থাকাকালে আমাদের কর্তব্য: মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে আমরা যে ঐশজীবন সম্পূর্ণরূপেই লাভ করব, এখন থেকেই সেই ঐশজীবন দ্বারা নিজেদের নবগঠিত ও প্রভাবিত হতে দিতে হয়। মৃত্যুর পর আমরা ঈশ্বরে পূর্ণজীবন যাপন করব, মৃত্যুর পর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জীবনবন্ধনে মিলিত থাকব, এ চিন্তাই ঈশ্বরকে অতি শীঘ্র পাবার আকাঙ্ক্ষায় ও প্রত্যাশায় আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবে। সোনা নয়, রূপো নয়, বাগান-বাড়ি নয়, জমিজমাও নয়, বরং যে ঈশ্বরের সঙ্গে ইতিমধ্যে জীবন-সহভাগিতা পেয়েছি, তাঁকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে পাব বলে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ নিশ্চয়তা থেকে আনন্দই প্রকাশ পায়, যে আনন্দ দানের কথা যীশু মরণের পূর্বে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এবং যে আনন্দকে দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন অবধিও পূর্বাস্বাদন করছি। যেমন যীশু বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও সর্বদাই সচেতন ও নিশ্চিত ছিলেন তিনি ও পিতা এক আর তাঁর মৃত্যুতে পিতা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, তেমনি আমরাও বিভিন্ন বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হলেও যেন সতত সচেতন ও নিশ্চিত হই, এ বর্তমানকাল থেকেই ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রাজত্ব করছেন এবং আমাদের মৃত্যুতে আমাদের সঙ্গে তাঁর সেই পূর্ণসংযোগে আমাদেরও গৌরবান্বিত করবেন (অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য: যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'জীবন' পরিশিষ্ট পৃঃ ১৮০ দ্রষ্টব্য)।

পত্রটির ব্যাখ্যায় বারবার সাধু আগস্তিনের কথা উল্লেখ করেছি। তিনি ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাস্কা পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ ধরে হিপ্পো শহরের মহাগির্জায় পত্রটির ব্যাখ্যা দিয়ে আসছিলেন। যেদিন তিনি পত্রটির এ পদটির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেই ৯ই এপ্রিলও অন্যান্য দিনের মত ক্যাথিড্রাল গির্জা বিশ্বাসীতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি অনন্ত জীবন সম্বন্ধে এতই সুন্দরভাবে কথা বলতে পেরেছিলেন যে উপস্থিত সকল বিশ্বাসী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আনন্দে মেতে উঠে চিৎকার না করে ও করতালি না করে পারল না, ফলে তিনি কিছু সময়ের জন্য উপদেশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন। চিৎকার ও করতালি শেষে তিনি যীশুর প্রতি বিশ্বাসীদের অনুরাগ দেখে তাদের বললেন, 'তোমরা শুনেছ এবং আনন্দে চিৎকার করেছ। যা শুনেছ তা ভালবাস বলেই চিৎকার করেছ।' কথিত আছে সেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের বিশপের অনুপ্রেরণাপূর্ণ কথা শুনে অনেকবার তাঁর উপদেশের সময় হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করত।

২:২৭ক—তোমরা (…) যে তৈলাভিষেক পেয়েছ: 'ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত' খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কাছে দেওয়া ঐশজীবন স্বভাবতই এমন নিত্যস্থায়ী জীবন, যা খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের সঙ্গে সক্রিয়, সচেতন ও নিত্যস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং প্রেমে 'স্থিতমূল থাকতে' খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে অনুপ্রাণিত করার কথা। তা সম্ভবপর হয় যদি 'ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত' এই আমরা দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই 'তৈলাভিষেকের' প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে তাকে কাজ করতে দিই—যে তৈলাভিষেক হল যীশুর বাণী যা আমাদের অন্তরে সদাবিদ্যমান থাকে এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা সৃজনশীল, ক্রিয়াশীল আর সজীব করে তোলা হয়। এ পর্যায়ে আমাদের অন্তরে সদাবিদ্যমান খ্রীষ্টের বাণীর কাজ এবং জীবনদায়ী পবিত্র আত্মার কাজ একই কাজ বলে গ্রহণীয়, যাতে 'পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত খ্রীষ্টের বাণী' এবং 'খ্রীষ্টের বাণীর অনুপ্রেরণাদায়ী ঐশশক্তিস্বরূপ পবিত্র আত্মা' উভয় সংজ্ঞা একই অর্থ বহন করে। সুতরাং আসুন, আমরা যে বাস্তবতা বিশ্বাস করি তার গতি অধিক গভীরে বুঝতে এবং ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মার মধ্যে যে সম্পর্ক তাও অধিক সূক্ষ্মরূপে অনুভব করতে সচেষ্ট হই: ঐশবাণী হল সেই বাস্তবতা যা যীশু আমাদের

কাছে রেখে গিয়েছেন; তাতে স্থিতমূল থাকলে অর্থাৎ বাণী পাঠ, ধ্যান ও পালনের মাধ্যমে তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তবে তিনি প্রতিক্ষণে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকেন এবং আমরা তাঁতে বিদ্যমান থাকি। কিন্তু তিনি চেয়েছেন, পবিত্র আত্মাই সেই বাণীর প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন এবং বাণীবাস্তবায়নে আমাদের সহায়তা করবেন; পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করা হয়েছে যীশুর গৌরবায়ন-ক্ষণে, সুতরাং এখন তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। কিন্তু ঐশবাণীতে যা প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলে যা লিপিবদ্ধ আছে তার বিষয়েই মাত্র তিনি শিক্ষা দেন এবং মাত্র সেই বাণী অনুসারেই কাজ করেন। উপসংসারে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য: খ্রীষ্টের বাণী ও খ্রীষ্টের দেওয়া পবিত্র আত্মা দু'টো বাস্তবতা বটে, কিন্তু যেহেতু তাঁদের কাজ পরস্পর পরিপূরক এজন্য এদিক দিয়ে এঁরা অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা বলেই গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতি রাখা যীশুর দাবি এ, তাঁর বাণীতে স্থিতমূল থাকা অর্থাৎ দীক্ষাস্নানে গৃহীত বিশ্বাসে অটলভাবে বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান আর অধ্যবসায়ী থাকা, যেন পবিত্র আত্মা পূর্ণ সত্যের মধ্যে আমাদের চালনা করেন (যোহন ১৪:২৬) এবং উত্তম প্রেম সাধনায় আমাদের সহায়তা করেন।

২:২৭খ—আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে …: তৈলাভিষেকের কথা বলার পর যোহন খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর বিষয়ে নিজ শিক্ষাও বন্ধ করেন, বারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা যে প্রতিটি খ্রীষ্টবিশ্বাসীতে উপস্থিত অনুপ্রেরণাদানকারী ও জ্ঞানদানকারী পবিত্র আত্মাই যীশুর বাণী সম্পর্কিত প্রকৃত শিক্ষা আমাদের দান করেন। বাণী-যীশু ও অনুপ্রেরণাদানকারী পবিত্র আত্মার প্রতি বিশ্বাস তখনই আমরা প্রকাশ করি যখন 'আদি থেকে' শোনা প্রেরিতদূতগণের শিক্ষায় বিশ্বস্ত থাকি (২:২৪)। এ পর্যায়ে হয়ত কোনো পাঠকের মনে এ প্রশ্নটি জাগতে পারে, 'সেই তৈলাভিষেক যদি সর্ববিষয়ে আমাকে শিক্ষা দেয় তাহলে কেনই বা ধর্মগুরুদের উপদেশ শুনব?' এ প্রশ্নে সাধু আগস্তিনের কথা নিয়ে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। ইতিপূর্বে তিনি বলেছিলেন প্রকৃত খ্রীষ্টান হতে হলে নামেই শুধু খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হওয়া যথেষ্ট নয়, ধর্মোপাসনাদিতে অংশগ্রহণ করাও যথেষ্ট নয়। অন্তরে আমাদের যদি না থাকে ঐশজীবন এবং আমাদের হৃদয়ের নিভৃতে পবিত্র বাইবেল ও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানকারী যীশুর কথায় যদি কান না দিই তাহলে সেই সবকিছু অর্থশূন্য হয়ে যায়। আমি যে খ্রীষ্টমণ্ডলী, এর অর্থ হল আমি যীশুর একই আত্মায় সঞ্জীবিত হয়ে জীবনযাপন করব। যখন ঐশবাণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি সেই একতার আত্মার সঙ্গে এক হই তখনই আমি খ্রীষ্টমণ্ডলী; যখন খ্রীষ্টমণ্ডলীর একতা ছিন্নভিন্ন করি তখন আমি পবিত্র আত্মারোধী, আমি মণ্ডলীর নয়। অতএব ধর্মগুরুদের উপদেশ নিষ্ফল চিৎকার মাত্র হয়, যদি আমার অন্তরে সেই উপদেশের মর্ম-প্রকাশকারী যীশুর কণ্ঠস্বর না শুনি। বাস্তবিকপক্ষে অনেকেই একই উপদেশ শোনে, অথচ একই উপকার সবাই পায় এমন নয়; তারাই উপকৃত যাদের অন্তরে ঐশবাণীই কথা বলেন এবং পবিত্র আত্মাই শিক্ষা দেন।

সুতরাং যোহনের এ পদের মর্ম সঠিকভাবেই গ্রহণ করা চাই; অনুমান করতে নেই তিনি যেন বিশপগণ ও তাঁদের নিযুক্ত বাণীপ্রচারকগণের কথার মূল্য হ্রাস করতে চাইতেন: খ্রীষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের কথা ও শিক্ষা সর্বদাই মহামূল্যবান, কেননা স্বয়ং যীশুই বলেছিলেন, যে তোমাদের শোনে সে আমাকেই শোনে।' মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের শিক্ষা 'তৈলাভিষেকের' বিরোধী শিক্ষা বলে গ্রহণযোগ্য নয়, পদটির মর্ম এটি নয় বটে। বরং এটিই যোহনের কথার উদ্দেশ্য, আমরা যেন তৈলাভিষেকের প্রাধান্য সম্পর্কে সচেতন হই, অর্থাৎ সেই সত্যময় আত্মার প্রাধান্য সচেতন হই যাঁকে স্বয়ং যীশু আমাদের দান করেছেন আমরা যেন 'আদি থেকে' শ্রুত এবং প্রেরিতদূতগণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা এখনও-ঘোষিত ঐশবাণীকে অন্তরে গেঁথে রেখে

আপন ক'রে পূর্ণ সত্যকে লাভ করতে পারি: 'আদি থেকে' পাওয়া বাণীতে বিশ্বস্ত হয়ে থাকব, এটিই আমাদের প্রতি যোহনের সারকথা, কারণ সেই বাণীই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের উৎস এবং সেই বাণী অনুসারেই সত্যময় আত্মা আমাদের উজ্জীবিত, আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করেন। বলা বাহুল্য, 'আদি থেকে' শ্রুত বাণী হল প্রেরিতদূতগণ ও তাঁদের আত্মিক উত্তরসূরী সেই বিশপগণ দ্বারা ঘোষিত বাণী।

২:২৮—তাই এখন, বৎস, তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক: এটি এবং পরবর্তী পদটি পত্রটির প্রথম অংশের সমাপ্তিস্বরূপ এবং একাধারে পত্রটির দ্বিতীয় অংশের প্রধান বিষয়কে পূর্বপ্রচার করে: আমরা ঈশ্বরের সন্তান (৩:১–৪:৬)। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার জন্য আমাদের সনির্বন্ধ মিনতি করার পর যোহন যীশুর ভাবী আগমনের কথা উত্থাপন করেন; জগতের যে বিচার যীশুর প্রথম আগমনে শুরু হয়েছিল (যোহন ৩:১৮-২১) তাঁর ভাবী আগমনে সেই বিচার চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করবে। যীশুর সঙ্গে যে সংযুক্ত থাকে এবং ফলত এখন থেকে ঐশজীবনপ্রাপ্ত হয় সে ইতিমধ্যে ঐশপরিত্রাণ পেয়ে গেছে; যীশুকে যে অস্বীকার করে সে নিজেকে দণ্ডিত করে (যোহন ৫:২৪-২৯)। কখন যীশু আসবেন, এবিষয়ে যোহন চিন্তান্বিত নন; তিনি মূলসূত্রটাই কেবল বারবার স্মরণ করান: প্রকৃত বিশ্বাসে যে বিশ্বস্ত থাকে সে জানে সে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হয়েছে; সুতরাং খ্রীষ্টান সর্বদাই ঈশ্বরের সচেতনতায় থাকুক, অর্থাৎ সচেতন হোক সে ঈশ্বর দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই সঞ্জীবিত। এ সচেতনতা থেকে সে সেই শক্তি পাবে যা দ্বারা এখন প্রেমাজ্ঞা পালনে জীবনযাপন করতে এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরের দরবারে সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারবে।

২:২৯—তোমরা যদি জান, তিনি ধর্মময় …: ঈশ্বর যেমন, যীশুও তেমনি ধর্মময় (১:৯; ২:১), সুতরাং ধর্মময় ঈশ্বরে এবং ধর্মময় যীশুতে স্থিতমূল থাকতে হলে যীশুর নির্দেশগুলি পালন করা ও 'পাপের ক্ষমার' ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করা প্রয়োজন (৩:৪)। প্রেমাজ্ঞা পালনে প্রকাশিত আমাদের এই 'ধর্মাচরণ' অর্থাৎ নৈতিক সদাচরণ হল সেই উত্তম উপায় যা অবলম্বন ক'রে খ্রীষ্টবিশ্বাসী নিজেকে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত বলে প্রমাণ করে। বলা বাহুল্য, ঐশদত্তকপুত্রত্বলাভ এবং ঈশ্বর থেকে জন্মগ্রহণ দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আত্মা থেকে নবজন্মের কথা নির্দেশ করে (যোহন ১:১৩; ৩:৩-৪; ১ যোহন ৪:৭; ৫:১,৪,১৮)। ঈশ্বরের বিচার-দরবারে সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে সক্ষম এমন প্রকৃত খ্রীষ্টান সে-ই, যে আত্মা থেকে সঞ্জাত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানোচিত জীবন যাপন করে অর্থাৎ যীশুর মত যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে ঐশদত্তকপুত্রত্বের বিষয়ে সচেতনতায় জীবনযাপন করে।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান

(৩:১–৪:৬)

এখানে পত্রটির দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়। এর মূল প্রসঙ্গ হল 'আমরা ঈশ্বরের সন্তান' বা 'ঐশদত্তকপুত্রত্ব'। খ্রীষ্টানদের কাছে নিত্য স্মরণীয় কথা উপস্থাপন করতে করতে এবং ভ্রান্তমতাবলম্বীদের যুক্তি খণ্ডন করতে করতে যোহন প্রথমে এবিষয় উত্থাপন করেছিলেন (২:২৮)। এখন তিনি এ বিষয়টির ঐশতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলি—বিশেষত ভ্রাতৃপ্রেমের দিক আলোচনা করতে প্রবৃত্ত। তাছাড়া একথাও যথেষ্ট প্রমাণ পাবে, ভ্রাতৃপ্রেম-অবহেলা এবং ভ্রান্তমত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (২:৩-৩৩), অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেম পালন এবং প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাস-স্বীকার হল খ্রীষ্টীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য দিক।

এ দ্বিতীয় অংশের কাঠামো পত্রটির প্রথম অংশের সমরূপ। লক্ষ করার বিষয় এটি, প্রথম অংশে 'আলোর সন্তান' এবং এখন 'ঈশ্বরের সন্তান'-এর উপর যোহনের শিক্ষা নির্ভর করে।

ঈশ্বরের সন্তানসুলভ আচরণ (৩:১-৩)

পত্রটির প্রথম অংশের উক্তি নির্দেশ ক'রে ('যে কেউ ধর্মাচরণ করে সে তাঁরই থেকে সঞ্জাত'), যোহন সর্বপ্রথমে 'ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত' বাক্যটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ব্যবহার কবর এবং তাঁর প্রেমদান গ্রহণ করব, এ শর্তেই বলতে পারি আমরা ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং ঐশদত্তকপুত্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এতেই প্রকাশিত হয় আমরা ইতিমধ্যেই চরম ঐশপরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েছি। যোহনের পরবর্তী উপদেশ ও পরামর্শগুলি ঠিক এ গভীর বাস্তবতায় স্থাপিত।

৩ ১ দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,
যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত,
আর আমরা তো তাই!
এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না,
কারণ তাঁকেই সে জানেনি।
২ প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান ;
আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।
আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব,
কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।
৩ তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে,
সে নিজেকে পুণ্যবান করে তোলে, তিনি নিজেই যেমন পুণ্যবান।

৩:১—দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা …: ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা অপূর্ব অগাধ অনুগ্রহদান পেয়েছি—তাঁর ভালবাসা এবং তা উপলব্ধি করার জন্য যোহন আমাদের আহ্বান করেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষ যে শত্রুতা ও প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছিল, ঈশ্বরের সেই সব নিঃশেষ করে ফেলেছেন, এমনকি তাঁর আপন সন্তানে আমাদের রূপান্তরিত করেছেন, যার জন্য এখন আমরা তাঁর অবিরত সান্নিধ্যের নিশ্চয়তায় আছি (যোহন ১:১২)। ঈশ্বরের উল্লিখিত অনুগ্রহদান হল দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই অনুগ্রহদান, যা দ্বারা আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, তা সম্মানসূচক উপাধি বা সম্বোধন শুধু নয় বরং একটি বাস্তবতা। যদি তা শুধু একটি উপাধি বা

সম্বোধন হত, তাহলে ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহদান অত মহান হত না, বস্তুত 'অনেকে নামে চিকিৎসক অথচ রোগীদের প্রকৃত চিকিৎসা করতে অক্ষম, অনেকে প্রহরী অথচ শুধু ঘুমায়' (সাধু আগস্তিন)। এ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত করে: দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান তাঁর সন্তানে আমাদের রূপান্তরিত করে তা ঈশ্বরের স্বরূপ অনুযায়ী দান, অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন স্রষ্টা তাঁর অনুগ্রহদান তেমনি সৃজনশীল, ক্রিয়াশীল ও গতিশীল। সুতরাং আমাদের নবস্বরূপ আমাদের আচরণেই প্রকাশ পাবার কথা। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি, আত্মতৃপ্তির জন্য শুধু হাতে বসে থেকে তা ধ্যান করতে নেই অর্থাৎ তা ধ্যান ক'রে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষ মনে করব না। বরং ঈশ্বরের সমরূপ হয়ে উঠব এ অর্থে, তাঁর মত আমরাও ভ্রাতাদের মঙ্গলার্থে দায়িত্বশীল ও ক্রিয়াশীলভাবে নিজেদের দান করার জন্য আগ্রহ ও প্রেরণা অনুভব করব: যীশুর শেখানো ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় যে পবিত্র জীবন যাপন করে সে-ই ঈশ্বরের সন্তান এবং বাস্তবেই তা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এ: আমাদের শিথিলতার কারণ অনেকবার এ হতে পারে, আমরা যা হয়ে উঠেছি সেই সম্বন্ধে সচেতন নই। কতবার না আমরা একথা শুনি, 'আমি পাপী'। অথচ এ বিষয়েও অধিক সতর্ক থাকতে হয়, কারণ 'আমি পাপী' উক্তি আমাদের দুর্ব্যবহার অবাধে চালিয়ে যাবার জন্য একটি ছুতাই হতে পারে, আমরা যেন পাপী বলে পাপ করা ছাড়া পুণ্য কিছু করতে স্বভাবতই অক্ষম হতাম। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিপূর্ণ। নিজেদের পাপী মনে করা ও স্বীকার করা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হওয়া চাই; আমরা যেন তাঁর সন্তান হয়ে উঠি। এজন্যই তাঁর মৃত্যু গুণে যীশু পাপের কবল থেকে আমাদের মুক্ত করলেন! এ পরিপ্রেক্ষিতে যোহনের পরামর্শ খুব উপযোগী; তা দ্বারা আমরা অধিক করে বুঝতে পারি দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে কী হয়ে উঠেছি। দুঃখের কথা, আজকার মত 'আমরা ঈশ্বরের সন্তান' বাক্যটির প্রাথমিক তাৎপর্য যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্টজীব বলে বা স্বর্গরাজ্যের ভাবী বাসিন্দা বলে প্রভৃতি ধরনের কারণ নিয়েই শুধু অনেকে নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান মনে করে। কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে নিজেদের ও ভাইদের অন্তরে ত্রিত্বের নিত্য উপস্থিতি অনুভব করা প্রয়োজন; সচেতন হয়ে উঠতে হয়, যে কোন কাজ করি না কেন বা যে কোন পরিস্থিতিতে আছি না কেন যীশুই আমার অন্তরে উপস্থিত হয়ে কাজ করেন; একই প্রকারে ভাইকে দেখে আমার ও তার অন্তরে অবস্থানকারী একই যীশু ও পবিত্র আত্মাকেই দেখতে হয়; যে যীশু ও যে পবিত্র আত্মা এখন আমাকে ঐশজীবনে সঞ্জীবিত করছেন, সেই একই যীশু ও পবিত্র আত্মা আমার ভাইকেও এখন ঐশজীবনে সঞ্জীবিত করছেন; বারে বারে সচেতন হতে হয় আমি পিতার ভালবাসার পাত্র এবং একাধারে ভাইকে দেখে স্মরণ করব তার প্রেমের জন্যও পিতা যীশুকে দান করেছেন। উল্লিখিত এ কথাগুলো হল শুধু কয়েকটি ইঙ্গিত আমরা যেন 'ঐশদত্তকপুত্রত্ব' গভীরতম ঐশসত্য ধ্যান করতে পারি। ধ্যানের ফলস্বরূপ যে আত্মসচেতনতার উৎপত্তি হয় তা আমাদের খ্রীষ্টীয় আচরণের উৎস হওয়া চাই, অর্থাৎ সেই আত্মসচেতনতা আমাদের সদাচরণে—বিশেষত ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় প্রকাশ ও প্রমাণ পাবার কথা। ঐশদত্তকপুত্রত্ব বিষয়েই চতুর্থ শতাব্দীর মহাচার্য সাধু আথানাসিউস লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর মানুষ হলেন মানুষ যেন ঈশ্বর হয়।' একথা ঠিক এবং আনন্দের কথা, কিন্তু একথা থেকে আমরা যেন ঈশ্বরের মত ব্যবহার করার জন্য তাঁকে অধিকতর গভীরভাবে জানতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে অনুপ্রাণিত হই: মানুষের জন্য তিনি আলো, ভালবাসা ও আত্মদান, তা জেনে আমাদের তা-ই হতে হয়।

৩:১ঘ—এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না: যেহেতু আমরা ঈশ্বরের সন্তান এজন্য জগৎ আমাদের জানে না। সুতরাং আমাদের প্রতি জগতের অত্যাচার ও নির্যাতন আমাদের ঐশদত্তকপুত্রত্বের বাস্তবতা প্রমাণ করে। যারা জগৎ থেকে উদ্গত অর্থাৎ যারা ঈশ্বর থেকে দূরে আছে তাদেরই মাত্র জগৎ জানে। জগৎ যদি ঈশ্বরের কাছে

থাকত তাহলেই সে ঈশ্বরের সন্তানদের জানতে ও গ্রহণ করতে পারত (৩:১৩; যোহন ১৫:১৯; ১৭:২৫)। কিন্তু জগৎ ঈশ্বরকে জানল না অর্থাৎ যীশুকে গ্রহণ না ক'রে ঈশ্বরকে জানল না (৩:২)। অবশেষে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জগতের অত্যাচার যীশুর বিরুদ্ধে তার অত্যাচারের মত (যোহন ৫:৩৭; ৭:২৮; ৮:১৪; ১৬:৩) : জগৎ যীশুকে জানল না ও ভালবাসল না বিধায় এখন তাঁর অনুসারীদেরও জানতে ও ভালবাসতে অক্ষম। সুতরাং 'আমি ঈশ্বরের সন্তান' একথা বলার জন্য খ্রীষ্টান হিসাবে আজ যে অভিজ্ঞতা পেতে হচ্ছে সেটা হল আমাদের প্রতি জগতের অন্ধতা : জগৎ আমাদের জীবনের সত্য দেখতে পায় না। দুঃখের বিষয় স্বীকার করতে হয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেও এখনও জগতের অনেক কিছু রয়েছে। যারা পাপ করলেও পবিত্র জীবন যাপন করতে সচেষ্ট এদের কথা বলি না, যারা নামে নিজেদের খ্রীষ্টান স্বীকার করে অথচ বিশৃংখল জীবন যাপন করতে চায় এবং যারা তাদেরই ভর্ৎসনা বা বিদ্রূপ করে যারা সদাচরণ করতে চেষ্টা করে, এদেরই নির্দেশ করছি। 'খ্রীষ্টান' নাম বহন করলেও তারা জগতের।

এ পদটি ব্যাখ্যার সমাপ্তিস্বরূপ ঐশদত্তকপুত্রত্ব সম্বন্ধে যোহনের মূল ধারণাগুলির একটা তালিকা উপস্থাপন করি :

১। সর্বপ্রথমে যোহন স্বীকার করেন, মানুষ হিসাবে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে অক্ষম। ঈশ্বর স্বয়ং সেই অধিকার আমাদের দান করেছেন : যারা তাঁকে (যীশুকে) গ্রহণ করল, তাঁর নামে যারা বিশ্বাসী, তাদের সকলকেই তিনি দিলেন ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১:১২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।
আবার, ঈশ্বর একটি নাম আমাদের দান করেছেন ; তাঁর এ অনুগ্রহদানেই আমরা তাঁর সন্তান হয়ে উঠি : 'পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন, যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই! (৩:১)।'

২। যারা সেই 'অধিকার' ও 'অনুগ্রহদান' গ্রহণ করে তারা ঈশ্বর থেকে 'জন্ম' লাভ করে : 'রক্তগত জন্মে নয়, ... ঈশ্বর থেকেই তারা সঞ্জাত', 'ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্মলাভ না করলে কেউ ঐশরাজ্য প্রত্যক্ষ করতে পারে না' (যোহন ১:১৩; ৩:৩; ১ যোহন ২:২৯; ৩:৯ ... ; ৪:৭; ৫:১,১৮)।

৩। যিনি আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলেন তিনি হলেন পবিত্র আত্মা। ঐশদত্তকপুত্রত্বের সূত্রপাত দীক্ষাস্নান গ্রহণে সাধিত হয়, কিন্তু সমগ্র জীবনব্যাপী 'সত্যের সাধনায়' (১:৬; যোহন ৩:২১) এবং ভ্রাতৃপ্রেম আজ্ঞা পালনে তা প্রতিফলিত হওয়ার কথা (২:১০, ইত্যাদি ; যোহন ১৩:৩৪, ইত্যাদি)।

৩:২—প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান : এ পদের কথাও খুব গভীর এবং রহস্যাবৃত কথা। রহস্যের সামনে মৌনতা রাখা শ্রেয় ; খুব সংক্ষিপ্তভাবেই যোহন সেই রহস্যের একটি আভাসমাত্র আমাদের দিতে চেষ্টা করেন। সাধু আগস্তিন এখানেও আমাদের সহায়তা করেন : 'শিক্ষাদায়ী সেই তৈলাভিষেকের প্রেরণায়ই এ পদের কথা ধ্যান করা উচিত, সুতরাং এ বাণীগুলো ধ্যান করার পূর্বে আমাদের অন্তরে যা জগতের তা থেকে নিজেদের শুচীকৃত করা একান্ত প্রয়োজন যেন ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মায় নিজেদের পূরণ করতে পারি। বস্তুত, আমরা যদি সির্কায় ভরা, তাহলে ঈশ্বর কোথায় বা মধু সঞ্চার করতে পাবেন? আমরা সোনা ও সোনার সন্ধান করলে তবে তিনি কোথায় বা তাঁর বাণী সঞ্চার করবেন?

'প্রিয়জনেরা' সম্বোধন হল পরবর্তী ধারণার বিশেষ গুরুত্বের লক্ষণ : ঐশদত্তকপুত্রত্ব একটি বর্তমান বাস্তবতা, কিন্তু শুধু ভাবীকালেই সিদ্ধি লাভ করবে। অর্থাৎ খ্রীষ্টান বলেই এর মধ্যেই জানতে পেরেছি আমরা ঈশ্বরের

সন্তান, কিন্তু শুধু যীশুর চরম আবির্ভাবের দিনেই এই ঐশদত্তকপুত্রত্ব পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের কাছে প্রকাশিত হবে। আমরা সত্যিকারে যে কী তা বিশ্বাসের বলে জানি, অর্থাৎ বিশ্বাস করি মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমন গুণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি, কিন্তু এ পরম বাস্তবতা বিশ্বজগতের সামনে এখনও প্রকাশ পায়নি, এমনকি আমরা নিজেরাই এবিষয়ে পূর্ণসচেতন নই; এখনও আমরা যীশুর অনুরূপ হয়ে উঠিনি, আমরা তাঁকে তাত্ত্বিক ও কাল্পনিকভাবেই মাত্র জানি, এখনও আমরা তাঁকে স্বর্গীয় গৌরবান্বিত বলে প্রত্যক্ষ অনুভব করি না ও জানি না (যোহন ১৭:২৪ ...)। যখন ঈশ্বরের পুত্র আমাদের যীশু সমগ্র বিশ্বজগতের সামনে নিজেকে প্রভু ও ঈশ্বর বলে প্রকাশ করবেন (৫:২০; যোহন ১২:৪৫; ১৪:৯ ...; ২০:২৮) তখন আমাদের বাস্তব স্বরূপও সকলের সামনে প্রকাশিত হবে। বর্তমানকালের মত আমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরেই নিহিত (কলসীয় ৩ অধ্যায়), কিন্তু পরবর্তীকালে ঈশ্বরের সন্তানদের অভিব্যক্তি ঘটবে; সমগ্র জগৎসৃষ্টি এখন থেকেই এ চরম অভিব্যক্তির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হচ্ছে (রোমীয় ৮ অধ্যায়), পক্ষান্তরে যা এখন অদৃশ্য হলেও বাস্তব, জগৎ নিজের অন্ধকারে তা দেখতে পায় না এবং যে চরম দিন সে বিচারিত হবে তার জন্যও প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু আমরা জগতের নই; আমরা এ চরম অভিব্যক্তির প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করি, এ চরম অভিব্যক্তি হল একাধারে আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা: প্রতীক্ষা করি, বিশ্বাস করি ও প্রত্যাশা করি, এখন যা হয়ে উঠেছি আমরা পুত্রের অনুরূপ হওয়াতেই তা পূর্ণসিদ্ধি ও পূর্ণাভিব্যক্তি লাভ করবে: ঈশ্বর ও যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরে সকল বিশ্বাসী, এটিই হবে সেদিনের একমাত্র বাস্তবতা। ভাষান্তরে বলতে পারি, যাঁকে মাংসে আগত ঐশবাণী বলে জানি সেই যীশুখ্রীষ্টের অনাদি অনন্ত গৌরব দর্শনেই আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণকৃত হয়ে উঠব, অর্থাৎ নাকি সেই গৌরব দর্শনে আমরা গৌরবান্বিত যীশুর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ, তেজপূর্ণ ও দিব্য সংযোগে সংযুক্ত হয়ে উঠব যা কখনও শেষ হবে না (যোহন ১৭:২৪)। যেমন জীবনকালে পুত্র মানবজাতির কাছে পিতাকে দান করেছিলেন (যোহন ১৭:২৫ ...) তেমনি অন্তিমকালে আবার তাঁর দ্বারাই সকল বিশ্বাসী পিতার সহভাগী হয়ে উঠব।

এ প্রসঙ্গে সাধু পলের পত্রাবলি থেকে কয়েকটি অংশ উপস্থাপিত হোক:

রো ৮:১৭-১৯: আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই। আসলে আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

১ করি ১৩:১২: এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।

ফিলি ৩:২১: যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

কল ৩:৪: খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

২ করি ৩:১৮: অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

আমাদের রূপান্তর স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা সাধিত হয়: অন্তরের চোখে যাঁকে আমরা নিরীক্ষণ করি, এখন তিনি আমাদের জীবন পবিত্রিত করতে করতে নিজ ঐশসাদৃশ্যে আমাদের রূপান্তরিত করছেন, অর্থাৎ যে রহস্যময় ক্রিয়া তাঁরই সাদৃশ্যে আমাদের রূপান্তরিত করে তা ইতিমধ্যেই কার্যকারী হচ্ছে। বিশেষভাবে যোহনের একথাই উল্লেখযোগ্য, এ ঐশসত্য অনুসারে আমরা ঈশ্বরের দর্শন পাব শুধু এমন নয়, বরং 'তাঁর সদৃশ হব', অর্থাৎ ত্রিত্বের জীবনে অনুপ্রবেশ করে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে উঠব। ব্যাখ্যার এ পর্যায়ে আমি মনে করি, যোহনের

মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত এ ঐশবাণী পুনঃ পুনঃ পাঠ ক'রে আপন ক'রে সেই 'তৈলাভিষেক' দ্বারা নিজেদের অভিষিক্ত হতে দেওয়া শ্রেয়, যাতে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান পবিত্র আত্মাই এ খ্রীষ্টবাণীর মর্ম আমাদের প্রকাশ করেন।

৩:৩—তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে ···: আমরা যারা পুণ্যবান হতে আহূত হলাম, ইতিমধ্যেই আমরা পুণ্যবান খ্রীষ্টের দ্বারা পুণ্যবান হচ্ছি যাতে তাঁর সদৃশ হয়ে উঠি (যোহন ১৭:১৭-১৯)। বস্তুত, জগতের কাছে আমরা যত মৃত, পুণ্যবান যীশুর দ্বারা তত প্রভাবিত হয়ে উঠি; তিনিই জগতের প্রভাব আর আসক্তি থেকে আমাদের মুক্ত ক'রে আমাদের শুচিশুদ্ধ ও পুণ্যবান করে তুলবেন যেইভাবে তিনি আছেন। সুতরাং যেমন যীশু পাপমুক্ত ছিলেন (৩:৫) তেমনি আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে ইহলোক থেকেই পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং এমন শক্তি আমাদের দেওয়া হয়েছে যা দ্বারা এ মুক্তি রক্ষা করতে সমর্থ আছি।

পাপাচরণ ত্যাগ (৩:৪-১০)

পত্রটির প্রথম অংশে 'ঈশ্বর আলো' মূলসূত্র ঘোষণা করার পর যোহন এমন উপদেশ দিয়েছিলেন আমরা যেন পাপাচরণ ত্যাগ করে আলোতে চলি (১:৭–২:২)। এ দ্বিতীয় অংশেও তিনি একই প্রণালী অনুসরণ করেন: 'আমরা ঈশ্বরের সন্তান' মূলসূত্র ঘোষণার পর তিনি আনুষঙ্গিক উপদেশ প্রদান করেন তথা আমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠে থাকি তাহলে আমাদের এ নবস্বরূপ দেখাতেই হয়; পাপাচরণ ত্যাগ করাতেই তা প্রকাশ পায়।

৩ [৪] কেউ যদি পাপ করে, সে জঘন্য কাজ করে,
আর পাপটা হল এ জঘন্য কাজ।
[৫] আর তোমরা তো জান যে,
পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন,
আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই।
[৬] যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকে,
সে পাপ করে না।
যে কেউ পাপ করে,
সে তাঁকে দেখেওনি, তাঁকে জানেওনি।
[৭] বৎস, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে:
যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।
[৮] যে পাপ করে, সে দিয়াবল থেকে উদ্গত,
কারণ আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে।
দিয়াবলের কর্ম বিনাশ করার জন্যই
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন।
[৯] যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না,
কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে;
পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত।
[১০] এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান নির্ণিত হয়:
যে কেউ ধর্মাচরণ করে না, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়;
আর নিজের ভাইকে যে ভালবাসে না, সেও নয়।

৩:৪—কেউ যদি পাপ করে, সে জঘন্য কাজ করে: এ প্রথম পদ পাঠ করলে পর মনে এ প্রশ্ন জাগে: সেই পাপ কী? এবং সেই জঘন্য কাজ কী? খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি, পাপ হল ঈশ্বর-পরিত্যাগ ও তাঁর পরিত্রাণকর্ম-পরিত্যাগ; আবার, অত্যন্ত ঘৃণাজনক ও নিন্দনীয় আচরণ, নৈতিক দিক ও খ্রীষ্টবিশ্বাসের দিক দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ, এ সবগুলিকেও পাপ বলে। 'জঘন্য কাজ' বলতে সেই সকল অশুভ শক্তি বোঝায় যেগুলি অন্তিমকালে ঈশ্বরের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করবে। উল্লিখিত বিরোধিতা ও বিদ্রোহ শয়তানেরই বিরোধিতা ও বিদ্রোহ বলে বিশেষভাবে নিরূপিত; সেগুলিতে শয়তানের স্বীয় প্রভাবেই সর্বাপেক্ষা প্রকাশ পায়। তাছাড়া সেকালে কুম্রান সম্প্রদায় 'জঘন্য কাজ'-এর কথার মধ্য দিয়ে সত্যময় আত্মার বিপরীত বিষয়বস্তু চিহ্নিত করত, বা অন্য কথায়, সত্যরাজ্য এবং জঘন্য কাজ-রাজ্য পরস্পর বিরোধী রাজ্য বলে পরিগণিত ছিল। সুতরাং পাপ ও জঘন্য কাজের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলতে পারি, শয়তানের যে প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মানুষ পাপ করে সেটি জঘন্য কাজ; জঘন্য কাজই অশুভ শক্তি বলে পাপ করতে মানুষকে প্ররোচনা দেয়; জঘন্য কাজই অন্ধকারময় জগৎ মন্দতার সন্তানদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের নামান্তর। জগৎ ও মন্দতার সন্তানদের এক একটি পাপ তাদের অন্তরে কার্যকারী শয়তানের প্রভাবকেই প্রকাশ করে।

এপর্যায়ে আর একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে: কোন্ পাপ এত মারাত্মক যে 'জঘন্য কাজ' বলে বলা যেতে পারে? কোন্ পাপ শয়তানের প্রভাবের এতই বিশেষ প্রকাশ, যার জন্য সকল পাপগুলির মূলকারণ বলে পরিগণিত হতে পারে? প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যোহন ভালই জানেন, যতক্ষণ ইহজগতে আছি ততক্ষণ পাপ না করে পারব না এবং সকল পাপ ঈশ্বরদ্রোহ হলেও তবু সবই সমান নয়, এমনকি ২:১-এ তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, যে নিজেকে নিষ্পাপ বলে সে মিথ্যাবাদী এবং এজন্য উপদেশ দিয়েছিলেন পাপী বলে আমরা যেন সহায়ক যীশুর উপর নির্ভর করি। সুতরাং উত্থাপিত প্রশ্নের যথাসম্ভব সঠিক উত্তর দিতে গিয়ে সমর্থন করতে পারি, জঘন্য কাজ হল যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বা খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করা (২:২২) কিংবা চতুর্থ সুসমাচারের ভাষায় 'অবিশ্বাস' (যোহন ৮:২১,২৪,৪৬; ১৫:২১; ১৬:১১)। খ্রীষ্ট বলে যীশুকে অস্বীকার করাই যে জঘন্য কাজ এর কারণ এটি, খ্রীষ্ট বলে যীশুকে অস্বীকার ক'রে খ্রীষ্টান খ্রীষ্টবৈরীতে পরিণত হয়, অর্থাৎ খ্রীষ্টান সেই শয়তানের মিত্র হয়ে দাঁড়ায় যে শয়তান সকল খ্রীষ্টবৈরীর অধিপতি। খ্রীষ্ট বলে যীশুকে অস্বীকার করা এমন মারাত্মক পাপ বলে পরিগণিত হয়েছিল যে, সেই পাপ দেখা দেওয়ামাত্র যোহন অনুমান করেছিলেন অন্তিমকাল এসে গেছে এবং শয়তানের সঙ্গে সকল খ্রীষ্টবৈরী চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য যীশুর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে (২:১৮ …, ২২)। উপরন্তু, 'যীশুকে অস্বীকার' পাপের সঙ্গেই কতিপয় পাপ জড়িত, অর্থাৎ যীশুর আত্মবলিদানের পরিত্রাণদায়ী ক্ষমতা অবিশ্বাস করার ফলে মানুষ অন্য সব ধরনের পাপও করে, যথা: যখন পাপ করি তখন যীশুর সাধিত পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করি, শয়তানের আধিপত্য স্বীকার করি এবং এমন অন্ধকারের মধ্যে পতিত হই যে খ্রীষ্টকে ও তাঁর অনন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজ অস্বীকার ক'রে ঘোষণা করি, আমাদের পাপ নেই (১:৮)। উপসংহারে, খ্রীষ্ট বলে অর্থাৎ ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বরের পুত্র বলে যীশুকে যে অস্বীকার করে সে জঘন্য কাজ করে অর্থাৎ শয়তানের প্রভাবে জীবনযাপন করে (৫:১৮) এবং তার সন্তান হয়।

৩:৫—পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন: এ বাক্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এজগতে যীশুর আবির্ভাবের অর্থ প্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য আর একটি কথা হল, এ বাক্য সেই উক্তি প্রতিধ্বনিত করে যা দীক্ষাগুরুর মধ্য দিয়ে যোহন সুসমাচারের নাট্যমঞ্চে যীশুর আবির্ভাবের জন্য ব্যবহার করেন: ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন' (যোহন ১:২৯): তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানবজাতির পাপ যেন বিনষ্ট হয় এ উদ্দেশ্যেই যীশু আবির্ভূত হয়েছিলেন অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে এসেছিলেন;

যীশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুই মানবজাতির ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। যীশুর আবির্ভাবের পূর্বে যতই ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হতেন না কেন তবু আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের ও মানবজাতির অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে অক্ষম হয়েছিলেন। যীশুই উদ্ধারকর্তা; তিনি নিজ ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পাপ মোচন করেন, শয়তানকে পরাস্ত করেন এবং পাপ পরিহার করতে আমাদের সক্ষম করে তোলেন (৩:৮খ)। অর্থাৎ, ক্রুশবিদ্ধ পাপহর যীশু দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে (৩:৫ক), নিষ্পাপ যীশুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে (৩:৫খ) এবং যীশুতে স্থিতমূল থেকে খ্রীষ্টান আর পাপ করে না (৩:৬)। যীশুর যন্ত্রণাভোগ বৃত্তান্তে মথিও একই ধারণা অনুসরণ করেন; তাঁর সুসমাচার অনুসারে যীশুর বিচারে ইহুদীরা সমস্বরে বলেছিল 'এর রক্ত আমাদের উপর ও আমাদের সন্তানদের উপরে পড়ুক।' এ উক্তিটি উচ্চারণ ক'রে ইস্রায়েলীয়রা প্রতিবছর 'মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবসে' (লেবীয় ১৬; গণনা ২৯:৭ ...) ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাত যেন প্রায়শ্চিত্তের মেষশাবকের রক্ত তাদের উপর বর্ষিত হলে তারা শুচীকৃত হয়। সুতরাং এ বাক্যের মাধ্যমে মথি বলতে চান, মসীহ যীশুকে ক্রুশে দিলেও ইহুদীরা অজান্তে নিজেদের জন্য এবং তাদের বংশধরদের জন্য পাপমোচন প্রার্থনা করল: ঈশ্বরের পুত্র ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টই সেই বিশ্বপাপহর মেষশাবক: তিনিই নিজ রক্তক্ষরণে মানবজাতির পাপ চিরকালের মতই বিধৌত করেন, অর্থাৎ নিজ মৃত্যুবরণে পাপের আধিপত্য বিনাশ করেন। এবং যেহেতু যোহনের ধারণায় তাঁর মৃত্যু 'জীবনদান' বলে পরিগণিত হয় এজন্য শয়তানকে পরাস্ত করা ও পাপ বিনাশ করা ছাড়া নিজ মৃত্যুবরণে যীশু আপন জীবন—নিষ্পাপ ঐশজীবন—আমাদের দান করেন।

৩:৬—যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকে ...: নিষ্পাপ যীশুর জীবন গ্রহণ করা ও তাঁর মধ্যে বিশ্বস্তভাবে 'স্থিতমূল থাকা' (২:৬ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) হল আমাদের পাপমুক্ত জীবনযাপনের ভিত্তি ও পূর্বশর্ত। পক্ষান্তরে খ্রীষ্ট বলে যীশুকে অস্বীকার করা (২:২২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) হল সকল পাপের মূলকারণ ও অসত্য পালনকারীদের আসল পাপ বা 'জঘন্য কাজ' (৩:৪ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ফলত তেমন পাপ যে করে সে মিথ্যাচারী ও খ্রীষ্টবৈরী (২:২২), 'আলো ঈশ্বরের' জীবনের সহভাগী নয় (১:৫) এবং অন্ধকারে চলে (২:৯), অর্থাৎ সে সেই শয়তান থেকে উদ্গত মানুষ (৩:৮) যে শয়তান মিথ্যাচারী ও মিথ্যার জনক (যোহন ৮:৪৪) এবং সে কখনও ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হবে না (২:৪; ৩:৬)। উপরন্তু খ্রীষ্টকে অস্বীকার থেকে আর ফলত তাঁর মধ্যে স্থিতমূল না থাকা থেকে অন্যান্য সকল পাপের উৎপত্তি হয়; এগুলির মধ্যে প্রধান হল ভ্রাতৃপ্রেমের বিরুদ্ধে পাপ—এ পাপও ঈশ্বরজ্ঞান থেকে অর্থাৎ ঐশসহভাগিতা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে (২:৪)।

উপসংহারস্বরূপ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য: খ্রীষ্ট বলে যীশুকে যে স্বীকার করে এবং তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থেকে যে ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করে সে পাপ থেকে দূরে আছে। কিন্তু ভ্রান্তমতাবলম্বীদের মত খ্রীষ্ট বলে যীশুকে যে অস্বীকার করে (২:২২) আর ফলত যীশুর মধ্যে স্থিতমূল না থেকে নিজ ভাইকে ভালবাসে না, সে ঈশ্বর থেকে দূরে আছে, এমনকি সে-ই খ্রীষ্টবৈরী। পত্রটির প্রথম পদগুলি নির্দেশ ক'রে আরও স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে: যীশুর সাক্ষীগণ এবং খ্রীষ্টের বাণীপ্রচারকগণের সঙ্গে সহভাগিতা থেকে যে কেউ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সে পাপের অধীনেই জীবনযাপন করে।

৩:৭—কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে: এই সকল পদ থেকে অনুমান করা যায়, যোহন তাঁর স্থানীয় মণ্ডলীতে উপস্থিত নকল শিক্ষাগুরুদের নির্দেশ করছেন। যেহেতু খ্রীষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রাখে না, খ্রীষ্ট বলে যীশুকে অস্বীকার করে এবং ভ্রাতৃপ্রেম অবহেলা করে এজন্য তারা ঈশ্বরকে জানে বলে দাবি করলেও তবু মিথ্যাবাদী ও খ্রীষ্টবৈরী; তাদের কথা শুনতে নেই।

প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্মাচরণ করে, তার নৈতিক আচরণ এমন যা ভ্রাতৃপ্রেম পালনে প্রকৃত ফলে ফলশালী হয় (২:২৯)। এখানেও স্মরণ করানো হয়, খ্রীষ্টানের প্রকৃত আচরণ যীশুর স্বরূপের অনুরূপ আচরণ হওয়ার কথা: যীশু যেমন ধর্মময়, তেমনি আমাদেরও ধর্মময় হওয়া উচিত (২:৬,২৯)।

৩:৮—যে পাপ করে, সে দিয়াবল থেকে উদ্গত: সত্যময় ঈশ্বরের বৈপরীত্যে দিয়াবল দাঁড়ায়। মিথ্যার জনক বলে সে হল অসত্যের অধিপতি ও প্রকৃত খ্রীষ্টবৈরী। মানবজাতির ইতিহাসের আদি থেকেই সে ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যাবার জন্য অতিব্যস্ত; মিথ্যা বলতে সে-ই আদম ও হবাকে শিখিয়েছিল; ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে ও নরহত্যা করতে সে-ই কাইনকে শিখিয়েছিল; আর বর্তমানকালে সেই দিয়াবলই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যীশুর স্থান দখল ক'রে ঈশ্বরের সঙ্গে ও সকল মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থেকে সরে যেতে তাকে প্ররোচিত করে। কিন্তু জীবনকালে যীশু তার আসল পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন, তার অনুসারীদেরও পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন (যোহন ৮ অধ্যায়) এবং আপন ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছেন। সেদিন থেকে আমরা দিয়াবলের প্রভাবমুক্ত জীবন যাপন করতে পারি: এজীবন যীশুর সাক্ষীগণের সঙ্গে সহভাগী জনমণ্ডলীতে যাপিত জীবনে বাস্তব সিদ্ধি লাভ করে (১:৩)।

৩:৯—যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না: দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা ঐশদত্তকপুত্রত্ব লাভ করেছি, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার নবজীবন লাভ করেছি (যোহন ৩:৬-৮)। এই নবজীবন হল ঈশ্বরের নিজের ঐশজীবন, যে জীবন যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ দ্বারা পাপ পরাস্ত ক'রে আমাদের দান করেছেন। এখন যোহন স্পষ্টই ঘোষণা করেন, সেই জীবন আমাদের দেওয়া হয়েছে আমরা যেন আর পাপ না করি, অর্থাৎ আমরা যেন ঈশ্বর ও যীশুর সঙ্গে ক্রিয়াশীল ও ফলশালী সম্পর্ক নিত্যই রাখতে পারি, যেন ঈশ্বরে ও যীশুতে স্থিতমূল থাকি ও খ্রীষ্টবিশ্বাসে অটলভাবে বিশ্বস্ত হয়ে যীশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু দ্বারা সাধিত ঐশজীবনে সঞ্জীবিত হই। যোহনের দৃঢ় ধারণা, যীশুতে আমাদের স্থিতমূল থাকা এবং তাঁর দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া আজ্ঞাগুলি পালনে ও ভ্রাতৃপ্রেমের ফলগুলিতেই বিশেষত আমাদের অত্যন্ত ফলশালী করে তুলবে আর আমাদের ফলগুলি দেখেই পিতা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু আঙুরলতার শাখাস্বরূপ যে খ্রীষ্টানে ফল ধরে না, এমনকি যে খ্রীষ্টান পাপ করে পিতা তাকে 'আঙুরলতা যীশু' থেকে কেটে ফেলেন আর বাইরে নিক্ষেপ করেন (যোহন ১৫:১-৬)। 'প্রকৃত আঙুরলতা যীশুকে' নির্দেশ ক'রে আমরা অধিক স্পষ্টভাবে যোহনের সেই শর্ত দু'টো বুঝতে পারি, যে শর্ত দু'টো মেনে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাই। প্রথম শর্ত একাধিকবার উপস্থাপিত হয়েছে: যীশুতে 'স্থিতমূল থাকতে' হয়, অর্থাৎ দীক্ষাস্নানের সময়ে গৃহীত খ্রীষ্টবিশ্বাসে অটলভাবে বিশ্বস্ত থাকতে হয়, ঠিক যেইভাবে আঙুরলতায় বিধৃত না থাকলে শাখা ফলহীন হয়ে মরে। আনুষঙ্গিক দ্বিতীয় শর্ত এটি, যেমন শাখাগুলি আঙুরলতার রস দ্বারাই সঞ্জীবিত হয় তেমনি আমাদেরও যীশুর জীবন দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন। এ পদটি ঠিক এধারণা ব্যক্ত করে যখন বলে, 'কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে।' এ গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের উপর আলোকপাত করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সর্বপ্রথমে একটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন: 'বীজ' বলতে কী বোঝায়? এ প্রশ্নের উত্তরের উপরই বাক্যটির অর্থ নির্ভর করে। যেহেতু পত্রটি গ্রীক ভাষায় লিখিত, এজন্য অনেক ভাষ্যকার গ্রীক দর্শনের ধারণা অনুসারেই যোহনের কথা ব্যাখ্যা করে। এই পদটির বেলায় তাঁরা গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থীদের সেই ধারণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যা অনুসারে ঈশ্বর জগতের মধ্যে নিজ ঈশ্বরত্বের কতকগুলি বীজ বপন করেছিলেন; ঐশবীজগুলির প্রভাবেই জগৎ নিত্য নবীকৃত ও সংশোধিত হয়ে থাকে। অন্য জ্ঞানমার্গপন্থী বলত, ঐশপ্রজ্ঞা বিশেষ বিশেষ মানুষের অন্তরে নিজ বীজগুলি বুনল, যার জন্য সেই ঐশবীজই হল প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানুষের মানবাত্মা। এ গ্রীক ঐতিহ্যকে ভিত্তি ক'রে সেই সকল

ভাষ্যকার 'বীজ' শব্দটি 'বীর্য' অর্থেই ব্যবহার করেন, ফলে এভাবেই বাক্যটি ব্যাখ্যা করে: খ্রীষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের মাধ্যমে নবজন্ম গ্রহণ করেছে; সুতরাং তার অন্তরে ঈশ্বরের বীজ-বীর্য অর্থাৎ ঈশ্বরের জীবনশক্তি রোপিত হয়ে থাকে, সেই ঐশশক্তি তাকে ঐশজীবনে সঞ্জীবিত করে এবং ঐশফলগুলি ফলায় যথা, শান্তি, প্রেম, একাত্মতা, ঐশজীবন। অধিকন্তু এই ঐশজীবনশক্তি এমন যা শয়তান ও পাপের বিরোধী শক্তি। এই ঐশজীবনশক্তিকে একটি নাম দিতে গিয়ে তবে আপনিই জীবনদায়ী পবিত্র আত্মার কথা মনে আসে এবং এভাবে সেই সকল ভাষ্যকারের উপস্থাপিত যুক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ এ ব্যাখ্যা সমর্থন করলে একটি অসুবিধা থেকে যায়: যোহনের ঐশতত্ত্ব কখনও 'সহায়ক' পবিত্র আত্মাকে একাই কার্যকারী ঐশশক্তি বলে উপস্থাপন করে না, বরং খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অন্তরে অবস্থানকারী যীশুর বাণীর সঙ্গেই তাঁকে সর্বদা উপস্থাপন করে। এজন্য উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা যত গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, তবু অন্য একটি ব্যাখ্যা সমর্থন করা যায়। এ নতুন ব্যাখ্যা আসলে খুব প্রাচীন; বস্তুত এটি হল খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রথম প্রথম যুগের মহাচার্যগণের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা; তাছাড়া 'সদৃশ সুসমাচাত্রয়ের' সঙ্গে একটা মিল অত্যন্ত প্রতীয়মান হয়ে ওঠে এবং অবশেষে যোহনের ইতিপূর্বে কথিত 'তৈলাভিষেক' ধারণার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ ব্যাখ্যা অনুসারে সেই 'বীজ' সাধারণ অর্থেই গ্রহণযোগ্য—যে বীজ মাটিতে বোনা হয় এবং সদৃশ সুসমাচারত্রয় অনুসারে যে বীজ 'আমাদের অন্তরে ঐশবাণী' বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যোহন চতুর্থ সুসমাচারে বলেন, যীশু দ্বারা প্রকাশিত বাণী গুণেই শিষ্যেরা এজগতে থেকেই পরিশুদ্ধ হয়েছে (যোহন ১৫:৩) এবং এ পত্রটিতে বলেন, 'ঈশ্বরের বাণী তোমাদের অন্তরে বসবাস করে এবং সেই ধূর্তজনকে তোমরা জয় করেছ (২:১৪)।' অবশেষে, ৩:২৪-এর কথার আলোতে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা অধিক সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ ক'রে বলতে পারি, উল্লিখিত 'বীজ' হল আমাদের অন্তরে অবস্থানকারী এমন ঈশ্বরের বাণী যা আমাদের অন্তরে বিদ্যমান পবিত্র আত্মা দ্বারাই সঞ্জীবিত। এভাবে 'তৈলাভিষেকের' কথাও উপস্থিত (২:২০,২৭): 'তৈলাভিষেকের' মত 'বীজ'ও ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মার কাজ একটিমাত্র বাস্তবতা বলে চিহ্নিত করে (২:২০,২৭-এর ব্যাখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)। এ ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে পত্রটির এ পদটি অধিক অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, এমনকি এখানে আলোচিত 'পাপ ও পাপ না করার ক্ষমতা' প্রসঙ্গেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে:

১। মানুষ বলে আমরা দুর্বল, পাপ-প্রবণ। তবুও আমাদের স্মরণে রাখা উচিত আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত ঐশবাণীর উপস্থিতি। বা অন্য কথায় আমাদের অন্তরে ঐশবাণীকে প্রেরণাদায়ী পবিত্র আত্মার উপস্থিতি হল ঈশ্বরের এমন ক্রিয়া যে, তার মধ্যে স্থিতমূল থাকা বা তার বাইরে থাকা অর্থাৎ খ্রীষ্টবিশ্বাসে বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভর করে: ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মাকে আমাদের দেওয়া হয়েছে; খ্রীষ্টবিশ্বাস পালনে অধ্যবসায়ী হয়ে সেই ঐশবাণী ও সেই আত্মাকে গ্রহণ করা বা খ্রীষ্টবিশ্বাসে অবিশ্বস্ত হয়ে সেই বাণী ও সেই আত্মাকে অগ্রাহ্য করা আমাদেরই সিদ্ধান্ত।

২। পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত ঐশবাণী বলে সেই বীজ এমন ঐশশক্তি যা আমাদের অন্তরে বৃদ্ধি লাভ করে, প্রেম ও পবিত্রতার ফলগুলি ফলায় এবং পাপ থেকে আমাদের দূরে রাখে। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ঐশবাণী দ্বারা নিজেদের উদ্বুদ্ধ হতে দেওয়া আমাদের উপরই নির্ভর করে; সেই শিক্ষা গ্রহণ করা বা অগ্রাহ্য করা আমাদের সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের একজন ভাষ্যকার লিখেছেন, 'ঐশবাণী বলে সেই বীজ আমাদের এমন ক্ষমতা ও শক্তি দান করে যা দ্বারা আমরা যদি সেই বীজের সহযোগিতা করি তাহলে পাপ নাও করতে পারি এবং পাপ জয় করতে পারি।'

৩। এ কথাগুলো থেকে যোহনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে: ঈশ্বরের সহযোগিতা করতে গিয়ে আমাদের অতিব্যস্ত আর অতিমাত্রায় কর্মশীল হতে নেই। বরং ঐশক্রিয়াশক্তি দ্বারা আমাদের পরিচালিত ও

নবীকৃত হতে দিতে হয়, আমাদের অন্তরে জীবন্ত ও সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান ঐশশক্তির প্রতি বাধ্য আর অনুগত হতে হয়। যোহন যীশুখ্রীষ্টে বা তাঁর বাণীতে স্থিতমূল থাকতে আমাদের অবিরত আহ্বান করেন এ জন্যই, তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকলে তবে আর পাপ করব না, কারণ যে পবিত্র আত্মা ঐশবাণীকে জীবন্ত ও কার্যকারী করেন সেই আত্মা পবিত্রতারই আত্মা। যোহনের সঙ্গে পলও একই ধারণা সমর্থন করেন: 'তাঁর মধ্যে যে স্থিতমূল থাকে, সে পাপ করে না।'

৪। সুতরাং পাপ না করার যে ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়েছে—যা ভাষান্তরে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে আমাদের জীবন্ত ক্রিয়াশীল সহভাগিতা বলতে পারি—দু'টো শর্তের উপরই বিশেষত নির্ভর করে। প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত হল ঐশবাণীর ক্রিয়া: ঐশবাণী সর্বদাই আমাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে এবং পবিত্র আত্মা তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তার বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেন (২:২৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় শর্ত এটি, ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সাধিত ঈশ্বরের কাজে আমাদের সহযোগিতা করতে হয় এবং বাধ্য ও অনুগত থাকতে হয়; যোহনের ভাষায়, আমাদের খ্রীষ্টে স্থিতমূল থাকতে হয়, অর্থাৎ খ্রীষ্টবিশ্বাসে বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ঐশবাণীর ভূমিকা ব্যাখ্যা ক'রে নিস্যার গ্রেগরি বলেন, আমরা পবিত্র বাইবেল প্রার্থনাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আপন করলে তবে বাইবেলের ভূমিকা চূড়ান্তই ভূমিকা: ঐশবাণী লাঙলের মত আমাদের অন্তরাত্মার গভীরে প্রবেশ ক'রে পাপের যত গুপ্ত শিকড় উচ্ছিন্ন করে ফেলে। সাধু আগস্তিনও এমনটি বলেন না, 'পাপ ক'রো না, ফলত ঐশজীবনে থাকবে', বরং যোহনের ধারণার প্রতিধ্বনি ক'রে একথাই বলেন, 'ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকো, ফলত আর পাপ করবে না।' আমরা ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মার প্রেরণা ও শিক্ষা অনুসরণ করতে বারবার ভুলে যাব আর তখন পাপ করব, একথা স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, খ্রীষ্টীয় জীবনের উৎস সেই আত্মিক জীবনে বাস্তবে অগ্রসর হতে হলে তবে ঐশঅনুগ্রহের বাস্তবতার উপরই সর্বাপেক্ষা নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়। এভাবেই আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত ও আমাদের কাছে শেখানো ঐশবাণী অনুসারে জীবনযাপন করব। এর বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করলে, অর্থাৎ আমাদের অন্তরে ঐশজীবন বজায় রাখবার জন্য নৈতিক প্রচেষ্টার উপরই অত্যন্ত নির্ভর করলে, তবে আধ্যাত্মিক জীবনে অধিক অগ্রসর হব না। আসলে বিশ্বাস করতে হয়, আমার প্রচেষ্টার চেয়ে পবিত্র আত্মাই আমার অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম; আর যদি পাপ জয় করতে এবং জগতের আক্রমণ রোধ করতে পারি তাহলে অনুমান করব ঐশবাণী ধ্যানে যীশুর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সংযোগে সংযুক্ত হয়ে উঠলাম যে তাঁর মৃত্যু দ্বারা পাপ বিনাশ করেছি। সাধু আথানাসিউস বলতেন, ঐশবাণী ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রীষ্টান যীশুর সঙ্গে এমন সংযোগ লাভ করে যে যীশু স্বয়ং তার মধ্য দিয়ে পাপ জয় করে। সুতরাং যোহন এবং মহাচার্যদের পরামর্শমত আমরা ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যানের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন করতে আহূত হচ্ছি, কারণ শুধু এ শর্তে আমাদের নৈতিক আচরণের উন্নতি হওয়ার কথা। উপরন্তু, যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করার পরই আমরা জীবনের সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে অটলভাবে দাঁড়াতে পারব, এমনকি পূর্বে যা অত্যন্ত কঠিন ও অসম্ভব বলে মনে করতাম তা সহজ হয়ে যাবে। অবশ্যই, সর্বদাই পরিশ্রম দেখা দেবে, কারণ গলগথার দিকেই খ্রীষ্টীয় জীবনযাত্রা। আর তাছাড়া আমাদের কাঁধে ক্রুশই রয়েছে; তবু যে খ্রীষ্টের বাণী আমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে সঞ্জীবিত সেই বাণীর আলোতে পরিশ্রম ও দুঃখযন্ত্রণা কখনও পূর্ণ অন্ধকার হবে না—সেই গৌরবায়নের আলোতে আলোকিত বলে, যে গৌরবায়নের দিকে আমরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবপ্রাপ্তিতে অগ্রসর হচ্ছি (২ করি ৩:১৮)।

৩:১০—এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান নির্ণীত হয় ...: এ প্রসঙ্গে যীশু নিজে বলেছিলেন,

তাদের ফলগুলি থেকে ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তানদের জানতে পারব। বাস্তবিক, যেমন একটা গাছ ভাল কিনা তার ফলগুলি দেখেই জানতে পারি, তেমনি ঘটে জীবনের বেলায়। ঈশ্বরের আহ্বানে যীশুর মত যে সাড়া দেয়, সে-ই ঈশ্বরের সন্তান বলে আত্মপরিচয় দেয়। আর যে যীশুর দেওয়া ভ্রাতৃপ্রেম আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে শয়তানের সন্তান বলে নিজেকে প্রকাশ করে। এভাবে আর একবার যোহনের স্বীয় দৃষ্টিকোণের অভিব্যক্তি ঘটে: আমাদের দুর্ব্যবহার শয়তানের হাতে আমাদের নিক্ষেপ করে প্রকৃতপক্ষে এমন নয়, বরং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যেতে এবং আমাদের ইচ্ছা ও শয়তানের অনুসরণ করতে আমাদের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তই আমাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায়। সুতরাং, নিত্যই যীশুর দিকে মন আকর্ষণ করা, তাঁর বাণীতে বিশ্বস্ত হওয়া এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা নিজেদের আলোকিত ও পরিচালিত হতে দেওয়া সত্যিকারে একান্ত প্রয়োজন; আমাদের এ বাধ্যতা ও আনুগত্য গুণে ঈশ্বরের মহাশক্তি প্রেমের ঐশফলগুলিতে আমাদের ফলশালী করে তুলবে। এ সম্বন্ধে যোহন ও পলের নিয়ম স্মরণ করা শ্রেয়: 'তুমি যা হয়ে উঠেছ, তা-ই হয়ে থাক ও তা-ই প্রকাশ কর।' এ রহস্যাবৃত নিয়মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, 'আমাকে ঈশ্বরের সন্তান হতে হয়, সুতরাং তা-ই হয়ে উঠতে চেষ্টা করব' এমন নয়, বরং 'আমি যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি, সুতরাং সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে চেষ্টা করব।' বলা বাহুল্য এ নিয়ম সেই আত্মসচেতনতার উপর নির্ভর করে, যে আত্মসচেতনতা ঐশবাণীতে আমাদের স্থিতমূল থাকার ফল।

আজ্ঞাপালন (৩:১১-২৪)

পূর্ব অংশের শেষ কথার সঙ্গে সংযোগ রেখে ('নিজের ভাইকে যে ভালবাসে না, সেও নয়', ৩:১০) যোহন এ নতুন অংশে 'ভালবাসা'র কথা আলোচনা করতে ব্যাপৃত হন। কিন্তু তাঁর এ নতুন আলোচনা ব্যাখ্যা করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য রাখা বাঞ্ছনীয়; মন্তব্যটি এ অংশের প্রথম ও শেষ পদে অর্থাৎ ৩:১১ক ও ৩:২৪খ-তে কেন্দ্রীভূত। পদ দু'টোর গুরুত্ব এ অংশের জন্য শুধু নয়, যোহনের 'খ্রীষ্টমণ্ডলী' ধারণা সূক্ষ্মরূপে উপলব্ধির জন্যই অপরিহার্য। 'কেননা যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ (৩:১১ক)'—এ বাক্য অনুসারে প্রেরিতদূতগণ, সাক্ষীগণ এবং বাণীপ্রচারকগণ দ্বারা আদি থেকে বরাবর প্রচারিত সংবাদ-ঘোষণাটির উপরই অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'আদি থেকে' বলতে সেই সময় বোঝায় যখন আমরা দীক্ষাস্নান গ্রহণে সারা জীবন ধরে প্রেরিতদূতগণের বা তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় সংবাদের সাক্ষীরূপে দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম (১:১-৪; ২:৭ …,২৪)। 'যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা (৩:২৪খ)': এ বাক্যটি আমাদের কাছে দেওয়া পবিত্র আত্মার আন্তর ও অধ্যাত্ম সমর্থনের উপরই জোর দেয় (৪:১৩; ৫:৯-১১)। হয়ত কেউ এ বাক্য দু'টোর মধ্যে পরস্পর বিরোধী ধারণা লক্ষ করতে পারে: বাণীপ্রচারকগণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করব, নাকি এমন মরমিয়া ও উচ্ছ্বাসজনক অনুভূতি পোষণ করব যেগুলি দ্বারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অধিকতরভাবে উপলব্ধি ক'রে তাঁর পরিচালনায় নতুন নতুন অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করব? সমস্যাটি এভাবেই উত্থাপন করলে তবে খুব জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এ ধরনের সমস্যার প্রতি যোহনের লেশমাত্র আকর্ষণ ছিল না, তিনি নিজেই প্রভুর প্রেরিতদূত ছিলেন এবং তা-ই বলে এ প্রকৃত দাবি সমর্থন করতেন তথা: স্বয়ং তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনের জন্য ধ্রুব নির্দেশস্বরূপ, অর্থাৎ মণ্ডলী সর্বদাই তাঁর দিকে চেয়ে থাকবে। এমনকি তিনি তাঁর নিজের এবং অন্যান্য প্রেরিতদূতগণের সকল সহকারী বাণীপ্রচারক ও উত্তরসূরীদেরও তেমন দাবি প্রাপ্ত বলে সমর্থন করতেন: প্রেরিতদূতগণ এবং যুগ যুগ ব্যাপী

তাঁদের পরম্পরাগত বাণীপ্রচারকগণের সঙ্গে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যই হল ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন-সহভাগিতালাভের জন্য প্রকৃত উপায় এবং সেই সহভাগিতাপ্রাপ্তির প্রকৃত প্রমাণ (১:৩)। কিন্তু একাধারে তিনি খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অন্তরে শিক্ষাদায়ী-ই পবিত্র আত্মার কথা সমর্থন করতেন (২:২০,২৭)। তবু খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অন্তরে দেওয়া পবিত্র আত্মার শিক্ষা এবং প্রচারকগণের সংবাদ-ঘোষণা অর্থাৎ বাণী-ঘোষণা ও বাণী-ব্যাখ্যা আদৌ পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া নয়। তিনি বরং প্রচারকদের বাহ্যিক ক্রিয়া এবং পবিত্র আত্মার আন্তর ক্রিয়া উভয়ই প্রয়োজনীয় ও পরস্পর পরিপূরক বলে সমর্থন করতেন। সুতরাং খ্রীষ্টবিশ্বাসী সর্বপ্রথমে প্রচারকদের বাণী-ঘোষণা ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করে ('যে তোমাদের শোনে, সে আমাকেই শোনে'), তা ঐশবাণী বলেই অন্তরে ধ্যান ও আপন ক'রে পবিত্র আত্মার আন্তর শিক্ষার আলোতে সেই ঘোষিত বাণীর অনির্বচনীয় গভীরতা উপলব্ধি করে এবং অবশেষে অনুভব করে সেই একই পবিত্র আত্মাই ঘোষিত বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেন (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'সহায়ক পবিত্র আত্মা' পরিশিষ্ট পৃঃ ২৪৭ দ্রষ্টব্য)।

৩ ১১ কেননা যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ:
আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।
১২ কাইনের মত যেন না হই: সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গাত,
এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল।
আর তাকে কেন বধ করেছিল?
কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়,
কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।
১৩ সুতরাং ভাই, জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে,
এতে আশ্চর্য হয়ো না।
১৪ আমরা জানি যে,
মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে।
১৫ যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক;
আর তোমরা তো জান, যে কেউ নরঘাতক,
তার অন্তরে অনন্ত জীবন থাকে না।
১৬ এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম,
কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।
১৭ কিন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে
সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও
তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে,
তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে?
১৮ বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়,
বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।
১৯ এতেই বুঝতে পারব, আমরা সত্য থেকে উদ্গাত,
এবং তাই তাঁর সম্মুখে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারব
২০ —আমাদের হৃদয় যে বিষয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন—
কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, আর তিনি সবই জানেন।
২১ প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে,
তাহলে ঈশ্বরের সামনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,

২২ আর যা কিছু যাচনা করি, তাঁর কাছ থেকে তাই পাই,
কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি
ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন করি।
২৩ আর এই তো তাঁর আজ্ঞা:
আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি
ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।
২৪ আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে,
সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।
আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন:
যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

৩:১১—যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ: বাক্যটি দ্বারা জানতে পারি পারস্পরিক ভালবাসাই সেই সংবাদের মর্মকথা যা দীক্ষাস্নান গ্রহণে জীবনের নিয়ম বলে খ্রীষ্টবিশ্বাসী গ্রহণ করে: ভালবাসাই হল সেই সংবাদ যা আজও বাণীপ্রচারকদের ঘোষণা করতে হয় (৩:১১ক) এবং ভালবাসাই হল সেই সংবাদ যা আত্মার আন্তর শিক্ষা গ্রহণে নিয়তই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের হৃদয়ঙ্গম করতে হয় (২:২০,২৭) ও দৈনন্দিন জীবন-বাস্তবায়নে যা পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশ্বাসীর অন্তরে সত্য বলে প্রমাণিত হয় (৩:২৪খ)। পত্রটির প্রেমাজ্ঞা ও চতুর্থ সুসমাচারে যীশুর দেওয়া আজ্ঞা একই কথা ব্যবহারে ব্যক্ত হয় (যোহন ১৩:৩৪): শিষ্যদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত যেইভাবে যীশু মৃত্যু পর্যন্ত আপনজনদের ভালবেসেছেন। এমনকি তেমন ভালবাসা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষেই শুধু পালন করা সামর্থ্য, কারণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাই মাত্র যীশুর কাছ থেকে প্রকৃত জীবন পেয়েছে বিধায় তা দান করতে সক্ষম। ঐশজীবনদাতারূপে যীশুকে স্বীকার করলে তবেই সমগ্র জগৎও এরূপ ভালবাসায় ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠবে। জগৎ যেন যীশুকে জানতে পেরে ভালবাসতে পারে এজন্যই খ্রীষ্টমণ্ডলী জগতে থেকে প্রেমাজ্ঞা উত্তমরূপে পালন করতে আহূত (বিস্তারিত ঐশতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য, যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৩:৩৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এখানে মঠের কর্ত্রীর কাছে সাধ্বী তেরেজার একটি চিঠিপত্র থেকে একটি উদ্ধৃতাংশ নিবেদন করি। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চেয়ে এতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়, পবিত্র আত্মার প্রেরণার আলোতে আদি থেকে শ্রুত সংবাদ ধ্যান করা একাধারে ও একই পরিমাণ-ক্রমবর্ধমান সংবাদ-উপলব্ধি ও জীবনরূপান্তর সৃষ্টি করে:

“শ্রদ্ধেয়া মাতা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই বছর পুণ্যপ্রেমের মর্ম বুঝতে পেরেছি; আগেও বুঝেছিলাম ঠিকই, কিন্তু অসম্পূর্ণভাবে। তখন যীশুর এই বাণীর মর্ম গভীরভাবে অনুধ্যান করিনি: ‘আর দ্বিতীয় বিধানটি প্রথমটির মত: তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে’। সবার আগে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম আর তাঁকে ভালবেসে বুঝেছিলাম যে শুধু কথা দিয়ে তাঁর প্রতি আমার প্রেম ব্যক্ত করা উচিত নয়, কেননা: ‘যারা আমাকে প্রভু! প্রভু! বলে ডাকে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, তা নয়! বরং আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যারা পালন করে তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।’ বলতে গেলে যীশু তাঁর সুসমাচারে বেশ কয়েকবার এমনকি প্রায় প্রতিটি পাতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু অন্তিম ভোজের সময় অনির্বচনীয় রহস্য মণ্ডিত দেহোৎসর্গের মাধ্যমে তিনি নিজেকে তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে যখন জেনেছিলেন তাঁদের অন্তরও তাঁর প্রতি ভালবাসার তীব্র দহনে দগ্ধ, তখন আমাদের এই প্রিয় ত্রাণকর্তা তাঁদের বলেছিলেন: ‘আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে

ভালবাসবে। আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি তোমরা পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাসবে। যদি তোমরা এইভাবে ভালবাস, তাহলে জগৎ জানবে যে তোমরা আমার শিষ্য।'

যীশু কিভাবে তাঁর শিষ্যদের ভালবেসেছিলেন আর কেনই বা তাঁদের ভালবেসেছিলেন? তাঁদের স্বাভাবিক গুণাবলির আকর্ষণে নিশ্চয়ই নয়, তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ব্যবধান ছিল অসীম। তিনি ছিলেন জ্ঞান, অনন্ত প্রজ্ঞাস্বরূপ আর তাঁরা ছিলেন অজ্ঞ, পার্থিব জগতের চিন্তায় ভরপুর দরিদ্র ধীবর মাত্র। তবু যীশু তাঁদের বন্ধু ও ভাই বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে একযোগে তাঁর পিতার রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁদের কাছে পিতার রাজ্যের দ্বার খুলে দিতে গিয়ে তিনি ক্রুশ মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি বলেছিলেন: 'বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।' শ্রদ্ধেয়া মাতা, যীশুর এই কথাগুলি চিন্তা করে বুঝেছিলাম, আমার ভগিনীদের প্রতি আমার ভালবাসা কত না অসম্পূর্ণ, আমি উপলব্ধি করেছিলাম ঈশ্বর যেমন তাদের ভালবাসেন আমি তাদের তেমনভাবে ভালবাসিনি। এখন আমি পরিপূর্ণ পুণ্যপ্রেমের অর্থ বুঝেছি—অপরের দোষত্রুটি সহ্য করা, তাদের দুর্বলতায় বিস্মিত না হওয়া, তাদের শ্রেয়াভ্যাসের সামান্যতম ক্রিয়াগুলিতে উৎসাহ বোধ করা এইগুলি পুণ্যপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সর্বোপরি আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে পুণ্যপ্রেমকে কখনোই অন্তরের গভীরে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। যীশু বলেছিলেন: 'বাতি জ্বেলে লোকে তো কখনোও ধামার নিচে রাখে না; তা রাখে বাতিদানেই; তবেই তো বাড়ির সবাই আলো পায়।' আমার মনে হয় এই বাতিই পুণ্যপ্রেমের প্রতীক যা শুধু আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের নয়, ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলকে আনন্দদান ও আলোকিত করে।

প্রভু যখন তাঁর মনোনীত জাতিকে আজ্ঞা দিয়েছিলে প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসতে তিনি তখনো পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করেননি, তিনি মানুষের আত্মপ্রেম কতখানি ভালভাবে জানতেন বলে মানুষের কাছে তার নিজের চেয়ে প্রতিবেশীকে অধিকতর ভালবাসার দাবি করতে পারেননি। কিন্তু যীশু যখন প্রেরিতদূতগণের এক নতুন আজ্ঞা দিয়েছিলেন—যে আজ্ঞা তাঁর নিজস্ব বলে তিনি পরে বলেছিলেন—তিনি প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসার কথা বলেননি, বরং বলেছিলেন স্বয়ং তাঁরই মত অর্থাৎ তিনি যেভাবে ভালবেসে যাবেন সেইভাবে আমাদের ভালবাসতে হবে ...।

প্রভু, আমি জানি, তুমি আমাদের অসম্ভব কোনো কিছু করতে আদেশ দাও না। তুমি আমার দুর্বলতা, আমার অসম্পূর্ণতা আমার চেয়ে আরো ভালভাবে জান। তুমি জান, তুমি আমার ভগিনীদের যেমন ভালবাস, আমি কখনোই তেমনভাবে তাদের ভালবাসতে পারব না—যদি না, ওগো যীশু, তুমি স্বয়ং আমার মধ্যে থেকে তাদের না ভালবেসে যাও। আমাকে এই অনুগ্রহটি দিতে চেয়েই তুমি নতুন আজ্ঞার সৃষ্টি করেছ।—আহা, এই আজ্ঞাটি আমি কত না ভালবাসি, তুমি আমায় যাদের ভালবাসতে আদেশ দাও আমার মধ্যে থেকেই তুমি তাদের ভালবাস—তোমার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে আজ্ঞাটি আমায় কত না নিশ্চিন্ত করে তোলে!" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ২৪৭-২৪৯; কলকাতা)

৩:১২—কাইনের মত যেন না হই: মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য যীশু আপন রক্ত প্রেমের প্রমাণস্বরূপ দান করেছিলেন। তাঁর বৈপরীত্যে কাইন ঈর্ষায় নিজের ভাইয়ের রক্তপাত ক'রে শয়তানের সন্তান বলে আত্মপরিচয় দিয়েছিল (আদি ৪:৭ ...)। শয়তানের প্রকৃত সন্তান বলে কাইন হল জগতের বিধানের অভিব্যক্তিস্বরূপ: কাইনের ভ্রাতৃহত্যায় ঈশ্বরের অনুযায়ী ক্রিয়া ও শয়তানের অনুযায়ী ক্রিয়ার মধ্যকার বৈপরীত্য বাস্তব প্রকাশ

পেয়েছে। শয়তানের অনুযায়ী ক্রিয়ার সর্বোত্তম পর্যায়ে হল পরের প্রাণোৎসর্গ, কিন্তু ঈশ্বরের অনুযায়ী ক্রিয়ার সর্বোত্তম পর্যায় হল আপন প্রাণোৎসর্গ। কাইনের মত অবিশ্বাসী জগতেরও যীশুর প্রতি ব্যবহার করেছিল, 'আমার প্রতি সংসারের ঘৃণা আছে কারণ তার বিষয়ে আমি এই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, তার কাজকর্মই অসৎ (যোহন ৭:৭)।' আবার স্পষ্টই লক্ষ করতে পারি ঐশলোক ও অধঃলোকের মধ্যকার ব্যবধান: প্রেম ঐশলোকেই অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সাধন করা সম্ভব, কারণ তেমন প্রেম হল ঈশ্বরের একটি দান, এমনকি 'ভালবাসা ঈশ্বরের' আত্মদান।

৩:১৩—(...) আশ্চর্য হয়ো না: সৎ ও অসৎ কাজকর্মের মধ্যকার ব্যবধান হল ঐশদত্তকপুত্রত্ব ও জগতের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামান্তর। খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মত যে আপন ঐশদত্তকপুত্রত্ব ও এর অনুবন্ধি নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন, সে জগতের নির্যাতনের জন্য আশ্চর্য হবে না, কেননা জগৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীকে জানে না শুধু এমন নয়, তাকে ঘৃণাই করে। সুতরাং জগতের ঘৃণা প্রমাণ করে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। অধিকন্তু খ্রীষ্টান হিসাবে জানি, আমরা আসলে ইতিমধ্যে এ জগতের কাছে মৃত, এমনকি মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি, অনন্ত জীবনে সঞ্জীবিত হচ্ছি, আর মরব না কখনও (যোহন ১১:২৬)।

একথা বলে যোহন অবশ্যই মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সেকালের তীব্র নির্যাতনও ইঙ্গিত করেন। সুতরাং তিনি রোম সাম্রাজ্য দ্বারা যারা নির্যাতিত, তাদের উৎসাহিত করতে চান। নিজের পত্রটিতে প্রেরিতদূত পিতরও লিখেছিলেন, 'প্রিয়জনেরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে অগ্নিকাণ্ড তোমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হয়ো না কেমন যেন তোমাদের অদ্ভুত কিছু ঘটছে; [১৩] বরং যতখানি তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার (১ পি ৪:১২-১৩)।'

৩:১৪—আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি: চতুর্থ সুসমাচারেও (যোহন ৫:২৪) যোহন একই বাক্য ব্যবহার করেন, যার জন্য উপলব্ধি করতে পারি, এ বাক্যটি পুনরুল্লেখে যোহনের স্থানীয় মণ্ডলী ঘোষণা করে, তার কাছে জীবনপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছে (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ৫:২৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ গুরুত্বপূর্ণ কথা স্পষ্টভাবেই অনুভব করা প্রয়োজন: বিশ্বাসের বন্ধনে যে যীশুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে চূড়ান্ত একটি পদক্ষেপ নিয়েছে, সে মৃত্যু থেকে যীশু দ্বারা উন্মুক্ত ঐশজীবনলোকে প্রবেশ করেছে। যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে আমাদের অস্তিত্বে পরিবর্তন ঘটে, সম্পূর্ণরূপে নতুন অবস্থায় উপনীত হয়ে উঠি, অর্থাৎ যেমন যীশুতে তেমনিভাবে যারা ভাইদের ভালবাসে সেই খ্রীষ্টানদের মধ্যে সত্যকার আলো চিরকালের মত বিরাজ করে এবং ঐশপ্রেম বাস্তবরূপে ও দায়িত্বপূর্ণভাবে উপস্থিত থাকে (২:৮খ)। মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি কিনা এর প্রমাণ আমাদের সচেতনতায় শুধু নির্ভর করে না। এমনকি তেমন সচেতনতায় যদি ভ্রাতৃপ্রেমের ফল না ধরে, তাহলে সেই সচেতনতা বিভ্রম ও মরীচিকা মাত্র। প্রকৃত সচেতনতা প্রেমের অনুভূতি ও মনোভাব দাঁড় করায় না বরং প্রেমসুলভ আচরণই সৃষ্টি করে এবং যীশুর মত প্রাণোৎসর্গ করতে আমাদের উদ্দীপিত করে। জীবনে পার হওয়া অর্থাৎ ত্রিত্বের সঙ্গে প্রাপ্ত জীবন-সহভাগিতার সচেতনতা কখনও আত্মকেন্দ্রীক নয়। বরং যাতে প্রেম-ফলে অধিক ফলশালী হই এ উদ্দেশ্যে সেই ঐশজীবন-সহভাগিতা আমাদের দেওয়া হল। ভাইদের যদি ভাল না বাসি তাহলে এখন থেকেই আমরা মৃত অর্থাৎ মৃত্যুর অধীনে আছি; কিন্তু তাদের যদি ভালবাসি তাহলে তাতেই বুঝতে পারি আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে যীশুতে জীবিত হয়ে উঠলাম, এমন জীবনে জীবিত যে-জীবন ভাইদের কাছে দান করা দরকার।

যোহনের ভাষা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য: এ পদ বলে, "আমরা জানি (...) পার হয়েছি।" 'জানা' ও 'পার হওয়া'

হল ৪র্থ সুসমাচারের (১৩:১,৩) সেই একই শব্দ দু'টো যা দিয়ে যোহন যীশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুরু করেন (অবশ্যই আমরা গ্রীক ভাষারই 'জানা' ও 'পার হওয়া' শব্দ দু'টোর কথা বলছি)। 'জানা': তিনি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছিলেন, যন্ত্রণাভোগের আগেও তা যীশু 'জানতেন', এমনকি 'জানতেন' বলেই পূর্ণসচেতন হয়ে মানবজাতির জন্য আপন জীবন দান করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই 'জানা' বা সচেতনতা এত গতিশীল ছিল যে তাঁর আত্মবলিদানে নিবেদিত তাঁর মহান প্রেমের প্রমাণস্বরূপ তিনি শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। 'পার হওয়া': চতুর্থ সুসমাচার বলে 'জগৎ থেকে যীশু পিতার কাছে চলে যাবেন'; গ্রীক ভাষায় 'পার হওয়া, এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া ও প্রস্থান করা' একই শব্দ। ক্রুশে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যীশু পিতার কাছে 'পার হয়েছিলেন', ফলত তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঐশগৌরব প্রকাশ পেয়েছিল: পিতা বাধ্য পুত্রের দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন এবং বাধ্য পুত্র পিতার দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। এ ঐশগৌরবের ফল হল জগতের কাছে ঐশজীবনদান, বা অন্য কথায় ত্রিত্বের জীবনে মানবজাতির পার। এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আমাদের 'জানা' বা সচেতনতা কী ধরনের ফলে ফলশালী হওয়া উচিত এবং কীভাবে ভাইদের ভালবাসা উচিত যদি নিশ্চিত হতে চাই আমরা ইতিমধ্যেই মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি। যেহেতু আমাদের পক্ষে জীবনদানের একমাত্র উপায় হল ভালবাসা, এজন্য যে ভালবাসে না সে মৃত্যুতে থেকে যায়, অর্থাৎ সে সবসময়ের মত যীশু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা-ই ক'রে নিজেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

৩:১৫—যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে …: যে খ্রীষ্টান ভাইদের ভালবাসে তার অবস্থা যত চমৎকার, যে খ্রীষ্টান ভাইদের ভালবাসে না তার দশা তত মারাত্মক: ভাইদের যে ভালবাসে না সে নরঘাতক আর ঈশ্বরের দরবারে নরঘাতক বলে বিচারিত হবে। যে ভালবাসে, এখন থেকে তার পুরস্কার যত মহৎ, তত ভয়ানক হল এখন থেকে তারই দণ্ড যে ঈশ্বরের সত্য ত্যাগ করে ভালবাসার বিরুদ্ধাচরণ করে। যে ভালবাসে, ইতিমধ্যেই সে সেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, যে-জীবন প্রথম পর্যায়ে জল ও আত্মায় নবজন্মের মাধ্যমে দেওয়া হয় (যোহন ৩:৫), কিন্তু যে-জীবনলাভ সেই ঐশজীবনবহনকারীর সঙ্গে আমাদের নিত্যস্থায়ী সংযোগের উপর নির্ভর করে যিনি খ্রীষ্টপ্রসাদের মাধ্যমেই বিশ্বাসীর অন্তরে তেমন ঐশজীবন রক্ষা ও বৃদ্ধি করেন (যোহন ৬:৫৬-৫৭)। খ্রীষ্টপ্রসাদের এ উল্লেখ যেন অপ্রাসঙ্গিক মনে না করি। বস্তুত আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, যোহন এ পত্রে আপন স্থানীয় মণ্ডলীর খ্রীষ্টানদের সতর্ক করতে চান তারা যেন ভ্রান্তমতাবলম্বীদের প্রচারে পথভ্রষ্ট না হয়। সেই ভ্রান্তমতাবলম্বীরা খ্রীষ্টপ্রসাদও অস্বীকার করত আর এর ফলে মাংসে ঐশবাণীর আগমন ও যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুও অস্বীকার করত। বাণীরূপে যীশুর অনুসরণ এবং প্রসাদরূপে যীশুকে গ্রহণের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে চতুর্থ সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ৬:৫৬-৫৭ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩:১৬—এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম …: এ পদ থেকে যোহন প্রকৃত ভালবাসা ও তার প্রকাশ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন: যীশুই প্রকৃত ভালবাসার মুখ্য আদর্শ। যিনি আপনজনদের জন্য সারা জীবন ধরে ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত আত্মদান করেছেন, সেই যীশুখ্রীষ্টে আমরা ভালবাসবার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি। সেসময় থেকে এ 'জানা' খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত এবং এখনও আমাদের মধ্যে কার্যকারী হতে চলছে; যীশুর ভালবাসা থেকেই আমরা ভালবাসা জানতে পারি। তবু যীশুর আত্মবলিদান ভালবাসার আদর্শ শুধু নয়; সেই ভালবাসা হল একটি ঐশশক্তি, আর এ ঐশশক্তি আমাদের কাছেই দান করা হয়েছে। সুতরাং যীশু যে ভালবাসায় আমাদের ভালবেসেছেন এবং যে ভালবাসাকে দানরূপে আমাদের দিয়েছেন, সেই ভালবাসায় ভিত্তি করলে তবে আমরাও প্রকৃতভাবে ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠব (২:৮খ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। চরম আত্মদান বলে ঐশপ্রেম যীশুতেই

বাস্তব ও চিরকালীন রূপ ধারণ করেছে; আমরা যারা যীশুর অনুসারী, তারা একইভাবে ভালবাসতে বাধ্য এবং ঈশ্বরপ্রবর্তিত প্রেম-আন্দোলন বা গতি চালিয়ে যেতে আহূত। স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে নির্দেশ করা হয়, যীশুর প্রেমের প্রমাণই হোক আমাদেরও প্রেমের প্রমাণের পরিমাপ তথা প্রাণোৎসর্গ পর্যন্ত আমাদের ভালবাসতে হয়। যীশুর মত, যে মরে অর্থাৎ ভাইদের জন্য যে আপন প্রাণ উৎসর্গ করে, সে প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই জীবিত ও গৌরবান্বিত, অর্থাৎ ঐশলোকে বাস করে। সে বাহ্যত মরে, কিন্তু সেও যীশুর পিতার কোলে সন্তানরূপে পরম ত্রিত্বের প্রেমে ও ঐশজীবনে চিরজীবিত আছে। অপর দিকে যে মরে না, এমনকি শারীরিকভাবে জীবিত হলেও তবু যে ভালবাসে না, সে আসলে নিজের ভাইকে বধ করে, কারণ তার জন্য আপন প্রাণ দেয় না। সুতরাং এটিই হল খ্রীষ্টানদের আহ্বান: যীশুর মত আমরাও ভাইদের জন্য প্রেমের বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করব। ভালবাসা বলতে জীবন, পরিত্রাণ, খ্রীষ্টান বোঝায়; সুতরাং যে ভালবাসে না, সে মৃত ও দন্ডিত, খ্রীষ্টান নয় সে! মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে একমাত্র পথ যীশু ও তাঁর মন্ডলীর মধ্য দিয়ে গেল: যীশু হলেন ভালবাসার আদর্শ ও ভিত্তিস্বরূপ এবং খ্রীষ্টমন্ডলী হল সেই ভালবাসা বাস্তবায়নের স্থানস্বরূপ। খ্রীষ্টমন্ডলীর ইতিহাসে অনেকে যীশুর প্রকৃত অনুসারী অর্থাৎ প্রেমের শহীদ হলেন, তাঁরা খ্রীষ্টমন্ডলীর গৌরব; স্থানাভাবে শুধু একজনের কথা উল্লেখ করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাজী সৈন্যদের কারাগারে ফাদার ম্যাক্সিমিলিয়ান কল্‌বে প্রাণদণ্ডে আত্মনিবেদন করেছিলেন যাতে একজন সহবন্দি রক্ষা পায়। নাস্তিক সৈন্যেরা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কেনই বা তা করতে যাচ্ছিলেন তিনি অতিসরলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি একজন ক্যাথলিক পুরোহিত’ (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৩:১-১৭; ১৫:১২-১৩ এর ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য: যীশুর প্রাণোৎসর্গ হল আমাদের জন্য আদর্শ ও আহ্বান স্বরূপ, আমরা যেন তদনুসারে করি)।

৩:১৭-১৮—কিন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে ...: যোহন ভালভাবে জানতেন, ভাইদের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রাণোৎসর্গের মত প্রয়োজনীয়তা বাস্তব বটে, অথচ প্রত্যেকদিনের প্রয়োজনীয়তা নয়। এজন্য তিনি এ পদে দেখাতে চান কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের আজ্ঞা পালন করতে পারি। প্রত্যেকদিন আমরা যদি অভাবগ্রস্ত ভাইয়ের জন্য কিছু ত্যাগ করতে না পারি তাহলে তার জন্য কখনও প্রাণোৎসর্গ করতে পেরে উঠব না। যোহনের বাস্তব দৃষ্টান্ত সেকালে প্রচলিত অর্থদানের দিকে অগ্রসর হয় (দ্বিঃবিঃ ১৫:৭; মথি ৬:২৪; লুক ১২:৩৩; শিষ্য ২:৪৪; ৩:২; যাকোব ২:১৪-১৮)। একথা বলা চলে, সে-ই শুধু বাস্তবে প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে সক্ষম, যে আপন খ্রীষ্টীয় জীবন নিজস্ব সম্পদ নয় বরং আত্মদান বলে উপলব্ধি করতে পেরেছে। প্রতিবেশীর প্রতি স্নেহ-মমতা না থাকলে তবে ঈশ্বরজ্ঞানও নেই এবং একাধারে ঈশ্বরজ্ঞান না থাকলে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাও থাকে না। ঈশ্বরের প্রেম যে প্রচার করে বেড়ায় আর ভাইদের জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে নিজেকে প্রস্তুত ঘোষণা করে, অথচ দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশীকে বাঁচাতে পারে না, তার মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের লেশমাত্র নেই, সত্যও নেই, কেননা ঐশপ্রেম হল ভাইয়ের প্রতি প্রেমের উৎসর্গস্বরূপ এবং সত্য হল মানুষের অন্তরে এমন ঐশশক্তি (১:৮) যা অবশ্যপালনীয় আজ্ঞায় বাস্তবায়িত হওয়া চাই—যদি যীশু দ্বারা তাঁর বন্ধু বলে পরিগণিত হতে চাই (যোহন ১৫:১৪)। যে কথায় ধন্য অথচ কাজে শূন্য, সে খ্রীষ্টান নয়। কথায় ধন্য এবং কাজে ধন্য, এটিই সঙ্গত খ্রীষ্টীয় নিয়ম। অভাবগ্রস্ত ভাইকে সাহায্যদান: সম্পূর্ণ প্রাণোৎসর্গের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

৩:১৯-২০—এতেই বুঝতে পারব, আমরা সত্য থেকে উদ্গত ...: প্রেমসাধনা থেকেই খ্রীষ্টান বুঝতে পারে সে সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা (২:২৮ ...)। কিন্তু যতক্ষণ এ মর্তজগতে আছি ততক্ষণ আমরা দুর্বল

মানুষ, এমনকি আমাদের প্রেম-অবহেলার জন্য অধিক দুঃখ ভোগ করতে পারি। একথা জেনে যোহন আমাদের স্মরণ করান, আমাদের বিবেকের চেয়ে ঈশ্বরই মহান, কেননা শুধু তিনিই আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে শান্তি দিতে পারেন। প্রেমসাধনার জন্য আমাদের বাস্তব উদ্যোগ এবং তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকতে আমাদের প্রচেষ্টা দেখে তিনি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তিনি দেখতে চান, আমাদের প্রেমসাধনা সর্বদা তাঁর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক, তিনিই আমাদের সকল সাধনার শক্তি হোন।

ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান তাঁর প্রেম ও ক্ষমাদানের আকাঙ্ক্ষার ফল; কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও বিচার হিংসা, ঘৃণা ও শাসনের ইচ্ছা থেকে উদ্গত হয়। প্রেমের এক বিন্দু মাত্রও থাকলে, তবে আমাদের ক্রিয়াকর্মের যা লোকদের কাছে এমনকি অহঙ্কারবশত আমাদের নিজেদেরও কাছে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়, তা ঈশ্বরের চোখে সুন্দর। ঈশ্বরের দিব্য জ্ঞান আমাদের ভয় ও নিরাশা নয়, বরং প্রত্যাশা ও ভরসার কারণ হওয়া চাই। পিতার প্রেম ছাড়া যীশুও আছেন। আমাদের সমর্থনকারী উকিলরূপে তিনি পিতার সামনে দাঁড়িয়ে অবিরত তাঁর নিজের আত্মবলিদান তাঁকে স্মরণ করান এবং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৩:২১—প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে: যখন ঈশ্বরের অসীম করুণা আমাদের হৃদয়ের দন্ড নিঃশেষ করে ফেলে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্ত্বনা পেয়ে যখন আমাদের বিবেক আমাদের আর দোষী করে না, তখন ঈশ্বর নতুন এক দান আমাদের নিবেদন করেন। দানটি হল এমন সাহস যা কেবলমাত্র পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অধিকার: আমরা ঈশ্বরের সামনে সৎসাহস ও পূর্ণ আশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে পারি। এ দানের গুণে ঈশ্বরকে হিংস্র রাজা বা বিচারক বলে নয়, বরং প্রেম ও জীবনের উৎসস্বরূপ বলে জানি।

৩:২২ক—আর যা-কিছু যাচনা করি …: ঈশ্বরকে পিতা বলে ভালবাসি বলে আমরা যে কোন ভয় থেকে মুক্ত হই এবং এত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে উঠি যে আমাদের যাচনাপূরণ সম্বন্ধে নিশ্চিত আছি (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৪:১২-১৪; ১৫:৭; ১৬:২৪ এর ব্যাখ্যা ও 'যাচনা' পরিশিষ্ট পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আমাদের যাচনা যদি আমাদের পরিত্রাণ বা জগতের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত যাচনা না হয়, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তা পূরণ করবেন না। সবসময় ঈশ্বরের কাছে যাচনা ও প্রার্থনা নিবেদন করব, কিন্তু মনে রাখব তিনি চিকিৎসক আর আমরা রোগী, ফলে তাঁর চিকিৎসা অর্থাৎ তাঁর প্রেমপূর্ণ অনুগ্রহ আমাদের মুখে তিত লাগতেও পারে।

৩:২২খ—কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করলে অর্থাৎ তাঁকে এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসলে তবেই ঈশ্বর আমাদের যাচনা গ্রহণ করেন। এ দ্বারা যোহন আমাদের স্মরণ করাতে চান, পিতার প্রতি আমাদের আশ্বাস এবং তাঁর ক্ষমালাভ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়তা তখনই প্রকৃত আর অকৃত্রিম হয়, যখন যীশুর সক্রিয় অনুসরণে প্রকাশ পায়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের নিষ্ক্রিয় করার কথা না, বরং সেই ভালবাসাকে ভাইয়ের কাছে দিতে আমাদের প্রেরণা দেবে।

৩:২৩—আর এই তো তাঁর আজ্ঞা …: যোহনের মন এবং পত্রটির উদ্দেশ্য সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করার জন্য এ পদ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ধারণায় আমাদের কাছে যীশু দু'টো জিনিসের দাবি করেন: বিশ্বাস ও ভালবাসা। কিন্তু শব্দ হিসাবে পৃথক হলেও, তবু 'বিশ্বাস' ও 'ভালবাসা' একমাত্র বাস্তবতা বলে পরিগণিত করা চলে। বিশ্বাস ও ভালবাসা একমাত্র আজ্ঞায় একীভূত হয়, যেন একই মুদ্রার দুই মুখ: ধর্ম এবং কর্ম এক, অধ্যাত্ম সাধনা এবং নৈতিক আচরণ এক; ভালবাসা (অর্থাৎ কর্ম বা নীতি) বিশ্বাসে (অর্থাৎ ধর্মে বা অধ্যাত্ম সাধনায়) প্রতিষ্ঠিত হতে হয় বটে আর একাধারে বিশ্বাস প্রেমপূর্ণ আচরণে প্রকাশ পাওয়া চাই। বিশ্বাস ও ভালবাসা

একমাত্র বাস্তবতা বলে পরিগণিত করা চলে ঠিকই, তবু একথাও স্বীকার্য, ভালবাসার চেয়ে বিশ্বাসই প্রধান। এ পদে 'বিশ্বাস'-এর অর্থ হল মণ্ডলীগতভাবে যীশুকে স্বীকার করা ও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা। অধিক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করতে গেলে তবে 'খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করা' বলতে একথা বোঝায়: আমরা যীশুকে ব্যক্তি বলে গ্রহণ করব, তাঁর দেওয়া 'সংবাদ'ও গ্রহণ করব এবং মণ্ডলীতে তাঁর উপস্থিতি স্বীকার করব। যীশুকে স্বীকার করা অথচ তাঁর আত্মপ্রকাশ বা 'সংবাদ' অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নয়, কেননা এভাবে এক দিকে যীশুকে ঈশ্বরপুত্র ও ত্রাণকর্তা স্বীকার করব এবং অপর দিকে তাঁর জীবন ও 'সংবাদ' পরিত্রাণদায়ী ও ঐশ্বরিক বলে অস্বীকার করব। যীশুর সংবাদ উত্তম মনে করা অথচ যীশুকে ঈশ্বরপুত্র ও ত্রাণকর্তা বলে অস্বীকার করা, একথাও সঙ্গত নয়, কারণ এভাবে আমরা তাঁর সকল বাণী আত্মা, জীবন ও পরিত্রাণ বলে অস্বীকার করব এবং তাঁর সংবাদ সাধারণ লৌকিক দর্শনবাদে পরিণত করব। বলা বাহুল্য এতে মানুষ ঐশজীবন কখনও পাবে না। অবশেষে, মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করাও সঙ্গত নয়: যে-মণ্ডলীকে স্বয়ং যীশু স্থাপন করেছেন, শুধু সেই মণ্ডলীকে গ্রহণ করলে যীশুকে গ্রহণ করা যায়। যখন আমরা যীশুকে গভীরভাবে ও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করি, অর্থাৎ যখন তাঁকে ত্রাণকর্তা, তাঁর সংবাদ পরিত্রাণদায়ী ঐশশক্তি এবং মণ্ডলীকে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতার ভিত্তি বলে গ্রহণ করি, তখন যীশুর সংবাদ পালন করার জন্য অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেম সাধন করার জন্য ঐশশক্তি লাভ করি। ভাইদের প্রতি আমাদের ভালবাসায় প্রমাণিত হয় যে আমাদের ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ভালবাসা, অর্থাৎ আমাদের ভালবাসা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে আমাদের সেই জীবন-সহভাগিতা থেকে উদ্গত, আবার প্রমাণিত হয় যে, সহভাগিতা প্রেরিতদূতগণ ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তেমন ভালবাসা হল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সংযোগের অর্থাৎ বিশ্বাসের প্রমাণ।

উপরন্তু ভাইদের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে যে, পিতা নিজের একমাত্র পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করাতে যে প্রেমের গতি প্রবর্তন করেছিলেন (যোহন ৩:১৬), তা এখনও খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ক্রিয়াশীল ও প্রতীয়মান একটি বাস্তবতা: আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমের মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্যদান করি, 'ভালবাসা ঈশ্বর' সমগ্র জগতের পরিত্রাণকর্মে এখনও প্রবৃত্ত আছেন এবং তেমন 'ভালবাসা ঈশ্বরকে' পাবার স্থান হলাম খ্রীষ্টমণ্ডলী হয়ে আমরা নিজেরাই।

৩:২৪ক—আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে …: তাঁর আজ্ঞাগুলি পালনে আমরা ঈশ্বরে স্থিতমূল থাকি। তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকতে অর্থাৎ আজ্ঞাগুলি পালনে তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায় অধ্যবসায়ী হওয়াতে আমরা অনন্ত জীবন পাই (যোহন ৩:১৫)।

৩:২৪খ—আর এতেই আমরা জানতে পারি …: ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতার প্রমাণ হল পবিত্র আত্মার প্রাপ্তি (যোহন ১৪:২৪)। পবিত্র আত্মাই আমাদের বিশ্বাস-স্বীকার ও ভ্রাতৃপ্রেমের জন্ম দেন (৩:২৩) এবং আমরা যে ঐশজীবনে পরিপূর্ণ ও ঈশ্বরের একতার সহভাগী তা জানবার জন্য আমাদের সক্ষম করে তোলেন। আবার পবিত্র আত্মার ভূমিকা হল ঈশ্বরত্বের মর্ম সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেওয়া ও যীশুর বাণী সজীব বাণী বলে আমাদের আস্বাদন করিয়ে দেওয়া (২:২৭); তা ঘটে যখন আমরা যীশুর বাণীকে ঘোষণাকারী ও ব্যাখ্যাকারী প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের কথা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি। অবশেষে পবিত্র আত্মা সেই বাণীতে আমাদের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করবেন, অর্থাৎ সেই বাণীনিহিত সত্য সম্বন্ধে আমাদের উদ্বুদ্ধ করবেন, এমনকি তেমন 'সত্য সাধন করবার' শক্তি অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেম পালন করবার শক্তি আমাদের দান করবেন।

যীশুর অনুসারীদের কাছে চরম দান হিসাবে দেওয়া পবিত্র আত্মাকে যীশুর পুনরুত্থানের ফলস্বরূপ দান করা

হয়েছে এবং বর্তমানে দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যেন মনে না করি পবিত্র আত্মা জাদুশক্তির মত বা এক একজন খ্রীষ্টানের জন্য বিপরীতভাবে ক্রিয়াশীল হন: যেখানে হিংসা, ঘৃণা, বিচ্ছেদ, জাদু ইত্যাদি মৃত্যুজনক শক্তি আছে সেখানে খ্রীষ্টমণ্ডলীর মৃত্যু হয়; পক্ষান্তরে, অধিক পরিবর্ধমান একতায় ও ভ্রাতৃপ্রেমে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে সঞ্জীবিত করাই পবিত্র আত্মার ভূমিকা।

প্রথম পত্রে পবিত্র আত্মার কথা এখানেই প্রথমবারের মত উল্লিখিত। পবিত্র আত্মার কথা এ অংশ শেষ করে এবং পুনরায় তাঁর কথা নিয়ে নতুন অংশ শুরু হয়। পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে পবিত্র আত্মার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে: আজ্ঞাগুলি পালনের জন্য শক্তি শুধু নয়, অধিক তাত্ত্বিক আত্মসচেতনতা লাভের জন্যও শক্তি নয়, বরং খ্রীষ্টবিশ্বাস নিখুঁত পালনের জন্যই তিনি ঐশশক্তি: খ্রীষ্টসাধিত ঐশপ্রকাশে বিশ্বাস করা-ই হল মানুষ ও খ্রীষ্টমণ্ডলীকে উপলব্ধি করার জন্য ভিত্তিস্বরূপ।

জগৎ ও খ্রীষ্টবৈরীর বিষয়ে সাবধান (৪:১-৬)

পত্রটির প্রথম ভাগে (১:৫–২:২৯) যে দু'টো প্রসঙ্গ—'জগতের বিষয়ে সাবধান' এবং খ্রীষ্টবৈরীর বিষয়ে সাবধান'—পৃথক দু'টোই অংশে আলোচিত হয়েছিল (২:১২-১৭ এবং ২:১৮-২৯), এ দ্বিতীয় ভাগে সেই প্রসঙ্গ দু'টো একটিমাত্র অংশে আলোচনা করা হয়। পূর্ববর্তী অংশের শেষ পদের সঙ্গে সংযোজন ঘটিয়ে যোহন নকল আত্মাগুলি বিষয়ে আমাদের সাবধান করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বিচারের মান দু'টো নিবেদন করেন:

১। প্রকৃত খ্রীষ্টান যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে;

২। প্রকৃত খ্রীষ্টান আদি থেকে ঘোষিত সংবাদ গ্রহণ করে।

এ বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা পরবর্তী ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা।

৪ ১ প্রিয়জনেরা, তোমরা যে কোন আত্মাকেই বিশ্বাস করো না;
কিন্তু সকল আত্মাকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা,
কারণ অনেক নকল নবী জগতে বেরিয়েছে।
২ এতেই তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার:
যে কোন আত্মা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে,
তা ঈশ্বর থেকে;
৩ এবং যে কোন আত্মা যীশুকে বিলুপ্ত করে, তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়,
এমনকি এটা হল সেই খ্রীষ্টবৈরীর আত্মা,
যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ, সে আসছে,
এমনকি এর মধ্যে সে জগতে উপস্থিত।
৪ তোমরা, হে বৎস,
তোমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, আর তাদের জয় করেছ;
কারণ জগতে যা আছে,
তার চেয়ে মহত্তর তিনি, যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন।
৫ তারা জগৎ থেকে উদ্গত, তাই জগতের ভাষা বলে
এবং জগৎ তাদের কথা শোনে।
৬ আমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত:
ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ করে, সে আমাদের শোনে;
ঈশ্বর থেকে যে উদ্গত নয়, সে আমাদের শোনে না।
এতেই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

৪:১—যে কোনো আত্মাকে বিশ্বাস ক'রে না: পবিত্র আত্মাই খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অস্তিত্ব ও আচরণের অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভালবাসার মূলশক্তিস্বরূপ (৩:২৩-২৪)। কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বরের তেমন আত্মা অদৃশ্যমান, আমাদের মানবীয় ইন্দ্রিয়গুলির অতীত, রহস্যময়ভাবে ক্রিয়াশীল। একথাও জানি, ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া এ জগতে অশুভ শক্তির আত্মাও ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত, সেও আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলির অতীত। সুতরাং আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয় যাতে ঈশ্বরের আত্মাকে অনুসরণ করি বলে মনে ক'রে অশুভ আত্মাকেই অনুসরণ না করি! অশুভ আত্মা অনেক নকল নবীর মাধ্যমে কাজ করে এবং জগতের মিত্র সে, এমনকি সে-ই হল জগতের অধিপতি। সে আমূলে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে ধ্বংস করতে অতিব্যস্ত এবং এ উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সভ্যদেরই পর্যন্ত নিজের কাজে লাগায়। খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রায় শুরু থেকে নকল নবীদের আবির্ভাব হয়েছিল আর ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক ছিল, কেননা তেমন নবীরা মণ্ডলীর সভ্য হওয়াতে নিজেদের দলে অনেক সরল খ্রীষ্টভক্তদেরও আকর্ষণ করত। সম্ভবত তাদের অনেকে আশ্চর্য কাজও সাধন করতে পারত, যার জন্য জনগণ তাদের আশ্চর্য কাজগুলি দেখে তাদের শিক্ষা সত্য বলে বিবেচনা করত। কিন্তু যীশু নিজ দূরদর্শিতায় এ সবকিছু স্পষ্টই পূর্বঘোষণা করেছিলেন (মথি ২৪:১১-২৪; মার্ক ১৩:২২)। সুতরাং কেমন করে সত্যময় আত্মা থেকে ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করা যায়? কেমন করে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের প্রকৃত বা নকল বলে গণনা করা যায়? এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করার জন্যই যোহন পরবর্তী পদে প্রথম বিচারমান ব্যক্ত করেন।

৪:২—যে কোনো আত্মা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে …: এ বিশ্বাস-সূত্রই হল প্রথম বিচারমান যাতে জানতে পারি একটি আত্মা (এবং আমরাও) ঈশ্বরের কি না। যোহনকালীন নকল নবীরা উল্লিখিত বিশ্বাস-সূত্র মানত না; তারা বলত খ্রীষ্ট জগতের ত্রাণকর্তা ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বর বলে তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত মানুষ হননি। অপর পক্ষে যোহনের বিশ্বাস-সূত্র ঠিক এ রহস্যময় দিক বাস্তব বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ, মারীয়ার পুত্র যীশু এবং পিতাপ্রেরিত খ্রীষ্টরূপে ঐশবাণী একই ব্যক্তি। এ সম্বন্ধে ২:২২-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খ্রীষ্ট বা মসীহ রূপে যীশুকে গ্রহণ করে আমরা তাঁকে ইতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ বলেই গ্রহণ করি: সৃষ্টিকর্ম থেকে প্রাক্তন সন্ধি পর্যন্ত বরাবর ঈশ্বর যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সাধন করে এসেছিলেন তা যীশুর আগমন প্রস্তুত করার জন্যই করেছিলেন। উপরন্তু খ্রীষ্ট বলে যীশুকে গ্রহণ করে আমরা এ সত্যও স্বীকার করি, চরম পরিত্রাণ সম্পর্কিত যে যে প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর মানবজাতিকে দিয়েছিলেন, সেই সকল প্রতিশ্রুতি যীশুতেই সিদ্ধিলাভ করেছে। সুতরাং যারা যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করে তারা পাপময় পূর্বাবস্থায় পতিত হয়, ফলত ঈশ্বর থেকেও দূরে সরে যায়। কিন্তু তবুও যে নকল নবী থেকে যোহন আপনজনদের রক্ষা করতে ব্যাপৃত ছিলেন, সম্ভবত তারাও এ সমস্ত সত্য বলে স্বীকার করত। তাদের ভ্রান্তমত মাংসে ঈশ্বরের আগমন অস্বীকার করত। তাদের ধারণায় পরমপবিত্র, অক্ষয়, অনাদি-অনন্ত বলে ঈশ্বরের পক্ষে মানবদেহ ধারণা করা একান্ত অসাধ্য, কারণ 'মাংস' অর্থাৎ জগৎ অপবিত্র, ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষণস্থায়ী; তাছাড়া—তারা বলত—কেমন করে স্রষ্টা সৃষ্টবস্তু হতে পারে? কিন্তু, এ সমস্ত আপত্তিতে যুক্তিসঙ্গত প্রত্যুত্তর বের করা যে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর সমস্যা তা নয়, কেননা মানবীয় যুক্তির দিক দিয়ে এ সকল আপত্তি গ্রহণযোগ্য। অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীর মধ্যকার পার্থক্য এটি, বিশ্বাসী ঈশ্বরের সর্বশক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে তথা, মানুষের পক্ষে যা অচিন্তনীয় ও সাধ্যের অতীত, ঈশ্বরের কাছে তা নিতান্ত সহজসাধ্য; অধিকন্তু ঈশ্বরকে মানবীয় যুক্তির গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে নেই; অবশেষে, ঈশ্বর যদি একটিমাত্র কাজ সাধন করতে না পারতেন তাহলে তিনি কী ধরনের ঈশ্বর হতেন? সুতরাং, যেমন বিশ্বাস ছাড়া কোন যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে অক্ষম, তেমনিভাবে মাংসে ঐশবাণীর আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাস ছাড়া আর কোন যুক্তি নির্ভরযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে যোহনের বিশ্বাস এরূপ: 'মাংসে আগত বলে যীশুখ্রীষ্টকে স্বীকার' করে আমরা তাঁকে ঈশমানব বা মানবেশ্বর বলে স্বীকার করি। অর্থাৎ সমর্থন করি তিনি একাধারে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ হওয়াতে তাঁর ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ন থাকল, আর এজন্য তিনি জগতের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন (২:২), পারস্পরিক প্রেমাজ্ঞায় ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি মানুষের কাছে ন্যস্ত করেছেন (৩:১৬ ...) এবং আপনজনদের কাছে অনন্ত ও সত্যকার জীবনকে বাস্তব পরিবেশে অর্থাৎ জীবন্ত মণ্ডলীতে দান করেছেন (১:১-৩; ২:২২-২৫; ৪:১৫; ৫:১,৫; ২ যোহন ৭)। যোহন জোর দিয়ে 'মাংসের' কথা উল্লেখ করেন: মাংসে আগত অর্থাৎ নাকি মানুষ হওয়া যীশুতে ঈশ্বর মানবজাতির যত দুর্বলতা ও নশ্বরতা আপন করেছেন। হিব্রুদের প্রতি পত্রও যীশুর মানবীয় অবস্থার দুর্বলতার উপর জোর দেয়, 'সেই খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ ক'রে যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম' (হিব্রু ৫:৭): এতে প্রমাণিত হয় যীশু সত্যই মানুষের দুর্বলতা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অতি গভীরে অভিজ্ঞতা করেছিলেন, কিন্তু একাধারে ঈশ্বর হওয়াতে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তার পরিত্রাণ সাধন করলেন।

৪:৩—এবং যে কোনো আত্মা যীশুকে বিলুপ্ত করে ...: খ্রীষ্টবিশ্বাস-সূত্র অস্বীকার করলে তবে 'যীশুকে বিলুপ্ত করা হয়', ফলত ঈশ্বরের সেই মুক্তি-পরিকল্পনাকেও শূন্য করা হয় যার শীর্ষপর্যায় হল মাংসে ঐশবাণী-যীশুর আগমন। 'মাংসে আগত' বলে যীশুখ্রীষ্টকে অস্বীকার করলে অর্থাৎ বাণী যে হলেন মাংস (যোহন ১:১৪) তা অস্বীকার করলে যে কী ঘটে তা অনুভব করতে চেষ্টা করি। যদি যীশু প্রকৃত মানুষ না হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের পক্ষে তাঁর আদর্শ অবশ্যপালনীয় নয়, এমনকি তিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বরের মহাযাজক আর নন। বস্তুত হিব্রুদের প্রতি পত্র প্রচার করে, ঈশ্বরের কাছে মানবজাতিকে চালনা করার জন্য, অর্থাৎ মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করার জন্য মহাযাজককে সম্পূর্ণরূপে মানুষের মতই হতে হয় এবং মানবজাতির যত দুর্বলতা ও প্রলোভন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হতে হয় (হিব্রু ৪:১৪-১৫)। উপরন্তু মাংসে ঐশবাণীর আগমন অস্বীকার করলে তবে যীশুখ্রীষ্টের আত্মবলিদানও অস্বীকার করা হয়; ফলে পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি, বিশেষত খ্রীষ্টপ্রসাদই অস্বীকার করা হয়, কেননা খ্রীষ্টপ্রসাদই সাক্ষ্য বহন করে যীশুর ক্রুশমৃত্যুই অনতিক্রমণীয় অনন্য পরিত্রাণের উৎস এবং মাংসে আগত ত্রাণকর্তার প্রমাণস্বরূপ: সত্যিই মাংসে আগমন করেছিলেন বলেই যীশু ক্রুশমৃত্যু বরণ করতে পেরেছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আপন মাংস প্রসাদরূপে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হলেও এ ইঙ্গিত থেকে আমরা 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্যের (যোহন ১:১৪) গুরুত্ব ও প্রাধান্য অনুভব করতে পারি। 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্য সম্বন্ধে অবিরত ধ্যান-অনুধ্যান করা একান্ত প্রয়োজন। এতে আমাদের বিশ্বাস অধিক বলবান হয়ে উঠবে, যীশু সম্বন্ধে অধিকতর গভীর উপলব্ধি অর্জন করব এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে (২:২০,২৭) সেই ধ্যান ও গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পিতার মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারব, কারণ ঈশ্বরে মানুষে প্রবর্তিত ঐক্যই মাংসে বাণী-যীশুর আগমনের সেই প্রকৃত ফল যা এখন থেকেই আস্বাদন অর্থাৎ উপলব্ধি ও বাস্তবায়িত করা চাই। এ পরম বাস্তবতা যে উপলব্ধি ও বাস্তবায়িত করতে চায় না, অর্থাৎ যে কথায় শুধু মাংসে যীশুর আগমনকে বিশ্বাস করে অথচ তেমন ঐশরহস্য-চালিত জীবন যাপন করতে সম্মত নয়, সে-ই যীশুকে 'বিলুপ্ত করে' অর্থাৎ অস্বীকার করে। আমি যীশুতে রোপিত হয়ে আছি একথা যদি সচেতন না হই, তাঁর দ্বারা সঞ্জীবিত হবার জন্য যদি আমার কোন চিন্তা না থাকে, আমার খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ব যদি শুধু জাতি ও সমাজগত একটি ব্যাপার হয়ে বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে, অর্থাৎ আমি যদি যীশুর বলীকৃত

মাংস দ্বারা সাধিত ক্ষমা প্রার্থনা না করি এবং তাঁর বিদ্ধ বুক থেকে সাক্রামেন্তগুলিরূপে দেওয়া সেই ঐশজীবনে সঞ্জীবিত হতে সচেষ্ট না থাকি, তাহলে আমি যীশুকে 'বিলুপ্ত করলাম।' যখন যীশুর অনুকরণে ভাইদের সঞ্জীবিত করার জন্য প্রাণোৎসর্গ করি (৩:২৩), তখনই আমি যীশুকে, এমনকি 'মাংসে আগত বলে যীশুখ্রীষ্টকে' স্বীকার করলাম।

উপসংহারস্বরূপ বলতে পারি, যোহনের ধারণায় 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্যই (যোহন ১:১৪) হল সেই মূলঘটনা যার দিকে সমগ্র জগৎ ও খ্রীষ্টবিশ্বাস নির্দেশ করে। সাধু আগস্তিনের মতে, পবিত্র বাইবেলের চেয়ে ভক্তিপূর্ণ পুস্তক থাকুক, অন্যান্য ধর্মের দর্শনবাদ খ্রীষ্টান ধর্মের চেয়ে গভীরতর হোক, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে অসংখ্য তুলনাও করা যাক, কিন্তু বাইবেলের একটি কথা যুগ যুগান্তর ব্যাপী অতুলনীয় ও নতুন হয়ে থাকবে, সেটি হল মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমন—'বাণী হলেন মাংস'—কেননা শুধু খ্রীষ্টবিশ্বাস একথা প্রচার করে, এমনকি একথা খ্রীষ্টীয় অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ, একথা সেই পরম ঘটনা নির্দেশ করে যা জগতের ইতিহাসে নতুন গতি দিয়েছে এবং একথা সম্বন্ধে বিচার করার অধিকার কারও নেই, কারণ যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা বৃথা কাজ: তাঁকে যে গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে সে ইতিমধ্যেই ঐশজীবন পেয়ে গেছে এবং তাঁকে যে গ্রহণ করে না বা তাঁকে যে কথায় মাত্র গ্রহণ করে কিন্তু তাঁর অনুসরণ করে না, সে নিজেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

৪:৪—তোমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত: ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে এবং জগৎ ও মণ্ডলীতে খ্রীষ্টবৈরী হয়ে উপস্থিত ভ্রান্তমতাবলম্বীদের বৈষম্যে (৪:৩খ), যোহন প্রকৃত খ্রীষ্টভক্তদের নিশ্চিত করেন, তাদের মধ্যে অবস্থানকারী ঐশবাণী গুণে (২:১৩-১৪) এবং তাদের নিখুঁত বিশ্বাসের বলে (৫:৪ …; যোহন ১৬:৩৩; প্রত্যা ১২:১১-১৭) তারাই ইতিমধ্যে জয় পেয়ে গেছে, অর্থাৎ তাদের জয়প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এ সচেতনতার উপর নির্ভর করে যে, 'জগতে যা আছে, তার চেয়ে মহত্তর তিনি যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন।' আমাদের পাশে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের অন্তরে তিনি ক্রিয়াশীলভাবে বিরাজ করছেন এবং আমাদের মাধ্যমে অশুভ শক্তিগুলি পরাজিত করে যাচ্ছেন; যারা মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমন সত্যটা গ্রহণ করে তাদের কাছে এ সবকিছু বাস্তব, কারণ ঠিক এগুলিই মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমনের ফল। মৃত্যুবরণ করাতে যীশু মৃত্যু বিনাশ করলেন এবং যিনি স্বয়ং অনন্ত জীবন ও পিতার কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ সেই একই যীশু নিজের মধ্যে আমাদের ধারণ করলেন আর তাই ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। কথায় বা ব্যবহারে যীশুকে যে অস্বীকার করে, সে এমন সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করতে যায় যে আগে থেকেই পরাজিত, এবং সেই খ্রীষ্টমণ্ডলী থেকে নিজেকে বহিষ্কৃত করে, যে মণ্ডলী খ্রীষ্টের বিদ্ধ বুক থেকে নিঃসৃত রক্ত ও জল অর্থাৎ পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি পাবার জন্য একমাত্র স্থান। আর যেহেতু পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি হল খ্রীষ্টীয় আদর্শ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য গৌরবমণ্ডিত যীশুখ্রীষ্টের কার্যকারী শক্তি, এজন্য খ্রীষ্টমণ্ডলী থেকে, ফলে পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি থেকেও যে নিজেকে বঞ্চিত করে সে মরা অবস্থায় থেকে যায়।

৪:৫—তারা জগৎ থেকে উদ্গত: আদি থেকে তীব্রভাবে নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্টমণ্ডলী সর্বদা বিজয়ী হয়ে থাকেন, এ সকলের কাছে জানা কথা। সুতরাং অনুমান করা যায়, আপাতদৃষ্টিতে খ্রীষ্টবিশ্বাস পরাজিত ও জগৎ বিজয়ী মনে হচ্ছে, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে প্রকৃত সত্যের অভিব্যক্তি হয়। এজন্য বিশ্বাসীর কাছে যোহনের পরামর্শ, সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং খ্রীষ্টবৈরীদের সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী বলে পরিগণিত না করে (যোহন ১৫:১৮ …)। খ্রীষ্টবৈরীরা যীশুর নাম মুখে আনে বটে, কিন্তু আসলে জগতের কথা বলে;

এজন্য যে জগৎ যীশুকে পরিত্যাগ করেছিল সে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। তাদের কাছে মাংসে যীশুর আগমনের চূড়ান্ত সাক্ষ্য সেই ক্রুশ দৈনন্দিন বাস্তবতা নয়, জীবন-যাত্রার লক্ষ্যও নয়।

৪:৬—ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ করে, সে আমাদের শোনে: বিশ্বাসীদের মণ্ডলীই ঈশ্বর থেকে উদ্গত হয় এবং ঈশ্বরের স্বরূপ অনুসারে আত্মপ্রকাশ করে (৪:৬ক), এ নিশ্চয়তা সত্য ও বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করার পর যোহন সত্যময় আত্মা থেকে ভ্রান্তিময় আত্মা নির্ণয় করার দ্বিতীয় বিচারমান ব্যক্ত করেন: যে ঈশ্বর থেকে উদ্গত, তাঁকে জানে ও ঈশ্বরের সঙ্গে এক, সে অবশ্যই প্রেরিতদূতগণ ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের কথা মেনে চলে, অর্থাৎ সে যে-ঈশ্বরকে জানে এবং যে-প্রেরিতদূতকে শোনে তাঁদের মধ্যে খন্ডন দেখে না। বলা বাহুল্য, বর্তমানকালে প্রেরিতদূতগণের ও ভারপ্রাপ্ত প্রচারকগণের কথা মহামান্য পোপ, বিশপগণ ও তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত বাণীপ্রচারকদের কথায় ধ্বনিত হতে থাকে। সুতরাং তাঁরা যে ঈশ্বরকে জানে ও ঈশ্বরের সঙ্গে এক, এর প্রমাণস্বরূপ এঁদেরও কথা মেনে চলে এবং এঁদের সঙ্গে একাত্মতার বন্ধন রক্ষা করে। ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি, যোহনের ধারণায় সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলী পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেক পেয়েছে বিধায় তাঁর দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা পায় (২:২৭): কিন্তু একথা সত্য তারই জন্য, যে নিজেকে খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিগণিত করে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাকে যে প্রেরিতদূতগণের আত্মিক উত্তরসূরীদের সঙ্গে সহভাগিতায় দাঁড় করায়। বস্তুত সত্যময় আত্মা হলেন একতার আত্মা এবং তিনি একই সত্য—অনন্য সত্যরূপে স্বয়ং যীশুকে সমরূপেই প্রকাশ করেন। উপরন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী জানে, ঈশ্বর ইচ্ছামত আত্মপ্রকাশ কনে না বরং আপন আত্মপ্রকাশকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন: যেমন দুর্বল মাংসেই আগত যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন পিতার প্রতিবিম্ব ও উত্তম প্রকাশ, তেমনিভাবে তার সভ্যগণ দুর্বল হলেও মণ্ডলীই এখন হল পিতার প্রতিবিম্ব এবং উত্তম প্রকাশ। খ্রীষ্টমণ্ডলী হল খ্রীষ্টের বর্তমান দেহ, জগতের সামনে তাঁর প্রকৃত সাক্ষী এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সেই জীবন-সহভাগিতা বিতরণকারী (১:৩) যা মাংসে আগমন ক'রে যীশু দান করতে এসেছিলেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর কথা যে শোনে না, সে মুখে খ্রীষ্টকে স্বীকার করা সত্ত্বেও আসলে তাঁকে 'বিলুপ্ত করে', কেননা সেই মণ্ডলীকে বিলুপ্ত করে যাকে মাংসে আপন আগমনে এবং আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থানে যীশু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সুতরাং প্রেরিতদূতগণের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের একতা প্রমাণ করে আমরা সত্যময় আত্মাকে পেয়ে গেছি; বস্তুত তিনিই হলেন ঈশ্বরের আলোকদায়ী ও শক্তিদায়ী শক্তি এবং তাঁর ভূমিকাই হল প্রেরিতদূতগণের সঙ্গে একত্রিত মণ্ডলীকে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা ও ঐশসত্যের প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত করা (৫:৬)। অপর দিকে, প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে সহভাগিতা যে ঈশ্বরেরই সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা (১:৩) এবং আত্মাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ (৪:৬) জগতের এবং ভ্রান্তমতাবলম্বীদের সম্মুখীন খ্রীষ্টমণ্ডলীকে বিশিষ্ট আত্মপরিচয় ও আত্মসচেতনতায় চিহ্নিত করে। তা কিন্তু অতিরঞ্জিত ও বাহ্যিক আনন্দোচ্ছ্বাসের দিকে নয় বরং গভীরতা, ধ্যানমগ্নতা, আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বের দিকেই মণ্ডলীকে চালনা করার কথা: গভীর ধ্যানমগ্নতা হল বিশ্বাসের মর্মের জীবন্ত ও গভীরতর উপলব্ধির নামান্তর (৪:২ ...) এবং ভ্রাতৃত্ব হল জীবনেই প্রতিফলিত সেই বিশ্বাসের ফল। এ থেকে অনুমান করতে পারি, সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করার জন্য যোহনের উপস্থাপিত দু'টো বিচারমান অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে জড়িত এবং পত্রটির মূলশিক্ষার সঙ্গে মিলিত: যীশুখ্রীষ্টের প্রতি, মাংসে তাঁর আগমনের প্রতি ও তাঁর সংবাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে একতায় বজায় রাখা চাই, কারণ এঁরাই যীশুর সকল বাণীর এবং পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি প্রকৃত হস্তান্তরের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; পবিত্র সাক্রামেন্তগুলিই হল সেই প্রকৃত উপায় যা দিয়ে ঐশগৌরবমন্ডিত যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার মাধ্যমে

চিরকালের মত আপন মণ্ডলীকে সঞ্জীবিত করেন। উপরন্তু বিচারমান দু'টো একই মান বলেও পরিগণিত হতে পারে এই অর্থে: প্রথম মান যে লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ কথা ও কাজে প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাস যে অস্বীকার করে, সে আসলে যীশুর দেহ সেই খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ছিন্নভিন্ন করে এবং প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের প্রকৃত উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে সহভাগিতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। একই প্রকারে, দ্বিতীয় মান যে মানে না, অর্থাৎ প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে সহভাগিতা থেকে যে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে সেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য খণ্ডন করে, যার জন্য স্বয়ং যীশু প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭) এবং যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও সঞ্জীবিত রাখার জন্য মাংস হয়েছিলেন, সেই মাংস ক্রুশে উৎসর্গ করেছিলেন এবং পবিত্র আত্মাকে দান করেছিলেন।

এ পর্যায়ে আমরা 'সত্যময় আত্মা' রূপেই সহায়ক পবিত্র আত্মার বিবিধ ভূমিকার সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতে পারি:

ক। তিনি সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন (৫:৬)

খ। তিনি পূর্ণ সত্যের মধ্যে যীশুর শিষ্যদের চালনা করেন (যোহন ১৬:১৩)

গ। ভ্রান্তিময় আত্মা থেকে মণ্ডলীকে পৃথক রাখেন।

স্থানাভাবে এখানে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা স্বীকার্য, খ্রীষ্টমণ্ডলী ও প্রত্যেকজন বিশ্বাসীর পক্ষে পবিত্র আত্মার ভূমিকা সম্বন্ধে অধিক সচেতন হওয়া অপরিহার্য। ফলত পবিত্র আত্মার সম্পর্কীয় তত্ত্ব সম্বন্ধেও অধিক অবগত হওয়া চাই। এবিষয়ে সারফ-এর সেরাফিন নামক একজন সন্ন্যাসী আপন শিষ্যের কাছে একথা লিখেছিলেন:

> 'প্রভুর কাছে জানতে পারলাম, তুমি ছেলেবেলা থেকেই খ্রীষ্টীয় জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হতে ইচ্ছা কর। এমনকি এজন্য বহুবার খ্রীষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অনেকজনের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলে। কিন্তু কেউই তোমাকে একেবারে স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। তাঁরা না কি তোমাকে গির্জায় যেতে, প্রার্থনা করতে, ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি মেনে চলতে, পরোপকারী হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন: এ সবকিছু—তাঁরা বলতেন—খ্রীষ্টীয় জীবনের উদ্দেশ্য। এমনকি কেউ কেউ তোমার এ কৌতূহল নিন্দা করত, অবাস্তব ও ধর্মসঙ্গত নয় কৌতূহল বলে। কিন্তু তাঁরা ভুল করছিলেন। যাই হোক; ক্ষুদ্রতম সন্ন্যাসী হলেও আমি সেই উদ্দেশ্য বাস্তবে যে কী, তা তোমাকে বুঝিয়ে দেব।
>
> প্রার্থনাগুলো, উপবাস, নিশিজাগরণ এবং অন্যান্য ধর্মসম্মত ক্রিয়াগুলি যতই ভাল হোক না কেন, তবুও সেগুলিকে খ্রীষ্টীয় জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণযোগ্য নয়; সেগুলির মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যটি সহজে গ্রহণযোগ্য তা সমর্থন করতে পারি। কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে লাভ করা। প্রার্থনাগুলি, উপবাস, তপস্যা, অর্থদান প্রভৃতি যীশুর নামের খাতিরে সাধিত ভাল ভাল কাজগুলি হল পবিত্র আত্মাকে পাবার জন্য উপায়মাত্র।'

আর একজন সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তি উপস্থাপিত হোক; সন্ন্যাসীর নাম আথোস-এর সিল্ভানুস:

> 'আমার জীবনে প্রথমবারের মত মঠাশ্রমেই আমার অন্তরাত্মা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় প্রভু যীশুকে জানতে পেরেছে। হে প্রভু, তুমি আমাদের কত না ভালবাস। তোমার এ প্রেমের কথা আমি সেই পবিত্র আত্মার কাছ থেকে জানতে পারলাম, যাঁকে তোমার দয়ার খাতিরেই আমাকে দান করা হয়েছে। এখন আমি বৃদ্ধ, মৃত্যু গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং ঈশ্বরের প্রেমের খাতিরে সত্য কথা লিখব।

যাঁকে প্রভু যীশু আমাকে দান করলেন, সেই পবিত্র আত্মার ইচ্ছা হল সকলেই যেন পরিত্রাণ পেয়ে একসঙ্গেই ঈশ্বরকে জানতে পারে। প্রভু যীশু দস্যুর কাছে স্বর্গরাজ্য দান করেছিলেন এবং সকল পাপীকেও স্বর্গধাম দান করবেন। আমার পাপগুলির জন্য আমি ছিলাম কুকুরের চেয়ে জঘন্য, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমার খোঁজ করতে লাগলাম এবং তিনি পাপের ক্ষমা শুধু নয়, পবিত্র আত্মাকেও আমাকে দান করলেন। আর পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ঈশ্বরকে জানতে পারলাম। ঈশ্বরের করুণা কতই না মহান, কে উপযুক্তভাবে তার গুণকীর্তন করতে পারবে? হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের অনুনয় করি: ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এবং সেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে বিশ্বাস কর যিনি আমাদের সকল গির্জায় আর আমার অন্তরাত্মায় ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। যখন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অন্তরাত্মা ঈশ্বরকে জানে, তখন অবিরত এবং প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের করুণা, তাঁর মাহাত্ম্য ও তাঁর পরাক্রমে মুগ্ধ হয়ে থাকে। এবং মাতা যেমন প্রিয় পুত্রের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তেমনিভাবে স্বয়ং প্রভু তাকে নম্র ও পবিত্র চিন্তা শেখাবেন, আপন উপস্থিতি ও সহায়তা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করবেন, এবং এইভাবে নম্র অন্তরাত্মা মানবীয় বুদ্ধি ছেড়ে প্রভুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে। প্রভু মানুষকে ভালবাসেন; ছাই থেকে তাকে গঠন করা সত্ত্বেও তবু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন।

পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ই প্রভুকে জানতে পারি। পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ই প্রভুকে ভালবাসতে পারি। পবিত্র আত্মাহীন ব্যক্তি পাপময় মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। পবিত্র আত্মাই আমাদের প্রভুর আপনজন করেছেন; এবং জেনে রেখ যে, যদি তোমার অন্তরে ঈশ্বরের শান্তি ও সকলের প্রতি ভালবাসা অনুভব কর, তাহলে তোমার অন্তরাত্মা প্রভুরই সমরূপ হয়। মঠাশ্রমে আমি আমার পাপরাশি ছাড়া কিছু নিয়ে আসিনি, আর জানি না কেনই বা প্রভু আমার মত যুবা ব্রহ্মচারীর কাছে পবিত্র আত্মার এত অপরিমেয় অনুগ্রহ দান করলেন যার জন্য আমার অন্তরাত্মা ও শরীর তাতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই অনুগ্রহ ধর্মশহীদ্‌দের অনুগ্রহের মত ছিল এবং আমার সমস্ত শরীর যীশুখ্রীষ্টের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা অনুভব করত।

আমি প্রভুর কাছে পবিত্র আত্মাকে চাইতাম না। পবিত্র আত্মা যে আছেন, তিনি অন্তরাত্মায় কেমন করে প্রবেশ করেন এবং অন্তরাত্মায় উপস্থিত হয়ে কেমন করে কাজ করেন, তাও জানতাম না। এখন এ সম্বন্ধে কিছু শিখেছি বলে আমি অত্যন্ত খুশি।

হে পবিত্র আত্মা, আমার অন্তরাত্মা তোমাকে কতখানি না ভালবাসে!

তোমার সম্বন্ধে কথা বলা আমার সাধ্যের অতীত, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা তোমার আগমন জানে এবং তুমি মনে শান্তি ও হৃদয়ে মাধুর্য দান কর। প্রভু বলেছিলেন, আমার কাছেই নম্রতা ও কোমলতা শিখে নাও আর তোমাদের অন্তরাত্মা বিশ্রামের খোঁজ পাবে। পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ ক'রেই প্রভু সেই কথা বলেছিলেন। শুধু পবিত্র আত্মায়ই অন্তরাত্মা পূর্ণ বিশ্রামের খোঁজ পায়।'

স্থানাভাবে এখানে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করতে পারি না। উপসংহারস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য খ্রীষ্টমণ্ডলীর পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত প্রাচীন একটি বন্দনা উপস্থাপন করা হোক:

পরমাত্মা অনাদি অনন্ত,
পিতা ও পুত্রের সঙ্গে ঐশত্রিত্বের একজন তিনি।
জীবন, জীবনদাতা,
আলো, আলোদাতা,

পরমপবিত্র, পরমপবিত্রতার নির্ঝর।

তাঁর দ্বারা পিতাকে জানি,
তাঁর দ্বারা পুত্রের মহিমা করি গান,
তাঁর দ্বারা বুঝতে পারি ঐশত্রিত্ব একমাত্র শক্তি,
সমমর্যাদায় তিনজন আছেন সমভাবে পূজনীয়।

পরমাত্মা আলো, পরমাত্মা জীবন,
আত্মিক গুণাবলির জীবনময় নির্ঝর,
ঐশজ্ঞান ও জ্ঞানের আত্মা,
মঙ্গলাত্মা ও উপলব্ধির শক্তি,
ধার্মিকতার অগ্রদূত।

তাঁর দ্বারা পাপ থেকে পরিশুদ্ধ আমরা
আর ঐশ্বরিক যেইভাবে তিনি
তাঁর নিজের মত করে তোলেন মোদের।

অগ্নি-সঞ্জাত অগ্নি,
ঐশদানগুলি বিতরণকারী।
তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষ্যদান,
তাঁর দ্বারা প্রেরিতদূতগণের মুকুটলাভ।

আহা, কি চমৎকার সত্য!
আহা, কি চমৎকার দৃশ্য!
অগ্নিবৎ জিভগুলিতে ঐশদানের বিতরণ!

হে স্বর্গীয় রাজন সান্ত্বনাদাতা সত্যময় পরমাত্মা,
সর্ববিদ্যমান সর্বব্যাপী অন্তর্যামী,
আশিসভাণ্ডার জীবনদাতা;

এসো, বাস করো মোদের প্রাণে,
সকল কলঙ্ক থেকে বিশুদ্ধ করো মোদের,
সাধন করো মোদের পরিত্রাণ।

হে মঙ্গলবিধাতা, তোমার গৌরব হোক।

পত্রটির নতুন একটি অংশ পাঠ করার আগে, আসুন, এ পর্যন্ত যোহন যা বলে এসেছেন এর সারসংক্ষেপ উপস্থিত করি। ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীর জীবন-সহভাগিতার শর্ত ও নিশ্চয়তাস্বরূপ হল প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের অধিকার স্বীকার (১:১-৪)। এরপর তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীতে উপস্থিত ভ্রান্তমতাবলম্বীদের পরিচয় দিয়ে (১:৫–২:২৮) তাদের জীবনাচরণ বর্ণনা করলেন (৩:১-২৪) এবং একাধারে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের পরিচয় দিলেন ('তোমরা আলোর ও ঈশ্বরের সন্তান') ও তাদের সদাচরণ আলোচনা করলেন। ৩:২৩-২৪-এ তিনি খুব গভীরে খ্রীষ্টীয় অস্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন: যারা যীশুর প্রতি বিশ্বাসী ঈশ্বর তাদের দিলেন ঐশপরিত্রাণ; ঐশপরিত্রাণপ্রাপ্তির প্রমাণস্বরূপ আছেন সেই পবিত্র আত্মা যিনি খ্রীষ্টানদের নিখুঁত বিশ্বাস-স্বীকারে নিজেকে ব্যক্ত করেন এবং এমন করেন যাতে তারা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসাসুলভ আচরণ পালন করে। পবিত্র আত্মাকে মণ্ডলীর কাছে জাদুশক্তি বলে নয়, বরং খ্রীষ্টের পরিত্রাণদায়ী উপস্থিতির শক্তি বলে দেওয়া হল: এ শক্তিই খ্রীষ্টানদের সদাচরণ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং খ্রীষ্টান সত্যিকারেই প্রকৃত আত্মিক ব্যক্তি—ভ্রান্তমতাবলম্বীদের ধারণা অনুসারে আত্মিক নয়, বরং এ অর্থেই আত্মিক: তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে

মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং ঐশপ্রেমেই সকল ভাইদের ভালবাসে। কিন্তু তবুও, যেহেতু সত্যময় পবিত্র আত্মা ব্যতিরেকে ভ্রান্তিময় আত্মাও রয়েছে এজন্য যোহন আমাদের কাছে নির্ণয়ের মান দু'টো অর্পণ করলেন। যীশুখ্রীষ্টকে কথায় ও কাজে প্রকৃত স্বীকারের মাধ্যমে (৪:২) এবং বিশ্বস্তভাবে প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের কথা শ্রবণের মাধ্যমে (৪:৬) আমরা নিশ্চিত হতে পারি সত্যময় আত্মা আমাদের অন্তরে ক্রিয়াশীলভাবে বিরাজ করেন, তাঁর কাজের গুণে আমরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার মাহাত্ম্য পূর্বাস্বাদন করতে পারি (৩:১) এবং এ পরম নিশ্চয়তাও পোষণ করতে পারি, আমরা একদিন তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে তাঁর সদৃশ হয়ে উঠব (৩:২)।

ঈশ্বর ভালবাসা

(৪:৭–৫:১৩)

ভালবাসার কথা বারবার পত্রটিতে উল্লিখিত হয়েছে (২:৭-১১; ৩:১,১০, ১১-১৭,১৮,২৩)। উল্লিখিত পদগুলি প্রচার করছিল, প্রেমসাধনাই, 'আলো-ঐশলোক' এবং ঘৃণা ও অন্ধকারময় জগতের অধঃলোকের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে। আরও বলছিল, আপনজনদের জন্য যীশুর প্রাণোৎসর্গ থেকেই বিশ্বাসীরা ভালবাসার মর্ম বুঝতে পারে (৩:১৬)। অবশেষে ভালবাসা ও বিশ্বাসের মধ্যকার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল (৩:২৩)। এখন, এ তৃতীয় অংশে, এই সমস্ত কথা এক সূত্র ধরে পুনরালোচনা করা হবে।

ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত এবং বিশ্বাসে স্থাপিত (৪:৭-২১)

ভালবাসা শুধু একটি আজ্ঞা বলে গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়, বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং ভালবাসাস্বরূপ। ভালবাসার অনুগ্রহদান বিতরণ করে ঈশ্বর নিজেকেই দান করেন; ভালবাসা গ্রহণ করে ঈশ্বরত্বে বলবান হয়ে আমরা আলোর পথে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে চলতে পারি। সুতরাং ভালবাসা আমাদের জীবনযাত্রার ঐশপাথেয় বলেই গ্রহণযোগ্য।

৪ ৭ প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
৮ যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।
৯ এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে:
ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন
তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।
১০ আর এতেই ভালবাসার অর্থ:
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,
কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন
এবং আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
১১ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,
তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
১২ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি;
আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি,
তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন
এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।
১৩ এতেই আমরা জানি যে,
আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,
কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।
১৪ আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।
১৫ যে কেউ স্বীকার করে, 'যীশু ঈশ্বরের পুত্র',
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।

১৬ আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
১৭ এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে:
বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,
কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।
১৮ ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
১৯ আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
২০ যদি কেউ বলে,
আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
২১ আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি:
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

৪:৭—এসো, পরস্পরকে ভালবাসি: যোহন অনুসারে সকল আজ্ঞা প্রেমাজ্ঞায়ই কেন্দ্রীভূত ও প্রমাণিত, অর্থাৎ তাঁর ধারণায় ভালবাসারই হল খ্রীষ্টীয় জীবনের মূল এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর আত্মসিদ্ধি। হয়ত কেউ এ আপত্তি উত্থাপন করতে পারে: সকলকে নয়, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেরই মাত্র ভালবাসব কেন? এর উত্তরে একথা যথেষ্ট হোক, সকলকে ভালবাসবার আপত্তি যোহন আদৌ করেন না, এমনকি যখন তিনি যীশুর ভালবাসার আদর্শ বারবার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন তখন এতে প্রমাণিত হয়, যীশুর মত আমরাও সমগ্র জগতের জন্যই প্রাণোৎসর্গ করব। কিন্তু তিনি 'পরস্পর' শব্দের উপর বিশেষ জোর দেন, কারণ ভাল করে জানেন, নিজেদের মধ্যে ভালবাসা না থাকলে তবে বাইরেও প্রকৃত ঐশভালবাসা প্রকাশ করতে পারি না। তখনই আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের কথা নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করি যখন বুঝি যে ঈশ্বরত্বের প্রকৃত গুণ হল প্রেমদান (৩:১)। অর্থাৎ দীক্ষাস্নান গ্রহণে আমরা পবিত্র আত্মার সঙ্গে এমন প্রেমশক্তিও ঈশ্বরের কাছ থেকে পাই যা গুণে পবিত্র জীবন যাপন করতে এবং প্রেম সাধনা করতে সক্ষম হয়ে উঠি। ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত ঠিকই, কিন্তু তাছাড়া ঈশ্বরের 'কর্মক্ষেত্র'ও নির্দেশ করে অর্থাৎ একথা বোঝায় যে, ঈশ্বরের সকল কাজ ভালবাসায় সূচিত কাজ। কাজেই অনুমান করতে পারি, অ-ভালবাসা শয়তানের কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করে। সুতরাং যখন আমরা ভালবাসি তখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে উঠি, বা প্রাচীন মহাচার্য আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্টের কথায়, 'প্রকৃত খ্রীষ্টান ঈশ্বরত্ব চর্চা করে।' উপরন্তু প্রেম সাধনায় আমরা যত অগ্রসর হই ঈশ্বরজ্ঞানে তত জ্ঞানবান হই, অর্থাৎ ত্রিত্বের গভীরতর ঘনিষ্ঠতায় অনুপ্রবিষ্ট হই, তাঁর সঙ্গে অধিকতর প্রত্যক্ষ সংযোগে জীবনযাপন করি এবং স্পষ্টতরভাবে প্রমাণ করি, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

৪:৮ক—যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না: যে প্রেমসাধনা করে না, সে ঈশ্বর থেকে অতি দূরে আছে, সে ঐশআলো, জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রকৃত জীবন থেকেও দূরবর্তী হয়ে আছে। এক কথায়, যে ভালবাসে না সে মৃত্যুতে আছে।

৪:৮খ—কারণ ঈশ্বর ভালবাসা: ঈশ্বর বিষয়ক পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির মত এখানেও যোহন দর্শনবিদ্যা

অনুসারে ভালবাসার স্বরূপ নিরূপণ করতে প্রবৃত্ত নন। প্রেমাজ্ঞা কোথা থেকে আসে, একথাই মাত্র তিনি নির্দেশ করতে চান। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধেও তিনি কোনো সূক্ষ্ম সংজ্ঞা দিতে ব্যাপৃত নন, কারণ তাই যদি হত তবে 'ঈশ্বর ভালবাসা' এবং 'যে কোনো ভালবাসাই ঈশ্বর' একই অর্থ বহন করত; কিন্তু তা হয় না। সুতরাং 'ঈশ্বর ভালবাসা' বাক্যটি মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের কাজ ও মনের তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করতে চায়। বাক্যটি স্থিতিশীল নয়, বরং গতিশীল ও সৃজনশীল: বাক্যটি পাঠ ক'রে আর বসে থাকতে পারি না 'এবার ঈশ্বরকে জানলাম' বিধায়। বসে থাকলে তবে এর মানে হল যে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীনে সঙ্কুচিত করতে চেষ্টা করি। মানবীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করলেও চলবে না, আমাদের মানবীয় বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, ও প্রভৃতি স্নেহবাচক অনুভূতি 'ভালবাসা-ঈশ্বরের' পরিচয় আদৌ দিতে পারে না। প্রাক্তন সন্ধিকালে ঈশ্বরে আরোপিত যত গুণাবলি—যথা বিচারক, শক্তিমান, পবিত্র ইত্যাদি গুণ বাতিল হয়ে যাক, তাঁকে ভালবাসা বলেই মাত্র স্বীকার করব, একথাও সমর্থন করা যায় না। যেমন বলেছি, যোহন স্থিতিশীল এ ধরনের সংজ্ঞাগুলি নিয়ে ব্যাপৃত নন। গতিশীল অর্থে তিনি বলেন, যখন ভ্রাতৃপ্রেম অবহেলা করি তখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হতে পারি না, সুতরাং ঈশ্বরের প্রেমশক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, যাতে আমাদের মধ্য দিয়ে সেই ঐশপ্রেম আমাদের ভাইদের কাছেও গিয়ে পৌঁছতে পারে। প্রকৃত ঈশ্বর-ধ্যান বা ঈশ্বরোপলব্ধি এমন আলো ও ভালবাসার ঐশশক্তিগুলিতে পরিপূর্ণ হওয়ার কথা আমরা যেন ভাইয়ের জন্য আলো ও ভালবাসা হয়ে উঠি। আমাদের ঈশ্বর-ধ্যান-অনুধ্যান যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ অধিক বিশুদ্ধতায় এবং ভাইয়ের কাছে আত্মদানে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, এমনকি তা ঈশ্বরধ্যান নয় বরং আত্মধ্যান হয়ে গেছে। 'ভালবাসা ঈশ্বর'-ধ্যান এমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত, যিনি আত্মদানকারী ঈশ্বর, যিনি আত্মদান করাতে আমাদের কাছেও আত্মদানের শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। 'ভালবাসা-ঈশ্বর' এর প্রকৃত উপলব্ধি আমাদের আত্মোপলব্ধির দিকেই অগ্রসর হয়: যদি ঈশ্বর হলেন ভালবাসাকারীই ঈশ্বর আর আত্মদানেই তিনি আমাদের ভালবাসেন, এবং আমরা যদি তেমন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট আর তাঁর আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত, তাহলে অনুমান করতে পারি মানুষ হিসাবে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ এটি হবে যে, ভালবাসাকারী ঈশ্বরের মত ও তাঁর শক্তিগুণে আমরাও আত্মদান করাতেই ভাইদের ভালবাসব।

পিতা আমাদের পরিত্রাণের জন্য আপন পুত্রকে ক্রুশ-মৃত্যুতে বলিদান করাতে তাঁর অগাধ ভালবাস উত্তমরূপে প্রমাণ করেছেন। এজন্যই কৃতজ্ঞতার খাতিরে আমরা তাঁকে অবশ্যই মনে প্রাণে ভালবাসব। কিন্তু—আগেও একথা উল্লেখ করেছি—সাধারণ মানুষ বলে আমরা উপযুক্ত ও পরিপূর্ণভাবে তাঁকে ভালবাসতে পারি না। তার কারণ, আমরা পাপী এবং অন্যদিকে পবিত্র ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা। প্রতিবেশীকে ভালবাসাতেই আমরা ঈশ্বরকে উপযুক্তভাবে ভালবাসতে পারি, কেননা যীশুর দেওয়া প্রেমাজ্ঞা পালন করে আমরা ঈশ্বরের নিজেরই ভালবাসায় নিজেরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠি, তাঁর মধ্যে থাকি এবং সেই যীশুখ্রীষ্টে রূপান্তরিত ও একীভূত হই যিনিই মাত্র পিতাকে উত্তমরূপে ও পরিপূর্ণভাবে ভালবাসতে সক্ষম: খ্রীষ্টের বাণী পালনে, এমনকি আমরা তাঁর বাণীতে থাকাতে তিনি নিজের সঙ্গে আমাদেরও তুলে নেন এবং আমাদের সঙ্গে পিতাকে ভালবাসেন। সুতরাং যদিও একথা সত্য যে, তখনই সরাসরিভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে সক্ষম হব যখন তাঁর সদৃশ হব এবং তাঁকে দেখতে পাব যেইভাবে তিনি আছেন (৩:২), অর্থাৎ যখন আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা পূর্ণভাবে 'ভালবাসা ঈশ্বরে' রূপান্তরিত হব, তবুও একথাও সত্য যে, এ জীবনকালে থেকেও আমরা তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে অনন্ত-জীবন-যীশুর উপস্থিতিতে এবং তাঁর মনোনীত সন্তান বলে তাঁকে আমরা এক প্রকারে ভালবাসতে পারি। আরও, তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভর করে তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার পরিমাণের উপর, অর্থাৎ তাঁর

মধ্যে থাকার উপর। আর এ জীবন-সহভাগিতা পূর্ণতা লাভ করবে আমাদের মৃত্যুর পরে—সেসময় আমাদের ভালবাসা এবং ঈশ্বরের ভালবাসা পরস্পর এক ও অভিন্ন হবে, কেননা আমরা নিজেরাই 'ভালবাসা ঈশ্বরেরই' দিব্য স্বরূপের সহভাগী হব। সাধু আগস্তিনের ভাষায়—'সেসময় এক যীশু থাকবেন, তিনি নিজেকে ভালবাসবেন,' কারণ আমরা সকলেই তাঁর মধ্যে একীভূত। তবে এ কথাও স্মরণে রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন যে, এ যুগে থেকেই 'ভালবাসা ঈশ্বরের' সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতা অর্থাৎ তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা বাস্তবে ভ্রাতৃপ্রেমে রূপ নেওয়ার কথা। এমনকি আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমই হবে 'ভালবাসা ঈশ্বরে' আমাদের খাঁটি বিশ্বাসের সাক্ষ্যস্বরূপ এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশুতে জগতের প্রতি প্রমাণিত ও বাস্তবায়িত পিতার ভালবাসার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভালবাসারও সাক্ষ্যস্বরূপ।

৪:৯—এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরে ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: পূর্ববর্তী পদটির ব্যাখ্যা যোহনের কথা দ্বারাই সত্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়: অদ্বিতীয় ও প্রিয়তম পুত্রকে দান করাতেই 'ভালবাসা-ঈশ্বর' জগতের প্রতি আপন ভালবাসা প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত করেছেন। যদিও যীশু তাঁর একমাত্র ও প্রিয়তম পুত্র, তিনি জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁকে বলিরূপেই দান করেছেন, ঈশ্বরের ভালবাসা যে কত উদার ও মহান তাতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আপন অলৌকিক পবিত্রতা ও ঐশগৌরবের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেননি, বরং ভালবাসাকারী বলেই তিনি যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে জগতের মধ্যে আলো, সত্য ও ভালবাসা প্রেরণ করলেন, মৃত্যু ও পাপে লিপ্ত মানুষ যেন প্রকৃত জীবন লাভ ক'রে তাঁর সঙ্গে এক হতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষে ঐশভালবাসার বাস্তব অভিব্যক্তি অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। যীশুকে গ্রহণ ক'রে মাংসে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও গ্রহণ করা চাই: আমরা নবজীবনলোকে প্রবেশ করে নবরূপেই—যীশুর আদর্শেই—ভাইদের ভালবাসব। সুতরাং মাংসে যীশুর আগমনের পর খ্রীষ্টবিশ্বাসী আমরা জানতে পেরেছি ভালবাসা বলতে অনুভূতি-ই শুধু নয়, বরং সেই জীবন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা বোঝায় যা অনুসারে যীশুকে গ্রহণ করাতে আত্মদানে-চিহ্নিত ঐশজীবন যাপন করতে সম্মতি জানাই। ঈশ্বরের পুত্ররূপে যীশু হলেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর সমকালীন লোকদের জন্য যেমন করেছিলেন, তেমনি এখনও তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের কাছেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। যেখানে যীশুখ্রীষ্টের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসপূর্ণ স্বীকৃতি প্রকাশ পায়, সেইখানে মাত্র ভালবাসার মর্ম উপলব্ধি করা সাধ্য; অর্থাৎ প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলীতেই ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে, কারণ শুধু খ্রীষ্টমণ্ডলী যীশুসাধিত পরিত্রাণের উপর ভিত্তি ক'রে এজগতে নবরূপেই জীবনযাপন করে (২:২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাইরে প্রকৃত প্রেম নেই, কেননা সেখানে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান, অহঙ্কার অভিমান ভ্রান্তি ও বিরোধিতায় সমাহিত হয় (১:৫ …; ৪:৬; ৩:১৩,১৭)। সুতরাং আপনজনদের কাছে যোহনের পরোক্ষ আহ্বান, তারা যেন প্রকৃত মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং সেই ভ্রান্তমতাবলম্বীদের কথায় কান না দেয়, যারা মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছে।

৪:১০—আর এতেই ভালবাসার অর্থ …: এ পদেও যোহন ঈশ্বরের ভালবাসার মর্ম উদ্ঘাটন করে যান। নিজের একমাত্র পুত্রকেই পিতা ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন। মানুষ হিসাবেও আমরা এ ঘটনার মর্মান্তিক দিক অনুভব করতে পারি: একজন পিতা গভীর প্রেমে তাঁর সকল ছেলেদের ভালবাসেন, কিন্তু যখন তাঁর একটিমাত্র ছেলে থাকে তখন তাকে কত না অনির্বচনীয় স্নেহে ভালবাসেন! সেই একমাত্র ছেলের মধ্যে তাকে নিজেকেই দেখেন, সেই একমাত্র ছেলে ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই পাপী আমাদের প্রেমের খাতিরেই পিতা ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এজগতে প্রেরণ করলেন, এমনকি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলিরূপেই তাঁকে

প্রেরণ করলেন ও মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন। আমাদের পাপ বিনাশকারী পাস্কা-মেষশাবকরূপে যীশু আমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু গ্রহণ করলেন, একথা আমাদের প্রতি যীশুর ভালবাসার প্রমাণ বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পিতারই ভালবাসার প্রমাণ। সুতরাং 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্যের (যোহন ১:১৪) গভীর ও অবিরত ধ্যান-অনুধ্যান থেকেই—আমাদের প্রেমের খাতিরেই পিতা ঈশ্বর তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে আমাদের দান করলেন যিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে আমাদের জীবন বলে নিজ মাংস দান করলেন—ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উদ্ভব হওয়ার কথা, এমন কৃতজ্ঞতা যা যীশুর আদর্শে ও তাঁর শক্তিতে ভ্রাতৃপ্রেমে বাস্তবায়িত হতে হয়। এ পদ সম্বন্ধে সাধু আগস্তিন এ ব্যাখ্যা করেছিলেন: যেহেতু যীশু নিজেই ঈশ্বর, এজন্য ঈশ্বর নিজেকেই বলিদান করেছেন, পিতা যীশুকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে উৎসর্গ করেছেন। কোথায় বা তিনি বলির খোঁজ পেলেন? কোথায় বা তিনি সেই উৎসর্গের উপযুক্ত নিষ্কলঙ্ক বলির খোঁজ পেলেন? তার খোঁজ পাননি নিজের বাইরে, নিজেকেই উৎসর্গ করলেন।

৪:১১—ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন …: যোহন আর একবার জোর দিয়ে বলেন, পুত্রের উত্তম আত্মবলিদানে বাস্তবায়িত ঐশপ্রেম হল গতিশীল ও দায়িত্বজনক একটি বাস্তবতা। অর্থাৎ সেই প্রেমের কথা যে গ্রহণ করে সে যীশুর মত মৃত্যু পর্যন্ত সকলকে ভালবাসতে ও পিতা দ্বারা প্রবর্তিত প্রেমান্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য। খ্রীষ্টবিশ্বাসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা এটিই, তা বাস্তব একটি ঘটনার উপর—মাংসে ঈশ্বরের আগমনের উপরই—প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টান হয়ে আমরা রূপকথার প্রচারক নই, বরং সাক্ষ্য দান করি 'ঈশ্বর মানুষ হলেন যাতে মানুষ ঈশ্বর হয়' (সাধু আথানাসিউস): তাঁর পক্ষ থেকে ঈশ্বর যথাসাধ্য কাজ করে গেছেন, এখন আমাদের প্রমাণ করতে হয় যীশুর মৃত্যু পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছে এবং তাঁর গৌরবায়ন তাঁর নিজের ঐশজীবনে আমাদের পূর্ণ করেছে যাতে আমরাও সেই ঐশজীবন অর্থাৎ ভালবাসা প্রতিবেশীর কাছে দান করি। আমাদের ভালবাসা-আত্মদানই আমাদের বিশ্বাসকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে এবং যুগ যুগ ব্যাপী পবিত্র আত্মার শক্তি গুণে 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্যকে (যোহন ১:১৪) বাস্তব, জীবন্ত ও কার্যকারী করে থাকে।

উপরন্তু এ পদ আর একবার আমাদের স্মরণ করায়, 'ত্রিত্ব' ঐশসত্যের প্রেমপূর্ণ ধ্যান-অনুধ্যান ও তার গভীর উপলব্ধিই আমাদের কাজকর্মের উৎস হওয়ার কথা।

৪:১২—ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি: এ বাক্যটি যেন ১:১৮ পদের কথা ধ্বনিত করে এবং যোহনের সমস্যা নির্দেশ করে: ভ্রান্তমতাবলম্বীরা সমর্থন করত বিশেষ বিশেষ ধরনের ধ্যান-অনুধ্যানের মাধ্যমে তারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন সম্পূর্ণরূপে পেয়ে গেছিল। এজন্য যোহন আপনজনদের কাছে স্মরণ করান, ইহজগতে থাকাকালে মানুষ ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসাক্ষাৎ লাভ করতে পারে না। ঈশ্বরের সঙ্গে একমাত্র সাক্ষাৎ পরোক্ষই সাক্ষাৎ: ভ্রাতৃপ্রেম। আমরা ভাইদের ভালবাসাতে ঈশ্বর নিত্যস্থায়ীভাবে আমাদের অন্তরে থাকেন এবং আমরা প্রমাণ করি আমরা তাঁর প্রকৃত সন্তান। অর্থাৎ ভাইদের ভালবাসাতে আমরা ঈশ্বরের প্রেমজনক জীবনে স্থিতমূল থাকি, আর তাঁর প্রেম সিদ্ধিলাভ করে, কেননা ভাইদের কাছে তাঁর প্রেম দান করি এটিই তাঁর প্রেমের উদ্দেশ্য। এইভাবে আমাদের ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হয়ে ওঠে (২:১৫); পারস্পরিক ভালবাসাই হল সেই পথ যা অনুসরণ করলে ঈশ্বরকেও ভালবাসতে পারি।

১:১৮ পদের কথায় মন আকর্ষণ ক'রে স্মরণ করব, সেখানে ঈশ্বরকে দেখবার একমাত্র উপায় ছিল বিশ্বাসের মাধ্যমে ঐশপ্রকাশবহনকারী যীশুকে গ্রহণ করা। কিন্তু এখানে একমাত্র উপায় হচ্ছে পারস্পরিক ভালবাসা। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যোহন অনুসারে যীশুখ্রীষ্টে প্রকাশিত ঐশপ্রকাশে বিশ্বাস ও পারস্পরিক

ভালবাসা একই বাস্তবতা বলে গ্রহণযোগ্য (এবিষয়ে ৩:২৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য): ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টে ভালবাসা বলেই আত্মপরিচয় দিলেন, এজন্য সেই যীশুতে বিশ্বাস এবং তাঁর দেওয়া প্রেমাজ্ঞা পালনে আমরা ঈশ্বরকে জানি ও ভালবাসি; আর তাতে ঈশ্বরের ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে, কারণ তার নির্ধারিত লক্ষ্য ভেদ করে।

যোহনের মত আগস্তিনও তাঁর শ্রোতাদের সতর্ক করেন তারা যেন ঈশ্বরের আকৃতি সম্বন্ধে অযথা কল্পনা না করে, 'হয় তোমরা সীমাহীন ধরনের কিছুর মত, না হয় পূজনীয় বৃদ্ধের মত তাঁকে কল্পনা করবে। তোমরা কিন্তু এমন কিছু কল্পনা ক'রো না। যদি ঈশ্বরকে দেখতে ইচ্ছা কর, তাহলে প্রকৃত ধারণা তোমাকে দেওয়া আছে: ঈশ্বর ভালবাসা। ভালবাসার কী ধরনের মুখ আছে? কেমন দেখতে? কত উঁচু-লম্বা? পা আর হাত কী রকম? কেউই এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারে না। তথাপি তার পা আছে, যে পা দিয়ে গির্জায় যায়; তার হাত আছে, যে হাত গরিবদের অর্থদান করে, তার চোখ আছে যে চোখ দিয়ে অভাবগ্রস্তকে চেনা যায়, তার কান আছে যে কানের বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, যার বুঝবার কান আছে সে বুঝুক। এ অঙ্গগুলি এদিক ওদিক বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না, কিন্তু যার ঐশপ্রেম আছে সে এক দৃষ্টিতে এসব কিছু ধারণা করতে পারে। সুতরাং তুমি ঐশপ্রেমে স্থিতমূল থাক আর ঐশপ্রেম তোমাতে স্থিতমূল থাকবে।' উপদেশের এই কথায় শ্রোতারা আনন্দোচ্ছ্বাসিত হয়ে চিৎকার করতে ও করতালি করতে লাগল; গির্জায় শান্তি ফিরে এলে পর আগস্তিন আবার বলতে লাগলেন, 'ভ্রাতৃগণ, চোখ দিয়ে যা দেখি না, তা কি কখনও ভালবাসতে পারি? তবে, ঐশপ্রেমের প্রশংসা করতে গেলে কেনই বা তোমরা পায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জয়ধ্বনি কর? আমি তোমাদের কী বা দেখিয়েছি? ঐশপ্রেমের প্রশংসা করা হচ্ছে, এজন্যই তোমরা জয়ধ্বনি তুলে চিৎকার করে উঠলে। চোখ দিয়ে তোমরা অবশ্যই কিছুই দেখছ না। কিন্তু তার প্রশংসা করতে করতে যেভাবে আনন্দ অনুভব কর, সেইভাবে যেন তোমাদের হৃদয়ে তা রক্ষা কর। ভাইয়েরা, আমি যা বলতে চাই তা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ: মহামূল্যবান ধন ব্যবস্থা করো, এ আমার পরামর্শ। তোমাদের সামনে ঐশপ্রেমের প্রশংসা করা হয়েছে; পছন্দ করলে তা নিতে পার। এর জন্য চুরি করা প্রয়োজন নেই, ঐশপ্রেম ত কেনার মত বস্তু নয়। বিনামূল্যেই তা পাওয়া যায়। সেটিকে ধর, আঁকড়েই ধর! সেটার চেয়ে মধুর আর নেই কিছু এজগতে!'

৪:১৩—এতেই আমরা জানি যে …: এ পদ থেকে ২১ পদ পর্যন্ত যোহন সেই একই ধারণাগুলি পুনরাবৃত্তি করেন যা ৪:৭-১২-তে ব্যক্ত করে এসেছিলেন। পদটির প্রথম অংশ যোহনের মূলধারণা নির্দেশ করে: আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে স্থায়ী জীবন-সহভাগিতা লাভ করে গেছি, এ সচেতনতা অধিক পবিত্র জীবন যাপনের জন্য আমাদের প্রেরণাস্বরূপ হোক। কিন্তু যোহনের আসল বক্তব্য এটি: পবিত্র আত্মাই হলেন ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতার প্রমাণস্বরূপ (৪:১৫ এবং ১৬গ দ্রষ্টব্য)। আমরা যদি ঈশ্বরকে জানি, এর কারণ হল যে আমাদের মধ্যে সেই আত্মাই আছেন (যোহন ১৪:১৭) যিনি পূর্ণ সত্যের মধ্যে আমাদের চালনা করেন এবং প্রৈরিতিক বাণীঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রচারিত ঈশ্বরের সাক্ষ্য আমাদের মধ্যে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেন। বস্তুত তিনিই হলেন প্রৈরিতিক সাক্ষ্যদানের প্রেরণাদাতা (৪:১৪), তিনিই সেই সাক্ষ্যদানে স্থাপিত বিশ্বাস স্বীকার করার জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলীকে উদ্দীপিত করেন (৪:১৫) এবং সেই বিশ্বাসের মর্ম উপলব্ধির সামর্থ্য সকল বিশ্বাসীর অন্তরে সৃষ্টি করেন (৪:১৬ক)। অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রেরণাপ্রাপ্ত প্রৈরিতিক সাক্ষীগণের কথা শুনে প্রকৃত খ্রীষ্টানগণ সেই একই আত্মার প্রেরণায় ঈশ্বরের পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে এবং তারা নিজেরা 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে উঠে সেই ঐশসত্যের অবিরত বাস্তবায়ন চালিয়ে যায়। অবশেষে, যিনি তাদের অন্তরে ঐশভালবাসার সিদ্ধি ঘটিয়ে যাচ্ছেন, তারা সেই পবিত্র আত্মার কাছ থেকে এই সান্ত্বনা ও

নিশ্চয়তা পায় যে, এখন থেকেই তারা ঈশ্বরের আপনজন (২:৮), এমনকি ঈশ্বরের মত তারা নিজেরাই আত্মদানকারী ভালবাসা হয়ে উঠেছে।

৪:১৪—আর আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে …: যোহনের ভাষায় 'দেখা' বলতে চোখ দিয়ে দেখা শুধু বোঝায় না। তিনি অবশ্যই প্রভু যীশুকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, অথচ তিনি 'বিশ্বাসের মাধ্যমেই দেখা' অতি-প্রয়োজনীয় বলে সমর্থন করেন: প্রেরিতদূতগণের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের দেখে ও শুনে আমরা বিশ্বাস করি, সেই বারোজন প্রেরিতদূতকে, এমনকি স্বয়ং যীশুকে দেখি ও শুনি অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এধারণা বাতিল করলে তবে খ্রীষ্টবিশ্বাস গল্প-হস্তান্তর ছাড়া আর কিছুই না; অপর পক্ষে বাণী ঘোষণা-ব্যাখ্যা এবং বাণী শ্রবণ-ধ্যান হল ঐশজীবনদান ও ঐশজীবনগ্রহণ। সেকালের মত আজও যা 'দেখা' যায় ও যা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা হয় তা হল পিতার ভালবাসা: তিনি প্রেমের খাতিরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী যত মানুষের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য এজগতে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

ত্রাণকর্তা-যীশুসাধিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফলে তারাও যেন উপকৃত হতে পারে যারা 'সংবাদ' গ্রহণ ক'রে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নিজেদের পাপের কালিমা থেকে পরিশুদ্ধ হতে ইচ্ছা করবে, এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি খ্রীষ্টান বাণীপ্রচার ও জীবনাদর্শ দ্বারা জীবনদায়ী ও পরিত্রাণদায়ী সেই 'সংবাদ' সমাজের সকল স্তরে উপস্থিত করবে। এ বাণীপ্রচার ও জীবনাদর্শ হল প্রত্যেকজন খ্রীষ্টানের ভারী দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমগ্র জগৎ যেন পিতার অসীম ভালবাসা, মৃত্যুর উপর যীশুর বিজয় এবং পবিত্র আত্মার দেওয়া ঐশদত্তকপুত্রত্ব অবগত হয়, এ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনযাপন করা এবং অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করা-ই হল প্রকৃত খ্রীষ্টপ্রেমিকের আকাঙ্ক্ষা।

৪:১৫—যে কেউ স্বীকার করে …: যারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে তারা একথাই স্বীকার করে, যীশু হলেন মাংসে আগত সেই ঐশবাণী যিনি ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁকে ঐশপ্রকাশকারী পুত্র বলে গ্রহণ করা মানে তাঁর ঐশপ্রকাশও গ্রহণ করা। আর তাঁর ঐশপ্রকাশ গ্রহণে আমরা পাই অনন্ত পরিত্রাণ, আর তাঁর সকল বাণী হল আত্মা ও জীবন। তিনি অসত্য কিছুই বলতে পারেন না, কেননা ঈশ্বরের পুত্র বলে তিনি পিতার সঙ্গে অসাধারণ সম্বন্ধে জড়িত: সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি ঐশবাণী বলে পিতামুখী। ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে আমাদের কাছে একমাত্র সম্ভবপর সম্পর্ক হল দৃঢ় বিশ্বাস-সম্পর্ক। আমরা বিশ্বাস করলে তবে স্বয়ং ত্রিত্ব আমাদের অন্তরে বিরাজ করেন, আমাদের সঙ্গে এক হয়ে ওঠেন এবং ঈশ্বরে আমাদের রূপান্তরিত করেন (এ সম্বন্ধে যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'পুত্ররূপে যীশুর আত্মপ্রকাশ' পরিশিষ্ট পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য)।

৪:১৬—আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি: 'জানা' এবং 'বিশ্বাস করা' শব্দ দু'টো 'অটল বিশ্বাস' নির্দেশ করে। যোহনের ভাষায় 'জানা'র অর্থ হল যীশু এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের জীবন্ত ও ব্যক্তিময় একতা স্থাপন করা (যোহন ১০:১৪-১৫; ১৭:৩)। পিতা পুত্রকে এজগতে প্রেরণ করলেন, একথা জেনেছি বলে ঈশ্বরের ভালবাসা জেনেছি শুধু এমন নয়, বরং তাছাড়া যীশুতে বিশ্বাস করাতে 'ভালবাসা-ঈশ্বর' দ্বারা নিজেদের চালিত ও নবীভূত হতে দিয়েছি এজন্যই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা জেনেছি। ঐশভালবাসা দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে আমরা সেই ভালবাসার গতি চালিয়ে যেতে আহূত হচ্ছি, যে গতি পিতা ঈশ্বর আমাদের কাছে পুত্রকে দান করাতে প্রবর্তন করেছিলেন, অর্থাৎ আমরা এমন ফলগুলিতে ফলশালী হতে আহূত যা মানব সমাজের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন ও প্রেম হওয়ার কথা (৩:১৪ …; যোহন ১৫:১৬)।

এখানেও পত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 'যীশুতে বিশ্বাস-স্বীকার' প্রসঙ্গ শুধু প্রকৃত খ্রীষ্টান ও

ভ্রান্তমতাবলম্বীর মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরবার বিষয়বস্তু নয়, ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্যও উপযুক্ত প্রসঙ্গ। যোহন অনুসারে বিশ্বাস ও ভালবাসা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বাস্তবতা: ভালবাসা বলতে অনুভূতি নয়, বাস্তব জীবনাচরণ বোঝায় এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্বীকার করা বলতে শুধু বিশ্বাস-সূত্রগুলি বা ঐশতত্ত্ব জানা নয় বরং বিশ্বাসের দাবিগুলি অনুযায়ী জীবনযাপন করাও বোঝায়। অনিত্য ও মায়াময় জগৎ থেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশিষ্টতা নির্ণয় করার জন্য প্রকৃত বিশ্বাস-স্বীকারও যথেষ্ট নয়, বিশ্বাস ও প্রেম দু'টোই জীবন্ত দেখা চাই। সুতরাং যেহেতু বিশ্বাস ও ভালবাসা হল অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা, এজন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, বিশ্বাসের দিকে আহ্বান হল একাধারে প্রেমাজ্ঞা পালনের দিকে আহ্বান, এবং প্রেমাজ্ঞা পালনের দিকে আহ্বান হল একাধারে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান।

এ ক্ষেত্রে বাণীপ্রচারের দিকটাও লক্ষণীয়। বস্তুত আমরা দেখতে পাই, খ্রীষ্টান নন যাঁরা, তাঁরা ভ্রাতৃপ্রেম উপলব্ধি করেন এবং সেইসঙ্গে তা কামনাও করেন। অথচ এই ভ্রাতৃপ্রেমের উৎস যে ঈশ্বরেরই ভালবাসা, তাঁরা তা জানেন না। সাধারণত তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের ভালবাসা মানবীয় প্রকৃতি ও প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং খ্রীষ্টানদের বাণীপ্রচারমূলক একটি গুরু দায়িত্ব রয়েছে, খ্রীষ্টান নন যাঁরা তাঁরা যেন যীশুর মধ্য দিয়ে জগতের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার শুভসংবাদ আর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে ও যীশুখ্রীষ্টের ভাই বলে আমাদের সর্বদা এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত সমগ্র জগৎ যেন জানতে পারে তার প্রতি পিতা ও যীশুর প্রেম কতই না গভীর! আর উত্তম প্রেমের প্রকাশ ও প্রমাণস্বরূপ যীশুর যে মর্মান্তিক ক্রুশ-মৃত্যু, সেই কথা জেনে সবাই যেন যীশুকে ও পিতাকে ভালবাসতে পারে। এ বাণীপ্রচারমূলক দায়িত্ব যদি পালন করা না হয়, তাহলে এটাই প্রকাশ পাবে যে, আমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাস খাঁটি নয় এবং খ্রীষ্টান নন যাঁরা তাঁদের প্রতি আমাদের প্রেমও অপূর্ণাঙ্গ। আবার, খ্রীষ্টান নন যাঁরা তাঁদের সাধিত ভ্রাতৃপ্রেম দেখে আমরা পরম আনন্দ অনুভব করব, কারণ এতে প্রমাণ পাই যে, ঈশ্বরের ভালবাসা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বিরাজমান ও সক্রিয়। আর 'আলো যীশু' অতীতের মত আজও বিজয়ীরূপে অগ্রসর হচ্ছেন আর অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের উপরই তাঁর এ বিজয় অধিক করে প্রকাশিত করছেন। খ্রীষ্টান নন যাঁরা তাঁদের সাধিত ভ্রাতৃপ্রেমের মাধ্যমে একথাও প্রকাশ পায় যে, জগতের উপর শয়তানের আধিপত্য শেষ হতে চলেছে, এমনকি এ জগৎ সত্যিকারে পিতার ভালবাসার পাত্র (৪:৯-১০; যোহন ৩:১৬) এবং যীশুখ্রীষ্টের পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু দ্বারা সঞ্জীবিত ও প্রভাবিত। ক্রুশের উপর থেকে যীশু সত্যিই সকলকেই আপন বুকে আকর্ষণ করলেন (যোহন ১২:৩২)।

৪:১৭—এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা বৃদ্ধিলাভ করে ···: খ্রীষ্টবিশ্বাস-স্বীকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে যোহন পুনরায় সিদ্ধ প্রেমের ধারণায় ফিরে আসেন (২:৫; ৪:১২): তারা ঐশপরিত্রাণ পেয়ে গেছে, বিশ্বাসীদের এ গভীর সচেতনতা ও নিশ্চয়তায়ই ঐশপ্রেম তাদের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে (২:২৮; ৩:২১; ৫:১৪)। সেকালের ধারণা ছিল ঈশ্বরের বিচারের দিন সন্নিকট, কিন্তু নতুন চেতনাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসী উপলব্ধি করেছে, সেই দিন পরিত্রাণপ্রাপ্তির বা চূড়ান্ত দণ্ডদানের সিদ্ধান্তের দিন নয়, বরং সেই দিন হল তাঁর ভালবাসার পূর্ণপ্রকাশের দিন। আমরা এ জগতে থাকা সত্ত্বেও স্বর্গস্থ যীশুর সহভাগী হয়ে উঠেছি, অর্থাৎ এ জগতে যা করে গেছিলেন তিনি তা এখনও আমাদের জন্য করে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তিনি সকল বিশ্বাসী মানুষের জন্য এখনও প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ ও ভিত্তিস্বরূপ (২:২৯; ৩:৩,৭)। এক কথায়: যদি ঐশপ্রেমে পরস্পরকে ভালবাসি তবে আমরা ঐশপরিত্রাণ পেয়ে গেছি, কারণ এতে প্রমাণ পায়, আমাদের অন্তরে 'ভালবাসা ঈশ্বরকে' গ্রহণ করে আমরা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে উঠেছি; এজন্যই ভাবী কোনো বিচারও ভয় করতে নেই।

৪:১৮—ভালবাসায় কোন ভয় নেই: যাদের মধ্যে ভালবাসা আছে তাদের অন্তরে ভয় থাকে না, একথা স্বাভাবিক ও সোজা কথা। ভালবাসায় একটি ভয় থাকতে পারে আর সেটা হল, যাকে ভালবাসি তার প্রতি উত্তম ও বিশ্বস্তভাবে আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখতে পারি না, বা যাকে ভালবাসি তার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে, যে সত্যিকারে ভালবাসে তার প্রতিটি কাজ প্রেমিকের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয়। লক্ষ্মী মা কি ছেলেমেয়ে ও স্বামীর প্রতি ছাড়া অন্য কিছুতে প্রীত হতে পারেন? আর স্বামী এবং সন্তানেরাও যদি দুর্ভাগ্যবশত একদিন তাঁকে পরিত্যাগ করে, তবে সেই লক্ষ্মী মা তাদের কখনও কি ঘৃণা করতে পারবেন? সেই মা মনে কষ্ট পাবেন বটে, কিন্তু কখনও তাদের ঘৃণা করবেন না বরং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের একান্তভাবে ভালবেসে যাবেন। সুতরাং ভালবাসাই হল সেই জিনিস যা আমাদের জীবনে আনন্দ ও পরম শান্তি সৃষ্টি করে: ভালবাসা না থাকলে আমরা কখনও ভাইয়ের জন্য প্রাণোৎসর্গ করব না, এমনকি ভালবাসা না থাকলে ভাইয়ের প্রতি ক্ষুদ্রতম ধরনের সেবাও অসহ্য বোঝা বোধ হয়। এ সকল কথা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বেলায়ও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য, এজন্য সাধু আগস্তিন এ ধারণাগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'ভালবেস, তারপর যা ইচ্ছা তা-ই কর।' অর্থাৎ আমাদের জীবনে ঐশভালবাসা থাকলে তবে ভালবাসার ফল ছাড়া অন্য ধরনের ফলে ফলশালী হব না।

তবু একথাও স্মরণযোগ্য, ঐশপরিত্রাণে আমাদের সীমাহীন নির্ভর ও আশা মানবীয় অভিজ্ঞতাজনিত ভালবাসা দ্বারা নয় বরং যে প্রেমে ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন সেই প্রেমই উপলব্ধি ও গ্রহণ ক'রে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করার উপরই নির্ভর করে। কাজেই আমরা যদি ইতিমধ্যে আমাদের ঐশপরিত্রাণের সিদ্ধি সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়ে থাকি, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে ঠিক জানি না আমরা পূর্ণভাবে ঐশপরিত্রাণপ্রাপ্ত কিনা, তবে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসায় সচেতন, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিধা না করে ভ্রাতৃপ্রেম পালন করতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

৪:১৯—আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই …: যোহন পুনরায় তাঁর মূলধারণা ব্যক্ত করেন: ঈশ্বরই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন বিধায় আমরা সেই ঐশপ্রেমকে ভিত্তি ক'রে, ধ্যান-অনুধ্যান ক'রে ও হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভাইকে ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠি: যিনি নিজের প্রিয়তম পুত্রকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়াতে প্রমাণ করেছিলেন তিনিই প্রথমে ভালবেসেছেন, এমনকি নিজের ভালবাসা দান করাতে নিজেকেই দান করেছেন, ভ্রাতৃপ্রেম পালনেই আমরা সেই প্রেমময় পিতা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিই।

৪:২০—যদি কেউ বলে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি …: ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা মায়াই মাত্র হয় সেই ভালবাসা যদি তাঁর নিজের ভালবাসায় সহভাগিতা না করে (৪:৮) এবং ফলত ভ্রাতৃসেবায় বাস্তবায়িত না হয়। বস্তুত ঈশ্বরের ইচ্ছা, প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে আমরা যেন তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা ভ্রাতৃপ্রেমেই প্রমাণ করি। এভাবেই প্রকাশ পাবে আমরা সেই ঐশপ্রেমের আন্দোলনের সক্রিয় অংশ, যে ঐশপ্রেম ঈশ্বর দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং যীশুখ্রীষ্টে বাস্তব ও প্রকাশমান হয়ে উঠেছিল।

৪:২১—আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি …: ঐশপ্রেম সম্বন্ধীয় আলোচনার উপসংহারস্বরূপ যোহন আর একবার সেই অদ্বিতীয় আজ্ঞার কথা জোর দিয়ে পুনরুল্লেখ করেন, কেননা সেই আজ্ঞাটিতে অন্যান্য সকল আজ্ঞা একীভূত আছে: আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসায় প্রেমপূর্ণ সাড়া দিতে হলে তবে আমাদের একটিমাত্র পথ আছে: নিজের ভাইকে ভালবাসব। ঈশ্বর যেমন নিজ পুত্রকে দেওয়াতেই আপন ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন, আমরাও তেমনিভাবে নিজেদের দান করাতেই প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের

ভালবাসা প্রকাশ করব। প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ এবং শক্তি হলেন স্বয়ং গৌরবান্বিত যীশুখ্রীষ্ট: তাঁর বাণী ও সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে তিনি এখনও তাঁর ঐশজীবন আমাদের দিয়ে থাকেন, এবং তাঁর ঐশজীবন লাভের অদ্বিতীয় শর্ত হল আমরাও আমাদের নিজেদেরই জীবনকে দান করে সেই ঐশজীবনকে প্রতিবেশীর কাছে দান করব।

ঐশপ্রেম সম্বন্ধীয় এ সকল আহ্বানের পর আমরা অনুমান করতে পারি, ভালবাসাই ছিল যোহনের প্রচারের প্রিয় বিষয়বস্তু। বাস্তবিকপক্ষে সাধু যেরোম লিখেছেন, এফেসসে থাকাকালে বৃদ্ধ যোহন শিষ্যদের সাহায্যে উপাসনাগৃহে গিয়ে পৌঁছে বার্ধক্যের হেতু বেশি দীর্ঘ উপদেশ দিতে না পারলে শুধুমাত্র একথাগুলি অবিরত উচ্চারণ করতেন, 'বৎসেরা, পরস্পরকে ভালবেস।' সবসময় একই কথা শুনে খ্রীষ্টভক্তগণ একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল কেনই বা তিনি শুধু সেই একই কথা মাত্র বলতেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন: 'এটিই প্রভুর আজ্ঞা; এটি মাত্র পালন করলেও তবে যথেষ্ট।' উত্তরটি খুব গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ, এমনকি সাধু আগস্তিনের পূর্বকথিত ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রতিপন্ন করে, 'ভালবেস, তারপর যা ইচ্ছা তা-ই কর।' সত্যিই, যদি আমাদের অন্তরে ঐশপ্রেম স্থিতমূল থাকে আর তা রক্ষা করি তাহলে আমাদের জীবনাচরণ আপনা আপনি ঐশপ্রেমের ফলগুলিতে ফলশালী হবে।

ভালবাসা খ্রীষ্টবিশ্বাসের ফল (৫:১-১৩)

এ নূতন উপদেশের শুরুতে যোহন কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছেন; তিনি বিশ্বাস ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান না: প্রকৃত বিশ্বাসই হল প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেমের পূর্বশর্ত। ইতিপূর্বেও তিনি একথার উপর জোর দিয়েছিলেন, অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভালবাসা অবিচ্ছেদ্য হলেও তবু বিশ্বাসই হল ভালবাসার ভিত্তিস্বরূপ (৩:১৬,২৩; ৪:১৩)। যেখানে বিশ্বাস বিরাজ করে, সেইখানে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সেই জীবন-সহভাগিতা সৃষ্ট হয়, যে সহভাগিতায় ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ পায় এবং যে সহভাগিতা থেকে ঈশ্বরবিরোধী জগৎ বঞ্চিত হয়। কিন্তু একথা বিশেষত লক্ষণীয়: 'যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করা' তাত্ত্বিক ও অবাস্তব অর্থাৎ মুখের বিশ্বাস-স্বীকৃতি বলে নয়, বরং খ্রীষ্টবিশ্বাস পালনে অটল বিশ্বস্ততা বলেই পরিগণিত হওয়া চাই; অর্থাৎ 'যীশুই খ্রীষ্ট' ঘোষণা করার গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে অবিরত সচেতন থাকতে হয় (এবিষয়ে ২:২৯; ৩:৯; ৪:৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৫ [১] যে কেউ বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত;
আর যে কেউ জন্মদাতাকে ভালবাসে, তাঁর কাছ থেকে যে সঞ্জাত,
সে তাকেও ভালবাসে।
[২] এতেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি:
যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
[৩] কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়।
[৪] কারণ ঈশ্বর থেকে যা সঞ্জাত, তা-ই জগৎকে জয় করে।
আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস।
[৫] বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে,
সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র?
[৬] তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট!
শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।
আর আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য।

৭ বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি,
৮ আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক।
৯ মানুষের সাক্ষ্য আমরা যদি গ্রহণ করি,
ঈশ্বরের সাক্ষ্য তবে আরও মহান,
কারণ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এ : তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
১০ ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাসী, সাক্ষ্যটি তার অন্তরে বিদ্যমান ;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসী নয়, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে,
কেননা আপন পুত্রের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর যে সাক্ষ্য দিয়েছেন,
তা সে বিশ্বাস করেনি।
১১ আর সেই সাক্ষ্য এ :
অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন।
১২ পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবন ;
ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি, জীবনকেও সে পায়নি।
১৩ তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামের প্রতি বিশ্বাসী,
আমি তোমাদের কাছে এ সমস্ত লিখেছি
যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।

৫:১—যে কেউ বিশ্বাস করে যে ··· : খ্রীষ্টবিশ্বাসে যে বিশ্বস্ত থাকে সে জানে সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, অর্থাৎ দীক্ষাস্নানের সময়ে গৃহীত দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পবিত্র আত্মা থেকে পাওয়া সেই নবজীবন সম্বন্ধে সে সর্বদাই সচেতন থাকে : দীক্ষাস্নানের সেই নবজীবন গ্রহণেই সে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছে। এ বিশ্বাস এবং অবিরত সচেতনতা থেকেই ভালবাসার ফল ফলায় : ঈশ্বরকে যদি আমার পিতা বলে বিশ্বাস করি তাহলে তাঁকে ভালবাসব এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য সকল সন্তানকেও ভালবাসব। ব্যক্তিবিশেষ বিবিধ গুণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ; সেগুলি যত পবিত্র ও সামঞ্জস্যগতভাবে রাখা হয়, মানুষ তত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ঠিক তাই ঘটে বিশ্বাস ও ভালবাসা ক্ষেত্রেও। আমাদের যত গুণ ও বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরেই কেন্দ্রীভূত রাখলে তবে আমাদের বিশ্বাস নিখুঁত হয়, এমনকি তেমন বিশ্বাস গতিশীল ও সৃজনশীল হবে, বিশেষত ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায়। এ ভ্রাতৃপ্রেমই যীশুখ্রীষ্টের বিশ্বস্ত শিষ্যত্বের প্রমাণস্বরূপ।

৫:২—এতেই আমরা জানতে পারি ··· : ইতিপূর্বেও যেমন বলেছি, এখনও স্মরণ রাখা উচিত, যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস আপনাতেই আমাদের মধ্যে নবজীবন সৃষ্টি করে এমন নয়, বিশ্বাস মন্ত্র বা জাদুর নামান্তর নয় বলে। বরং প্রকৃত বিশ্বাস ভালবাসা এবং যীশুর আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতার ফল দেওয়ার কথা। কিন্তু তবুও এ পদটির সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ থেকে একথা প্রকাশ পায়, যীশুর প্রতি বিশ্বাস রাখলে এবং ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠলে তবে ঈশ্বরের সন্তানদের অর্থাৎ আমাদের এবং সেই ঐশপ্রকাশকর্তা ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরপুত্রের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পর্কটির দু'টো দিক উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, যাঁর ভাই হয়ে উঠেছি ঈশ্বরের সেই পুত্রের সকল বাণী আমাদের মেনে চলতে হবে (অন্য কথায়, যোহন ১৫:১৪ দ্রষ্টব্য) এবং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের পুত্রে ঈশ্বরের সন্তান হওয়াতে আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। এ দাবি দু'টো পূরণ না করলে তবে আমাদের বিশ্বাস অপ্রকৃত, এমনকি সেই সকল শয়তানের বিশ্বাস-অস্বীকৃতিতে পরিণত হয় যারা যীশুকে চিনলেও তাঁকে ভালবাসত না (সাধু আগস্তিন)। সুতরাং প্রকৃত বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশের মাধ্যমে যোহন সমগ্র খ্রীষ্টীয় জীবনের সাংশ্লেষিক একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেন : জনকেশ্বরের ভালবাস, ঈশ্বরসঞ্জাত খ্রীষ্টের ভালবাসা এবং যীশুতে ঈশ্বরসঞ্জাত এই আমাদের সকলের ভালবাসা হল একই অনন্য ভালবাসা : খ্রীষ্টীয় জীবনকে 'ভালবাসা'

ঐশসত্য বলা চলে। খ্রীষ্টকে ভাল না বেসে ঈশ্বরকে ভালবাসা অসম্ভব, বস্তুত ঈশ্বরের ভালবাসার মূর্ত প্রকাশ সেই যীশুকে অস্বীকার করে আমরা পিতাকে কি করে ভালবাসব? ভাইদের ভাল না বেসে পিতা ও যীশুকে ভালবাসাও অসম্ভব, কেননা ঈশ্বরের পুত্র যীশুতে তারা সকলেই রয়েছে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হওয়াতে তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছে।

খ্রীষ্টমন্ডলীকে সেই একই দেহের সঙ্গে তুলনা ক'রে যার মাথা হলেন খ্রীষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল সকল বিশ্বাসী, সাধু আগস্তিন এ পদগুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করেছেন: 'ঈশ্বরের সন্তান কাদের বলে? তারাই ঈশ্বরের সন্তান যারা ঈশ্বরের পুত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যে কেউ ভালবাসে, সে একটি অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং ভালবাসার মাধ্যমে খ্রীষ্টের দেহের ঐক্যের সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করে। আর তখন এমন একমাত্র খ্রীষ্ট থাকবেন যিনি নিজেকেই ভালবাসেন। অঙ্গগুলি পরস্পরকে ভালবাসে এজন্যই দেহটি নিজেকে ভালবাসে। ভালবাসা খন্ড খন্ড করা যায় না। মাথা যদি ভালবাস, তাহলে অঙ্গগুলিও ভালবাসবে। অঙ্গগুলি না ভালবাসলে, তবে মাথাও ভালবাসবে না। অঙ্গগুলির হয়ে যখন মাথা একথা বলেন: 'সৌল, সৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ' (শিষ্য ৯:৪) তখন তুমি কি ভয় পাও না? সেই কণ্ঠস্বর নিজের অঙ্গগুলির নির্যাতনকারীকে নিজেরই নির্যাতনকারী বলেছে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছ, কারা যীশুর অঙ্গগুলি: ঈশ্বরের স্বয়ং মন্ডলীই যীশুর অঙ্গগুলি। সুতরাং, তাঁর দেহ কোথায় সমাহিত আছে? তাঁর অঙ্গগুলি কোথায় যন্ত্রণা ভোগ করছে? যদি খ্রীষ্টকে ভালবাসতে চাও তাহলে জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্তই তোমার ভালবাসা বিস্তারিত কর, কারণ খ্রীষ্টের অঙ্গগুলি সমগ্র জগদ্ব্যাপীই ছড়িয়ে পড়েছে। একটি অঙ্গ মাত্র যদি ভালবাস, তবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ; দেহের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তবে মাথার অধীনেই নও তুমি! সুতরাং তোমার পক্ষে বিশ্বাসের কিসের প্রয়োজন যদি খ্রীষ্টনিন্দা কর? মাথারূপে যীশুকে পূজা করছ এবং তাঁর দেহের অঙ্গগুলির সম্মান না ক'রে তাঁকে নিন্দা করছ। তুমি যদি তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাক, তাহলে মনে রেখ, সেই দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়নি। উপর থেকে মাথা চিৎকার করে তোমাকে বলে, আমার প্রতি তোমার সম্মান অনর্থক। ধর, একজন তোমার মাথা চুম্বন করতে চায়, কিন্তু তোমার পা মাড়াতেও চায়। একজন যদি তোমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে করতে লোহার বুট দিয়ে তোমার পা দু'টো মাড়াত, তাহলে তুমি কি তার সম্মানপ্রদর্শনের মাঝে তাকে বলতে না, ইস্, কী করছ ভাই। আমার পা মাড়াচ্ছ, তা দেখতে পাচ্ছ না? থামো! অবশ্যই তুমি তাকে বলবে না, আমার মাথা মাড়াচ্ছ, কেননা আসলে সে তোমার মাথার প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। (...) বরং সঙ্গে সঙ্গে মাথা বলবে, তোমার এ সম্মান আমার দরকার নেই; কমপক্ষে আগে আমাকে মাড়াবে না। আর তুমি আবার নিজেকে রক্ষা করে আমাকে বল, কি, আমি তোমাকে মাড়াচ্ছি? না! আমি তোমাকে চুম্বন করতে, আলিঙ্গন করতে চাচ্ছিলাম! হে মূর্খ! সত্যিই কি তুমি বুঝতে পার না যে, দেহ-সংগঠনের ভিত্তিতে, যে অঙ্গ তুমি আলিঙ্গন করতে চাও, সে সেই অঙ্গের সঙ্গেই এক যা তুমি মাড়াচ্ছ? উপরে তুমি আমাকে সম্মান করছ, নিচে আমাকে অপমান করছ।'

৫:৩—কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ ...: তাঁর সকল আজ্ঞাগুলি পালনে, অর্থাৎ তাঁর সন্তানোচিত আচরণে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ পাবে। তাঁর আজ্ঞাগুলি যে দুর্বহ হয়, তা আমাদের ভালবাসার গভীরতার উপরই নির্ভর করে। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস বলতেন, 'এতই মঙ্গল প্রত্যাশা করি যে যত কষ্ট সুখ মনে করি।' উপরন্তু, পলের মতে সবকিছু এ ধারণার উপর নির্ভর করে যে, ঈশ্বর সাধ্যের অতীত পরীক্ষায় আমাদের পরীক্ষিত করেন না। এমনকি অতিরিক্ত কষ্টের জন্য অনুযোগকারী পলের কাছে তিনি বলেছিলেন, 'আমার অনুগ্রহ তোমার কাছে যথেষ্ট।' অবশেষে একথাও স্মরণযোগ্য: তাঁর সাহায্য না চেয়ে একাই আমরা সেগুলি বহন

করতে চাই বিধায় অনেক বার ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি আমাদের পক্ষে দুর্বহ। সন্ন্যাসী আন্তনির জীবনীতে সাধু আথানাসিউস অবিরত বলেন, আন্তনি নিজের দুর্বলতা বিষয়ে নিত্যসচেতন হয়ে যীশুর উপর নিত্যনির্ভরশীল ছিলেন, ফলে যীশু স্বয়ং সব দিক দিয়ে আন্তনির মধ্য দিয়ে আশ্চর্য কাজ সাধন করতেন।

৫:৪—কারণ ঈশ্বর থেকে যা সঞ্জাত ··· : আপন পদ্ধতি অনুসারে যোহন এবারও নিজের বিশ্বাসীদের কাছে তাদের বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেন: আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এ সচেতনতাই জগৎ-বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত যাঁর গুণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি, সেই যীশুখ্রীষ্টই নিজের ক্রুশ-মৃত্যু দ্বারা শয়তানকে পরাস্ত করেছেন। যেমন অনন্ত জীবন, ঐশদত্তকপুত্রত্ব, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদি ঐশদানগুলি বর্তমানকালেরই বাস্তবতা, তেমনিভাবে ইতিমধ্যেই আমরা জগৎ-বিজয়ী হয়ে উঠেছি: আর এজন্যই খ্রীষ্টবিশ্বাস সুন্দর ও মনোরম। এ সবকিছু যীশুতে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তবুও এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেন অন্যায়-আত্মনির্ভরশীল না হই: যীশুখ্রীষ্ট শয়তানকে জয় করেছেন ঠিকই, কিন্তু যীশুতে বিশ্বাস ছাড়া আমাদের বিজয় সহায়ক পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সংযোগের উপরেও নির্ভর করে; বস্তুত, জগৎ অভিযুক্ত ও বিচারিত করার জন্যই যীশু সেই সহায়ককে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছিলেন (যোহন ১৬:৮)। এ জগতে সংগ্রাম করতেই হয়, এ জানা কথা, এমনকি যীশু নিজে চান আমরা জগতে থাকব (যোহন ১৭:১৫), তবু যেন সাহস না হারাই, কারণ খ্রীষ্ট ইতিমধ্যে জগৎকে জয় করেছেন (যোহন ১৬:৩৩) এবং তাঁর সেই বিজয় তাঁর খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাধিত বিজয়ে এখনও প্রসারিত হতে চলছে (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'বিশ্বাস' পরিশিষ্ট পৃঃ ৯৪ দ্রষ্টব্য)।

৫:৫— (···) যীশু ঈশ্বরের পুত্র: 'ঈশ্বরের পুত্র সেই যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা' হল যোহনের ঐশতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাগুলির অন্যতম। অবশ্যই স্বীকার করব, যীশুই হলেন জগতের পরিত্রাণকারী প্রত্যাশিত মসীহ, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে 'পিতার অদ্বিতীয় পুত্ররূপে' মাংসে আগত ঐশবাণীর অনন্য মর্যাদার রহস্যও সর্বাপেক্ষা গ্রহণ করব, যে রহস্য চতুর্থ সুসমাচারে প্রাধান্য লাভ করেছে (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'পুত্ররূপে যীশুর আত্মপ্রকাশ' পরিশিষ্ট পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য)।

৫:৬—তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: এ পদের অর্থ এরূপ: যাঁকে আমরা ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি, তিনি হলেন সেই নাজারেথীয় যীশু যিনি যর্দন নদীতে দীক্ষিত ও গলগথা পর্বতে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। একথা স্বীকার ক'রে সম্ভবত যোহন আপন বিশ্বাসীদের সেই সকল ভ্রান্তমতাবলম্বীদের কাছ থেকে রক্ষা করতে অভিপ্রেত ছিলেন, যারা বলত, পবিত্র আত্মা দীক্ষাস্নানের সময়ে যীশুর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়ে চলে গেছিলেন: কাজেই মানবেশ্বর যীশুখ্রীষ্ট নন, বরং সাধারণ এজন্য মানুষমাত্র ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু যারা এ ধারণা সমর্থন করে তারা যীশুকে, মাংসে তাঁর আগমন ও তেমন আগমনসাধিত বাস্তবতা—যথা ঈশ্বরে মানুষে পুনর্মিলন, ঈশ্বরের ক্রুশবিদ্ধ পুত্রের মৃত্যুসাধিত পাপক্ষমা অর্থাৎ পরিত্রাণ বলতে যা কিছু বোঝায় সেই সব বিলুপ্ত করে। যোহন দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কিত শিক্ষা দেন: যিনি যর্দন নদীতে দীক্ষাস্নানের সময়ে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষিত হয়েছিলেন (যোহন ১:৩৪), সেই যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্ররূপেই ক্রুশে মৃত্যুবরণ করাতে সমগ্র জগতের পরিত্রাণ সাধন করলেন (যোহন ১:১৯; ১৯:৩৩-৩৫; ১ যোহন ১:৭; ২:২; ৪:১০)। যীশুর দীক্ষাস্নান ও তাঁর আত্মবলিদান: এ ঘটনা দু'টো হল যীশুর জীবনের ও খ্রীষ্টবিশ্বাসেরও প্রধান ঘটনা। যোহনের বিশ্বাস-সূত্রের বিরুদ্ধে অন্য ভ্রান্তমতাবলম্বীরা বিশেষত যীশুর রক্তে অর্থাৎ তাঁর ক্রুশ-মৃত্যুকেই বিশ্বাস করত না, এজন্য পদের

দ্বিতীয় অংশে যোহন যীশুর রক্ত জোর দিয়ে পুনরুল্লেখ করেন। ভ্রান্তমতাবলম্বীদের মত ক্ষুণ্ন করা ছাড়া পদটির উদ্দেশ্য হল যাতে প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা অধিক সচেতন হয় যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিক পরিত্রাণদায়ী ক্রিয়া-ঘটনাগুলি—বিশেষত তাঁর দীক্ষাস্নান ও আত্মবলিদান—আজও খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বর্তমান। অর্থাৎ আমরা যেন দৃঢ় বিশ্বাস করি, 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্য (যোহন ১:১৪) হল এমন রহস্যময় ঐশক্রিয়া যা খ্রীষ্টমণ্ডলীতে এখনও এবং যুগ যুগান্তরে বাস্তব ও ঘটমান থাকবে। এ ধারণা ৭ম ও ৮ম পদগুলিতে আরও স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হবে। আপাতত (৫:৬গ) যোহন তাঁর ঘোষিত ধারণার সাক্ষীরূপে পবিত্র আত্মাকেই উল্লেখ করেন: পবিত্র আত্মাই হলেন প্রকৃত সাক্ষী, কেননা তিনি নিজেই হলেন ঐশসত্য অর্থাৎ ঐশবাস্তবতার অভিব্যক্তি (যোহন সুসমাচারে 'সহায়ক' পবিত্র আত্মার কথা স্মরণীয়: ১৪:১৬ অধ্যায়)। উপরন্তু স্বয়ং তিনি ঈশ্বরের সেই আলো ও প্রেরণাদানকারী শক্তিস্বরূপ যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা ও ঐশসত্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে নিশ্চিত করেন এবং সেই প্রেমের কাজের প্রেরণা ও সাক্ষ্য দান করেন যা স্বয়ং যীশু তাঁর বিশ্বাসীমণ্ডলীর মাঝে উপস্থিত হয়ে আজও সম্পাদন করে যান (যোহন ১৪:১৭)। পবিত্র আত্মার এ অপূর্ব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি, মাংসে আগত সেই নাজারেথীয় যীশু সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র।

৫:৭—**বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি:** পূর্ববর্তী পদটিতে যে বিষয়ের আভাস দেওয়া হয়েছিল, এখন জল ও রক্তের সেই সাক্রামেন্তগত তাৎপর্যও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়। বস্তুত পবিত্র সাক্রামেন্তগুলির ভূমিকা ঠিক এটি: সেগুলি পবিত্র আত্মার প্রভাবে যীশুসাধিত যত ঐতিহাসিক পরিত্রাণদায়ী ক্রিয়াসমূহ আজও সক্রিয়, জীবন্ত ও ফলশালী রাখে, অর্থাৎ সেগুলির মাধ্যমে 'বাণী হলেন মাংস' ঐশসত্য (যোহন ১:১৪) যুগ যুগ ব্যাপী বাস্তব ও ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। যীশুর ঐতিহাসিক পরিত্রাণদায়ী ক্রিয়াকর্ম, অর্থাৎ মাংসে আগত খ্রীষ্টের সাধিত পরিত্রাণকর্ম আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে ঠিক দীক্ষাস্নাননির্দেশক 'জল' এবং খ্রীষ্টপ্রসাদসূচক 'রক্তের' মধ্য দিয়ে। দীক্ষাস্নান ও খ্রীষ্টপ্রসাদ উভয় সাক্রামেন্ত হল এমন জীবন্ত ও সত্যিকারে ঐশক্রিয়াশীল চিহ্ন যেগুলি গ্রহণে বিশ্বাসী খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একতাপ্রাপ্ত হয়। দীক্ষাস্নানের সাক্ষ্য পবিত্র আত্মাকেই নির্দেশ করে: তাঁর দ্বারাই আমরা নবজীবনে সঞ্জাত এবং ঈশ্বরের সন্তানে রূপান্তরিত হই। খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্ষ্যদান করে খ্রীষ্টের ক্রুশই হল নিত্যস্থায়ী ও অনতিক্রমণীয় পরিত্রাণের উৎস, এমনকি খ্রীষ্টপ্রসাদ দ্বারা মাংসে যীশুর আগমনেরই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা হয়, যে আগমনের শীর্ষক্ষণ হল যীশুর আত্মোৎসর্গ। বিশ্বাসীমণ্ডলীর কাছে যীশুসাধিত পরিত্রাণ দান করাতে উল্লিখিত সাক্রামেন্ত দু'টো (পবিত্র আত্মার সঙ্গে) সাক্ষ্যদান করে ঐতিহাসিক যীশু সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। একই অর্থ যোহন ১৯:৩৪খ–৩৫-এ পরিলক্ষিত হয়: যীশুর বিদ্ধ বুক থেকে জল ও রক্ত নিঃসৃত হল এবং স্বচক্ষে যিনি দেখেছেন, তিনিই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর কথা সত্যাশ্রয়ী (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ১৯:৩১-৩৭ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

জল ও রক্তের সাক্ষ্যদানের সঙ্গে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদানও উল্লিখিত; সেই বিষয়ে ৫:৬গ-এ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এ পর্যায়ে এ সাংশ্লেষিক কথা বলা যথেষ্ট হোক, পবিত্র আত্মাই সেই ঐশজীবনশক্তি যা দ্বারা সাক্রামেন্তগুলি ঐশশক্তি গ্রহণ করে।

ভ্রান্তমতাবলম্বীদের মত যারা যীশুতে বিশ্বাস ঘোষণা সত্ত্বেও সাক্রামেন্তগুলি না গ্রহণ ক'রে তাঁর দ্বারা নিজেদের সঞ্জীবিত হতে না দেয়, তারা 'খ্রীষ্টকে বিলুপ্ত করে' এবং তাদের বিশ্বাস-ঘোষণা মিথ্যামাত্র।

সুতরাং আত্মা (পবিত্র আত্মা, নবজীবন ও সাক্রামেন্তপ্রতিষ্ঠা), জল (ঐশদত্তকপুত্রত্ব ও দীক্ষাস্নান) এবং রক্ত (যীশুর পরিত্রাণদায়ী আত্মোৎসর্গ ও খ্রীষ্টপ্রসাদ) একই সাক্ষ্য দান করে: সত্যিই নাজারেথীয় যীশু হলেন ঈশ্বরের

পুত্র, ফলত জগতের ত্রাণকর্তা।

*　　　　*　　　　*

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী থেকে নানা লাতিন পুঁথিতে ৭ম ও ৮ম পদের পাঠান্তরে পাওয়া যায়: 'কাজেই স্বর্গে সাক্ষী আছেন তিনটি: পিতা, বাণী ও পবিত্র আত্মা, এবং এই তিনটি এক; পৃথিবীতেও সাক্ষী আছে তিনটি:: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এই তিনটি এক।' এ পাঠ সম্ভবত ব্যাখ্যারূপেই লিখিত হয়েছিল এবং অনেক দিন ধরে প্রামাণিক পাঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তবুও বর্তমানে সকলের মত যে এ উদ্ধৃতাংশ শাস্ত্রের প্রকৃত অংশ নয়।

*　　　　*　　　　*

৫:৯—মানুষের সাক্ষ্য আমরা যদি গ্রহণ করি ⋯: চতুর্থ সুসমাচারেও আলোচিত 'যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান' (যোহন ৫:৩৫) এখানেও পুনরুল্লেখ করা হয়। প্রধান সাক্ষীরূপে পিতাই উল্লিখিত: যীশু তাঁর পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্তা, একথা যে সত্য এর ভারপ্রাপ্ত সাক্ষীরূপে তিনিই দাঁড়ান। সুতরাং পিতার সাক্ষ্যদানের বলে পুত্রের সকল বাণী হল সত্য এবং অনন্ত জীবন দানকারী বাণী (৫:১১,১৪ দ্রষ্টব্য)। অধিকন্তু তেমন সাক্ষ্যদান প্রৈরিতিক প্রচারে উপস্থিত আছে, এজন্য বিশ্বাসী মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান ও সহভাগিতা যে গ্রহণ করে সে ঈশ্বরের সাক্ষ্যদান ও জীবন-সহভাগিতাও গ্রহণ করে (১:১-৩)।

৫:১০—ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাসী ⋯: আপন বিশ্বাসে অটল ও নিশ্চিত হবার জন্য প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে বাহ্যিক ধরনের প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরের পুত্র সেই যীশুর প্রতি তার দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস আপনা থেকেই গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যদান হয়ে ওঠে, কারণ বিশ্বাসীর কাছে দেখায়, সে ঈশ্বরের আপনজন এবং তাঁর আত্মার সহভাগী হয়ে উঠেছে (৪:২,১৫; ৫:১)। ঈশ্বর যেমন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অন্তরে বিরাজমান আছেন, তেমনি বিশ্বাসীর অন্তরে সেই সাক্ষ্যদানও সতত বিরাজ করে (৩:২৪; ৪:১৩)। বিশ্বাসীর পক্ষে সাক্ষ্যপ্রাপ্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতালাভের প্রমাণস্বরূপ হল খ্রীষ্টপ্রচারকারী প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের শ্রবণ এবং তাঁদের সঙ্গে সহভাগিতা। প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের শ্রবণ এবং তাঁদের সঙ্গে সহভাগিতা থেকে যে বিচ্ছিন্ন থাকে, সে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে: খ্রীষ্টকে যে অগ্রাহ্য করে সে ঈশ্বরকে স্বীকার করতে পারে না, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করার জন্য যীশুকে প্রেরণ করেছিলেন এবং এখনও তিনি সাক্ষ্যদান করে থাকেন, যীশু যা বলেছেন তা সত্য।

ঈশ্বরের সাক্ষ্যদান কোথায় পাওয়া যায়? এখানে অবশ্যই মরমিয়া কথা বা অসাধারণ ও দিব্য দর্শনলাভের কথার মত কিছুই বলা হচ্ছে না। প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাণী ঘোষণা ও ব্যাখ্যা শ্রবণ, সেই বাণী গভীর ধ্যান-অনুধ্যান এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা গ্রহণ-ই হল বিশ্বাসীর অন্তরে ঈশ্বরের সাক্ষ্যদানের উপস্থিতি অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার প্রমাণ। স্মরণযোগ্য যে, সাক্রামেন্তগুলিও যীশুর বাণীতে কেন্দ্রীভূত; সুতরাং ঐশবাণী যে সাক্রামেন্তগুলিকে প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাদের দান করতে চায়, সেগুলি যে গ্রহণ করে না, সে ঐশবাণীকেও আদৌ মেনে চলে না।

৫:১১—আর সেই সাক্ষ্য এ ⋯: অনন্ত জীবনই হল সেই ঐশপরিত্রাণ যা যীশু ক্রুশ-মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের জন্য অর্জন করলেন। বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা এ বর্তমানকাল থেকেই সেই ঐশপরিত্রাণ লাভ করি এবং সেই ঐশজীবনে সঞ্জীবিত আছি। স্বয়ং ঈশ্বর সেই ঐশপরিত্রাণ বা অনন্ত জীবন আমাদের দান করলেন, এজন্য আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি (৩:১৪)। অনন্ত জীবন হল খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছে ঈশ্বরের সাক্ষ্যের

প্রমাণ, তা প্রেরিতদূতগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের কথায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়: ঈশ্বরের যে সাক্ষ্য তাঁরা নাজারেথীয় যীশুতে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে সকলের কাছে হস্তান্তরিত করে এসেছেন, সেই সাক্ষ্য তাঁদের মন জয় করা ব্যতীত তাঁদের ঐশপরিত্রাণও সাধন করেছিল। সুতরাং তাঁদের প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাস-স্বীকারের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরকে (২:২৩) ও তাঁর সাক্ষ্য পেয়েছেন (৫:১০), এমনকি পুত্রকে এবং অনন্ত জীবনও পেয়েছেন। পরিত্রাণপ্রাপ্তি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছিল তাঁদের বিশ্বাসের বলে; তারা বিশ্বাস করেছিলেন যীশুই সেই খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র যিনি ঈশ্বরের সাক্ষ্যদানে এবং বর্তমানকালে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা ও পবিত্র সাক্রামেন্তগুলির সাক্ষ্যদানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এ বিশ্বাসের বলে তাঁরা জগৎ-বিজয়ী হয়ে উঠেছেন এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বাস্তবায়িত বিশ্বাস ও সদাচরণের মাধ্যমে ভ্রান্তমতাবলম্বীদেরও পরাজিত করেছেন। সুতরাং যে বিশ্বাসী অর্থাৎ জীবন-সহভাগিতায় তাঁর সঙ্গে যে সংযুক্ত, তার কাছে যীশু ঐশপরিত্রাণ-দিশারী শুধু নন, তিনি নিজেই পরিত্রাণের স্থানস্বরূপ: একথা দ্বারা পুত্র এবং আমাদের জীবনের মধ্যকার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধের ঐক্য নির্দেশ করতে চাইলাম। পুত্রের মাধ্যমে পিতার দেওয়া যে ঐশজীবন আমরা পেয়েছি, সেটি-ই পিতা ও পুত্রের সঙ্গে আমাদের জীবন-সহভাগিতা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যীশু হলেন সেই একমাত্র মধ্যস্থ যাঁর দ্বারা আমরা পিতার সঙ্গে সংযুক্ত (যোহন ১৭:২০): পিতার সঙ্গে যীশু এক বলে, আমরা যদি পুত্রের সঙ্গে এক হয়ে উঠি তাহলে তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা পিতার সঙ্গে এক হয়ে উঠব।

৫:১২—পুত্রকে যে পেয়েছে ...: অধিকতর গভীরভাবে যোহন পুনরায় আমাদের স্মরণ করান, খ্রীষ্টবিশ্বাস একটি ধারণা বা একটি ধর্মীয় মত নয় বরং ব্যক্তিময় জীবনসম্পর্ক: ঐশজীবন লাভ করতে হলে আমাদের যীশুকেই আপন করতে হয়, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে উঠতে হয়। পত্রটি শেষে যোহন আরও স্পষ্টভাবে বলবেন, যীশু নিজেই হলেন অনন্ত জীবন (৫:২০)।

এই সকল কথার মাধ্যমে যোহন পত্রটির প্রারম্ভিক পদগুলির একই কথায় ফিরে এলেন: জীবন-বাণীর সংবাদ একটি কাল্পনিক ধারণা নয় বরং জীবন্ত সাক্ষ্যদানই হওয়ার কথা; উপরন্তু তিনি পত্রের গ্রাহকদের আহ্বান করেছিলেন তারা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন প্রচারকগণের সহভাগিতায় সম্পূর্ণরূপে সহভাগী হয়। পত্রটির সূত্র অনুসরণ করে এখন আমরা একথাও জেনেছি: প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সাক্ষীগণের সংবাদ-ঘোষণা ঈশ্বরের দেওয়া যীশুখ্রীষ্ট-বিষয়ক সাক্ষ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিকই বন্ধনেও জড়িত বলে, যুগ যুগান্তরে যারা সেই সাক্ষীগণের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের কথা শুনবে তারা স্বয়ং ঈশ্বরের কথা শুনবে। এ বন্ধনের সচেতনতাই যীশুর কাল থেকে দূরবর্তী খ্রীষ্টমণ্ডলী আপন বিশ্বাস ও জীবনে বলবান ও সজীব অর্থাৎ যীশুরই সঙ্গে জড়িত করে তুলেছে। সুতরাং পত্রটি সকল পরামর্শ ও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ভ্রান্তমতাবলম্বীদের হাত থেকে রক্ষা করা নয়, বরং—যেমন বার বার বলেছি—সমগ্র পত্রটি বারবার যোহন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আত্মপরিচয় বা আত্মসচেতনতা অধিক দৃঢ় করতে অভিপ্রেত হলেন। ঈশ্বর বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা যীশুর মাধ্যমে পেয়েছি, তা সতর্কভাবে যাপিত জীবনে পরিণত করার কথা। অন্য কথায়, পত্রটির মধ্য দিয়ে যোহন দেখাতে চান, সাক্ষীগণের ও সংবাদ-প্রচারকগণের সঙ্গে সহভাগিতা রাখলে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা (১:১-৩) এবং অনন্ত জীবনও প্রাপ্ত হয় (৫:১১-১২)।

অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি: চিরকালের মত খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐশপরিত্রাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিষ্ঠিত:

– যীশুখ্রীষ্টসাধিত ক্রিয়াকলাপ, এমনকি স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট।

– ঈশ্বরের সাক্ষ্যদান—যা দ্বারা যীশু তাঁর পুত্র বলে প্রচারিত হন।

– সেকালের সাক্ষীগণের ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সংবাদ-ঘোষণা।

– উক্ত সংবাদ-ঘোষণায় খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের সাড়া—এমন সাড়া যা পবিত্র আত্মা দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

– খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভ্রাতৃপ্রেম—যীশুর আজ্ঞা অনুসারে ও 'ভালবাসা-ঈশ্বর' অনুরূপ ভ্রাতৃপ্রেম।

৫:১৩— (…) আমি তোমাদের কাছে এ সমস্ত লিখেছি: এ পদের আহ্বান ব্যক্তিগতভাবে এক একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে লক্ষ করে: প্রতিটি খ্রীষ্টান নিজের অন্তরে জ্ঞান ও সচেতনতা জীবন্ত রাখুক সে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একতায় মিলিত এবং তাঁর দ্বারা নিত্য সঞ্জীবিত। যোহন জানেন আমাদের বিশ্বাস আছে, তবু 'ঈশ্বরের পুত্রের নামের প্রতি বিশ্বাসীর' বৈশিষ্ট্য স্মরণ করান: যীশুকে আত্মপ্রকাশকারী ঐশব্যক্তিরূপেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। এমন বিশ্বাস দরকার যা ঐতিহাসিক ত্রাণকর্তা সেই নাজারেথীয় যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর উপর নির্ভর করে ৯ (যোহন ১:১৩; ২:২৩; ৩:১৮, ইত্যাদি)। যারা নিজেদের উপর নির্ভর ক'রে পরিত্রাণ পাবার সামর্থ্য সমর্থন ক'রে আপন বিশ্বাসের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে নিরীহ ছিল, ফলত পবিত্র সাক্রামেন্তগুলিও নিষ্প্রয়োজন বলে গ্রহণ করত না, এ ভ্রান্তমতাবলম্বীদের বৈষম্যে প্রকৃত খ্রীষ্টান জানে, অন্তরে ঐশজীবন রাখতে হলে তাকে যীশুর সঙ্গে নিত্যস্থায়ী সংযোগে সংযুক্ত থাকতে হয়। এমনকি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ও স্থিতমূল থাকার জন্য তিনি যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রকৃত খ্রীষ্টান সেই সমস্ত (পবিত্র সাক্রামেন্তগুলি, প্রেরিতদূতগণের সঙ্গে সহভাগিতা, ঐশবাণী-পাঠ, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি) এর উপর অধ্যবসায়ের সঙ্গে নির্ভর করবে। এক কথায়, যোহন এক একজন পাঠককে খ্রীষ্টবিশ্বাসে বিশ্বস্ত হতে আহ্বান করেন, কারণ প্রকৃত বিশ্বাস-স্বীকার ভালবাসায় রূপান্তরিত হয় আর তেমন বিশ্বাস ও ভালবাসা এখন থেকেই ঈশ্বরের জীবন-সহভাগিতায় আমাদের উন্নীত করে।

উপসংহার

(৫:১৪-২১)

পরবর্তী পদগুলির বিবিধ পরামর্শ ও বিশ্বাস-সূত্র পত্রটির সমাপ্তি ঘটায়। বিদায়কালে যোহন প্রার্থনা (৫:১৪-১৭) ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য (৫:১৮-২১) জোর দিয়ে আমাদের আহ্বান করেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা (৫:১৪-১৭)

৫ [১৪] আর তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তা এ:
আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচনা করলে
তিনি আমাদের কথা শোনেন।
[১৫] আর যদি জানি, যা কিছু আমরা যাচনা করি, তিনি আমাদের কথা শোনেন,
তবে এও জানি যে, আমরা যা যাচনা করি, সেই সমস্ত পেয়ে গেছি।
[১৬] যদি কেউ নিজ ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যুজনক নয়,
তবে সে যাচনা করুক, আর তিনি তাকে জীবন দান করবেন
—অবশ্য তাদেরই, যাদের পাপ মৃত্যুজনক নয়।
কেননা মৃত্যুজনক একটা পাপ আছে,
এর জন্য তো আমি অনুরোধ রাখতে বলছি না।
[১৭] যে কোন অধর্মই পাপ,
কিন্তু এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়।

৫:১৪-১৫—আর তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় …: প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যোহনের এ আহ্বানের লক্ষণীয় কথা হল 'দৃঢ় প্রত্যয়।' দুঃখের বিষয়ে, এর অনুরূপ গ্রীক শব্দের প্রকৃত অর্থ তাতে সুস্পষ্ট হয়ে ফোটে না: সেই 'দৃঢ় প্রত্যয়' হল আস্থা, নিশ্চয়তা, সৎসাহস, নির্ভয়, অকপটতা ইত্যাদি অর্থসূচক ধারণা। উল্লিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোনটিই অধিকতর স্পষ্টভাবে যোহনের ব্যবহৃত কথা নির্ণয় করে, এ ধরনের কাজ অতিক্রম ক'রে যোহনের মতে প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যথোচিত মনোভাব কী হওয়া শ্রেয় এদিকে মন আকর্ষণ করি। উদাহরণযোগে বলতে পারি, যে পিতা আপন ছেলেকে সুস্নিগ্ধ স্নেহে ভালবাসেন ও তার প্রতি আপন গভীর প্রেম প্রকাশের জন্য সতত আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, এ ধরনের পিতার কাছে কিছু চাইতে যে মনোভাব একটি বাধ্য ছেলেকে অনুপ্রাণিত করে, প্রার্থনাকালে তেমন মনোভাবই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রার্থনা অনুপ্রাণিত করার কথা। অধিকন্তু আমরা যদি স্মরণ করি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা নিজের একমাত্র পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশ-মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছেন, তাহলে পিতার প্রতি আমাদের 'দৃঢ় প্রত্যয়' আর কত না বৃদ্ধি পাবে! সুতরাং আমরা নিশ্চিত আছি ঈশ্বর আমাদের কথা শোনেন। কিন্তু তবুও আমাদের সমুদয় যাচনা যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়: একথা স্মরণে পিতার চরণে যাচনা নিবেদন করার আগে একটু বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। প্রার্থনা সময়-কাটানোর জন্য নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ কাজ: আমরা ঈশ্বরের সন্তান একথা সত্য, আমাদের প্রেমের খাতিরে তিনি আপন পুত্রকে ক্রুশে নিবেদন করলেন একথাও সত্য, কিন্তু এও সত্য যে প্রার্থনাকালে আমাদের দেখাতে হয় আমরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি, তাঁর পরিত্রাণদায়ী সঙ্কল্প অর্থাৎ জগতের মুক্তি পূর্ণমাত্রায় সাধন করার জন্য তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা অবগত আছে এবং সাধারণত তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতায় জীবনযাপন করি। এ সম্বন্ধে যোহনের কয়েকটি বাক্য স্মরণযোগ্য: ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতাই হল প্রার্থনার পূর্বশর্ত:

তাঁর আজ্ঞাগুলি মেনে চলি বলেই আমরা যা যাচনা করি তা পাই (৩:২২)। খ্রীষ্টে স্থিতমূল থাকাই হল প্রার্থনার আর একটি পূর্বশর্ত: আমরা যদি যীশুতে স্থিতমূল থাকি এবং তাঁর বাণী যদি আমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে (অর্থাৎ আমরা যদি সেই ঐশবাণীর আলোতে আলোকিত হয়ে থাকি), তাহলে আমাদের যাচনা পূরণ করা হবে (যোহন ১৫:৭)। আবার, পিতার কাছে যীশুর নামেই যাচনা করা প্রয়োজন (যোহন ১৬:২৩)। সংক্ষিপ্তভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, আমাদের যাচনার মান যেন 'প্রভুর প্রার্থনা'র অনুরূপ মান হয়, তথা 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।' যোহনও এ মূলধারণা সমর্থন করেন, কিন্তু একথাও উল্লেখ করেন যে, প্রকৃত সরল মনোভাব নিয়েই প্রার্থনা করা উচিত এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হয়: আমরা যা যাচনা করি সেই সমস্ত পেয়ে থাকি। অর্থাৎ আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী যাচনা করি, তাহলে যা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী, তা ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে সাধিত হয়ে গেছে। সুতরাং প্রার্থনা করার আগে বিবেচনা কবর আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছি কিনা। এভাবে আমরা যীশুর মত অর্থাৎ ঈশ্বরের এমন প্রকৃত সন্তানের মত—যারা তাঁর সঙ্গে সতত মিলিত এবং তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য আকাঙ্ক্ষী—প্রার্থনা করব। এ পর্যায়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়: আমাদের যাচনাগুলো এবং সেগুলির সিদ্ধি এক হয়ে যায়, এমনকি 'ঈশ্বর আমাদের যাচনা পূরণ করুন' আমাদের এ ইচ্ছা এমন প্রার্থনায় পরিণত হবে আমরাই যেন ঈশ্বরের কথা শুনতে পাই এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারি (যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, 'যাচনা' পরিশিষ্ট পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য)।

৫:১৬—যদি কেউ নিজ ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে …: এখানে যে প্রার্থনার কথা নির্দেশ করা হয় সেটি হল সাধারণ পাপে লিপ্ত ভাইয়ের জন্য 'মধ্যস্থতামূলক' প্রার্থনা, অর্থাৎ যখন আমরা পাপী ভাইয়ের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়াই। আমাদের মধ্যস্থতার জন্য পিতা আমাদের যাচনা পূরণ ক'রে আমাদের ভাইকে জীবনদান করবেন, অর্থাৎ তার পাপ ক্ষমা করে তাকে পুনরায় আপন ঐশজীবনে গ্রহণ করবেন। সুতরাং সাধারণ পাপগুলির ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করা হল এবং স্বয়ং যীশু ঈশ্বরের সামনে আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন (১:৭,৯; ২:১ …)। তাছাড়া আমাদের ভাইদের মধ্যস্থতাও ঈশ্বরের কাছে পাপের ক্ষমা লাভের জন্য কার্যকারী।

কিন্তু 'মৃত্যুজনক' পাপ কাকে বলে? প্রাক্তন সন্ধিতে ঐশবিধানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সাধিত অপরাধ এবং ঈশ্বরের ও তাঁর জনগণের পরম পবিত্রতার বিরুদ্ধে কতিপয় নির্দিষ্ট পাপ—যথা প্রতিমাপূজা, নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি ধরনের পাপকে মৃত্যুজনক পাপ (বা 'মৃত্যুর উদ্দেশে' পাপ) বলত (লেবীয় ১৮:২৬-৩০; ১৯:১-৮; ২০:১-২৭)। যারা এ ধরনের পাপ করত ঈশ্বর চাইতেন তাদের তাঁর মনোনীত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে: পাপীর মৃত্যুই ছিল পাপীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। পরবর্তীকালে ইহুদীরা স্বধর্মত্যাগ এবং হিব্রু সমাজত্যাগ মৃত্যুজনক পাপ বলে গণ্য করত। কিন্তু যোহন উল্লিখিত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাল রাখেন না: যে পাপ পাপী মানুষকে ঈশ্বরের ঐশজীবন ও সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর ধারণায় সেটিই হল মৃত্যুজনক পাপ। এ পত্রের অনুধাবিত শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা অনুমান করতে পারি, 'খ্রীষ্টবৈরী' বলে আচরণ অর্থাৎ 'যীশুকে বিলুপ্ত করাই' হল মৃত্যুজনক পাপ: যারা যীশুকে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার করে, মাংসে তাঁর আগমন ও তাঁর মঙ্গলবাণী অবাস্তব ও সাধারণ মতবাদে পরিণত করে, ফলত খ্রীষ্টান অনুচিত জীবনও যাপন করে তারাই মৃত্যুজনক পাপে পাপী। ভ্রান্তমতাবলম্বীদের মত যারা এ ধরনের পাপগুলিতে লিপ্ত তারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুলোকে পতিত, ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের জন্য—মারাত্মক কথা!—ঐশক্ষমালাভ ও মনপরিবর্তনের আর কোনো আশা নেই, যেহেতু তারা মুখে ঈশ্বরকে প্রচার করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে শয়তানের অধীনে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করছে। এ সবকিছু থেকে একথাও অনুমান করা যায়, প্রৈরিতিক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গই খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিনিধি হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কে কে মৃত্যুজনক পাপে লিপ্ত হয়েছে কিনা এবং সেই প্রৈরিতিক মণ্ডলীর সঙ্গে এখনও সহভাগী বলে পরিগণিত করা যায় কিনা, যে প্রৈরিতিক মণ্ডলীর সঙ্গে সহভাগিতা হল ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাপ্রাপ্তির শর্তস্বরূপ। সুতরাং নিজের বেলায় কেউই বিচার করতে পারে না, সে মৃত্যুজনক পাপ করেছে কিনা ; সেই বিচার প্রৈরিতিক মণ্ডলীরই অধিকার।

৫:১৭—যে কোনো অধর্মই পাপ: ধর্মময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করলে তবেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত ব্যক্তি বলে পরিচয় দেয় (২:২৯ ···)। যে কোন অধর্ম বা পাপ সাধন ক'রে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু তবুও তাদের জন্য ঈশ্বরের সহায়তা ও ঐশক্ষমালাভের সম্ভাবনা সবসময় থাকে।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা (৫:১৮-২১)

পত্রটির আসল সমাপ্তি অংশ এখানেই শুরু হয়। নিজের পদ্ধতি অনুসরণ করে যোহন আপন বিশ্বাসীদের কাছে তাদের বাস্তবতা স্মরণ করান। এ শেষ অংশ সত্যিকারে সমাপ্তি বিজয়যাত্রাস্বরূপ হয়ে প্রতীয়মান হয়: তিনবার করেই 'আমরা জানি' সেই আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনি আমাদের স্মরণ করায় ইতিমধ্যেই আমরা কী লাভ করে গেছি: আমরা যারা তাঁর অনুগ্রহে তাঁর জীবন্ত ও বিশ্বাসী মণ্ডলী, আমরা জানি শয়তানকে জয় করে ফেলেছি (২:১০,১৪)। শুধু জগৎ এখনও শয়তানের অধীনে রয়েছে (৫:১৯), কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান বলে আমরা জগৎ-বিজয়ী হয়ে উঠলাম, কারণ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পাপ না করার শক্তি পেয়েছি (৩:৯ ···; ৫:১৮) এবং ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে সহভাগিতা গুণে শয়তানের আক্রমণ থেকে সংরক্ষিত হলাম (৫:১৮,২০; যোহন ১৬:১১)।

৫ ১৮ আমরা জানি: যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না ;
বরং ঈশ্বর থেকে যে সঞ্জাত, তাকে তিনি রক্ষা করেন,
আর সেই ধূর্তজন তাকে স্পর্শ করে না।
১৯ আমরা জানি: আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং সমগ্র জগৎ সেই ধূর্তজনের অধীন।
২০ এও আমরা জানি:
ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন
এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।
আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টে আছি ব'লে।
তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।
২১ বৎস, তোমরা অলীক দেবতাগুলো থেকে দূরে থাক।

৫:১৮—যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ···: যে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান সে পাপ করে না (৩:৯), কারণ তার সকল কাজকর্ম ঈশ্বরের কাজকর্ম অনুযায়ী (৩:৪ ··· ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আমরা যদি আমাদের বিশ্বাস ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করি আমরা ঈশ্বরের তাহলে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন এবং শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে অকৃতকার্য হবে। ঈশ্বরের রক্ষার নিশ্চয়তা ও তাঁর প্রতিশ্রুতি অবলম্বন ক'রেই প্রমাণ করব আমরা পাপের দাস নই, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ অবস্থা পাপানুযায়ী অবস্থা নয় বরং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনযাপনে ঐশপ্রেম অনুযায়ী অবস্থা। আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পবিত্র, ঠিক তেমন পবিত্র হওয়াই আমাদের আহ্বান। কিন্তু তবুও

আবার বারবার পাপ করব, কিন্তু পাপ ক'রে আমাদের ঐশশক্তি দ্বারা আবার মুখ উঁচু করে সাহসের সঙ্গে আমাদের জয়যাত্রায় পদার্পণ করব ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যের উদ্দেশে।

৫:১৯—আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত: আমরা ঈশ্বরের আপনজন (৩:৯) এবং শয়তানের অধীনস্থ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, এ সচেতনতা ও নিশ্চয়তাও আমাদের অনুপ্রাণিত করবে আমরা যেন প্রেমপূর্ণ ও পুণ্য জীবনযাপনে প্রমাণ করি ঈশ্বরই আমাদের পিতা আর তাঁর পুত্রতে আমরা সবাই তাঁর সন্তান। কিন্তু এ নিশ্চয়তা ও সচেতনতা যেন অহঙ্কারের কারণ না হয় বরং এমন গভীর ঈশ্বরোপলব্ধির উৎস হয় যা থেকে আমাদের পুণ্যকর্মের উদ্ভব হওয়ার কথা। অধিকন্তু, পরোক্ষভাবে যোহন আমাদের ইঙ্গিত করেন, প্রকৃত ঐশসহভাগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে (১:৩), তবে আমরা ঐশপরিত্রাণ থেকেও বঞ্চিত হব, জগতের হাতে পুনঃপতিত হব, এমনকি শয়তানের দাসে রূপান্তরিত হব। প্রেরিতদূতগণ ও তাঁদের উত্তরসূরী সেই বিশপগণের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় না রাখলে আমরা ঈশ্বরের ও যীশুখ্রীষ্টের জীবন-সহভাগিতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত কার, অর্থাৎ খ্রীষ্টবৈরী হয়ে উঠি।

৫:২০ক,খ,গ—ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন: ঈশ্বরের মণ্ডলীরূপে আমাদের তৃতীয় মূল নিশ্চয়তা ও সচেতনতা হল সেই ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্টের আগমনে বিশ্বাস করা, যিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরকে উত্তমরূপে জানিয়েছেন ও তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা দান করেছেন। পুত্রের মধ্যস্থতায় আমরা নূতন জ্ঞান ও চেতনা পেয়েছি এবং একমাত্র সত্যকার ও সত্যময় ঈশ্বরকে চিনতে সক্ষম হয়ে উঠেছি। এখানে মরমিয়া বা অভ্যন্তরীণ ধরনের ঈশ্বরোপলব্ধির কথা নির্দেশ করছি না, বরং ঈশ্বর ও সকল বিশ্বাসীর মধ্যকার নিত্যস্থায়ী সম্পর্কই বুঝাই (২:৩-৫)। উপরন্তু জানি, আমরা 'সত্যময়' ঈশ্বরে আছি, তার মানে আমাদের অন্তরে সর্বাস্তিত্ব ও বাস্তবতার পরিপূর্ণতাস্বরূপ ঈশ্বর বিরাজ করছেন। একথা জানতে পেরেছি কেননা তাঁর পুত্রের উপর বিশ্বাস রাখায় আমরা সেই যীশুতে আছি এবং আমাদের জীবন তাঁরই জীবন। যিনি পিতার সঙ্গে এক, সেই শেষ ও চরম ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা ব্যতীত আমরা আলো, সত্য, জীবন ও ভালবাসা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারতাম না, তাঁরই দ্বারা আমরা পেয়েছি তেমন জ্ঞান এবং মাংসে তাঁর পরিত্রাণদায়ী আগমন গুণেই ঈশ্বরের সন্তানরূপে রূপান্তরিত হয়েছি অর্থাৎ সেই ঐশজীবনে সঞ্জীবিত হয়েছি যা আমাদের প্রেমপূর্ণ ও পুণ্য জীবনযাপনে অভিব্যক্তি লাভ করে।

৫:২০ঘ—তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন: এই উক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এতে যোহন অনুসারে যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় ধারণা সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত। অনন্ত জীবন বলে (১:২; ৪:১১; যোহন ১১:২৫) যীশু নিজেই সত্যকার ঈশ্বর বলেও স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ঐশপ্রকাশকারী ব্যক্তি ও ঐশমধ্যস্থ শুধু নন, বরং আদি থেকে পুত্ররূপে পিতামুখী ছিলেন এবং মানবজীবনকালের পর তাঁর কাছে ফিরে গেছেন এজন্য স্বয়ং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেরও সহভাগী অর্থাৎ তিনিও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর (যোহন ১:১,১৮; ২০:২৮)। শুধু পুত্রের সঙ্গে সহভাগিতালাভ গুণেই আমরা ঈশ্বরের সঙ্গেও জীবন-সহভাগিতা লাভ করি, অর্থাৎ সেই অনন্ত জীবন লাভ করি যার নামান্তর হল পিতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা (১:৩): অনন্ত জীবন বলে যীশু হলেন পিতার কাছে যাবার একমাত্র উপায়। যিনি পিতার সঙ্গে এক, অনন্ত জীবন সেই যীশুর মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের ঐক্য-সহভাগিতায় অনুপ্রবেশ করি (যোহন ১৭:২৩)। আর শুধু তা নয়! অনন্ত জীবন বলে তিনি নিজে হলেন বিশ্বাসীমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের নিত্যস্থায়ী উপস্থিতিস্বরূপ: ক্রুশের উপরে 'গৌরবায়ন ক্ষণে' পিতার কাছ থেকে যে পরিত্রাণদায়ী অধিকার লাভ করেছিলেন সেটির বলে তিনি তাঁর বিশ্বাসীদের জন্য—আমাদেরই জন্য—আজও

অনন্ত জীবন হতে থাকেন এবং নিজের এ অনন্ত জীবনকে আমাদের দিয়ে থাকেন। বস্তুত তিনি আপন বাণী, আত্মা, ভালবাসা এবং 'তিনটি সাক্ষীর' (৫:৭) মধ্য দিয়েই আমাদের মাঝে এখনও উপস্থিত। তাঁর বাণী শ্রবণে, তাঁর আত্মার পরিচালনা স্বীকারে, তাঁর ভালবাসার অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর সঞ্জীবনকারী সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণে আমরা যীশুকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করি এবং তাঁকে আমাদের মাঝে জীবিত ও ক্রিয়াশীলভাবে বিরাজমান বলে ঘোষণা করি। এইভাবে তিনি পরম সিদ্ধির দিকে, স্বর্গধামে তাঁর গৌরব দর্শনের দিকে—ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যের দিকেই আমাদের চালনা করেন।

৫:২১—অলীক দেবতাগুলো থেকে দূরে থাক: পত্রটির এ শেষ পদের কথা যে আমাদের বিস্মিত করতে পারে তা সন্দেহের অতীত। বাস্তবিক অনেকে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, 'পূর্ববর্তী শিক্ষার সঙ্গে এ পদ কি করে খাপ খাওয়ান যায়?' আর এজন্য পদটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রবিদ্‌দের মতান্তর রয়েছে। অনেকে বলেন, যেহেতু যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীর সম্ভাব্য স্থান সেই এফেসস অশ্লীল প্রতিমাপূজার জন্য নাম-করা স্থান ছিল, এজন্য যোহন দেব-দেবীদের উপাসনা থেকে আপন খ্রীষ্টভক্তদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন।

অন্য কেউ বলেন, যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করাতে ভ্রান্তমতাবলম্বীরা আর খ্রীষ্টান নয়; যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র, ঐশপ্রকাশকর্তা, ত্রাণকর্তা, একাধারে প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত ঈশ্বর বলে অস্বীকার করাতে তাদের দ্বারা প্রচারিত খ্রীষ্টবিশ্বাস অন্যতম পুরাণের পর্যায়ে নেমে গেছে। সুতরাং ভ্রান্তমতাবলম্বীদের অলীক দেবতার পূজক বলে পরিগণিত করা যায়।

আবার অপর কেউ 'অলীক দেবতা' বলতে 'পাপ' বোঝেন, তাই তাদের মতে যোহন পাপ থেকে দূরে থাকতে আপনজনদের সতর্ক করেন। তাঁরা বলেন, খ্রীষ্টানদের পক্ষে পাপ দেবতাস্বরূপ, কারণ পাপ ক'রে মানুষ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে আর তাঁর পরিবর্তে নিজের পাপগুলি 'পূজা' করে।

এখানে উপস্থাপিত নানা ব্যাখ্যা আংশিকভাবে সবই ত সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু সম্প্রতিকালে একজন শাস্ত্রবিদ অধিক সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলেন। তিনি পত্রটির এ শেষ পদের কথা এবং নবী এজেকিয়েলের একটি বাণীর মধ্যে সংযোজক মিল খুব সঙ্গতভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। প্রাক্তন সন্ধিকালে নবী এজেকিয়েল ভাববাণী দিয়েছিলেন, যেদিন ঈশ্বর মানুষের কাছে নতুন আত্মাকে দান করবেন, সেদিন তিনি তাকে সকল ঘৃণ্য মূর্তি ও জঘন্য বস্তু থেকে (অর্থাৎ, অলীক দেবতা থেকে) পরিশুদ্ধ করবেন (এজে ১১:১৯-২১)। আত্মশুদ্ধি ক'রে ও দেবতাদের ত্যাগ ক'রে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি-সহভাগিতা বজায় রেখে, এমনকি ঘনিষ্ঠতর ঈশ্বরজ্ঞান উপলব্ধিতে জীবনযাপন করা-ই ছিল প্রাক্তন সন্ধির মর্মকথা। যেহেতু এ মর্মকথা এবং যোহনের পত্রটির মর্মকথা এক, এজন্য অনুমান করতে পারি, অলীক দেবতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বলাতে যোহন প্রাক্তন সন্ধির মর্মকথা পুনরুপস্থাপন করতে এবং প্রাক্তন সন্ধির প্রতিশ্রুতির পূর্ণতাও ঘোষণা করতে অভিপ্রেত ছিলেন। তিনি যেন বলেন, 'বৎস, অলীক দেবতা থেকে দূরে থাক (৫:২১), কারণ এর মধ্যে ঈশ্বর তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং আপন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান-সহভাগিতায় উন্নীত করে তুলেছেন। খ্রীষ্টই আপন রক্ত দ্বারা তোমাদের পরিশুদ্ধ করেছেন (২:২, ইত্যাদি), সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান তোমাদের দিয়েছেন (৫:২০খ), এবং সেই যীশুতে স্থিতমূল থেকে তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে উঠেছ (৫:২০গ)।'

যোহনের দ্বিতীয় পত্র

এ দ্বিতীয় পত্রের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও সমস্যাগুলো মোটামুটি প্রথম পত্রের একই দৃষ্টিকোণ ও সমস্যা, কিন্তু সবকিছু খুব সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করা হয়।

পত্রটির কাঠামো আপনাতেই সুস্পষ্ট: সূচনার পর (১-৩) সেই স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর গুণের প্রশংসা করা হয় এবং ভ্রাতৃপ্রেমের আজ্ঞা অধিক সঠিকভাবে পালন করার জন্য তাকে আহ্বান করা হয় (৪-৬)। ৭-১১-এ পত্রটির আসল প্রসঙ্গ প্রকাশ পায়: ভ্রান্তমতাবলম্বীর বিষয়ে সাবধান। এরপর পত্রটির সমাপ্তি (১২-১৩)।

[১-২] প্রবীণ এই আমি, যাদের সত্যিই ভালবাসি—আর শুধু আমি নয়, যারা সত্য জেনেছে, তারা সকলেও—সেই সত্যের কারণে যা আমাদের অন্তরে বসবাস করছে এবং আমাদের সঙ্গে অনন্তকাল থাকবে, সেই মনোনীতা ভদ্রজনা ও তার সন্তানদের সমীপে: [৩] পিতা ঈশ্বর ও পিতার পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকুক—সত্যে ও ভালবাসায়।

[৪] আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি, কেননা দেখতে পেয়েছি, আমরা পিতা থেকে যেভাবে আজ্ঞা পেয়েছি, তোমার কয়েকজন সন্তান সেইভাবে সত্যে চলছে। [৫] আর এখন, ভদ্রে, তোমার কাছে অনুরোধ রাখি: নতুন আজ্ঞা নয়, আদি থেকে যা পেয়েছি, সেই আজ্ঞার কথাই লিখছি—আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি।

[৬] আর ভালবাসা এ: আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুলি অনুসারে চলি; তোমরা আদি থেকে যেভাবে শুনে আসছ, আজ্ঞাটি এ: ভালবাসায় চল। [৭] কেননা অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে; তারা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না—এ-ই তো প্রতারক ও খ্রীষ্টবৈরী! [৮] সতর্ক হও, তোমরা যা সাধন করেছ, তার ফল না হারিয়ে বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার পাও। [৯] যে কেউ মাত্রা অতিক্রম করে ও খ্রীষ্টের শিক্ষায় স্থিতমূল থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায়নি; এ শিক্ষায় যে স্থিতমূল থাকে, সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে। [১০] যদি কেউ এ শিক্ষা বহন না করে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা তাকে ঘরে গ্রহণ করো না, তাকে স্বাগতও জানিয়ো না। [১১] বস্তুত, তাকে যে স্বাগত জানায়, সে তার সমস্ত দুষ্কর্মের সহভাগী হয়।

[১২] তোমাদের কাছে অনেক কথা লেখার ছিল; কাগজে-কালিতে তা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আশা রাখি, তোমাদের কাছে আসব ও তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব, যেন আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

[১৩] তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানেরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১-২—প্রবীণ এই আমি …: যে যে স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করত, তাদের মধ্যে একটির কাছে এ চিঠিপত্র পাঠিয়ে যোহন 'প্রবীণ' বলে নিজের পরিচয় দেন। অর্থাৎ না কি তিনি একাধারে হলেন তাদের শিক্ষাগুরু, পথদিশারী ও প্রকৃত বিশ্বাস-পরম্পরার বিষয়ে প্রবীণ সাক্ষী। এতে আমরা জানতে পারি সেকালের স্থানীয় মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ও সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে কী রূপ সম্পর্ক বিরাজ করত। মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছিলেন শিক্ষাগুরু ও সদাচরণের দিশারী; সাধারণ সর্দারের মত নয় বরং পিতৃস্নেহ ও যত্নের সঙ্গেই তাঁরা বিশ্বাসীদের প্রতিপালন করতেন।

'মনোনীতা ভদ্রজনা' হল সেই স্থানীয় মণ্ডলী যার কাছে যোহন পত্রটি পাঠিয়েছিলেন এবং 'সন্তানেরা' হল সেই মণ্ডলীর সকল বিশ্বস্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসী। উল্লিখিত নাম দু'টোও আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর একটি ছবি আঁকবার জন্য সহায়তা করে: নিজের বর যীশুখ্রীষ্টের প্রভুত্বের অংশী বলে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে 'ভদ্রজনা' বলা হয়: ক্রুশ-মৃত্যুতে যীশু যে গৌরব অর্জন করেছিলেন, খ্রীষ্টমণ্ডলী তখন থেকেই সেই ঐশগৌরবের সহভাগী হয়ে উঠেছে। উপরন্তু খ্রীষ্টের

কনে সেই খ্রীষ্টমণ্ডলী হল সেই স্থান যেখানে মানুষ যীশুর ঐশজীবন পেতে পারে। এজন্যই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের তার 'সন্তান' এবং তাকে তাদের 'মাতা'ও বলে। সংক্ষিপ্ত হলেও এ ইঙ্গিতগুলি অধিক প্রমাণ করে প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হলেই মানুষ খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করতে পারে। অবশেষে এ ইঙ্গিতগুলো আহ্বান করে আমরা যেন আমাদের খ্রীষ্টমণ্ডলীগত স্বরূপ গভীরতরভাবে উপলব্ধি ক'রে উত্তমরূপে খ্রীষ্টাদর্শ পালন করি।

"সেই সত্যের কারণে যা আমাদের অন্তরে বসবাস করছে": যোহন ভালবাসার খাতিরেই পত্রটি লিখেছেন এবং এ ভালবাসার কারণ এটিই, 'সত্য' অর্থাৎ খ্রীষ্টপ্রকাশিত ঐশবাস্তবতা বিশ্বাসীদের অন্তরে বসবাস করে, এমনকি তাদের জন্য ঐশসত্য হল এমন সহায়তা যা তারা কখনও হারাবে না। সুতরাং বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর পারস্পরিক ভালবাসা ঐশবাস্তবতার সঙ্গে তাদের সহভাগিতায় স্থাপিত। স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীগুলো যীশুখ্রীষ্টে একীভূত আছে এবং তিনিই তাদের ঈশ্বরমুখী করেন ও ঈশ্বরের সহায়তা তাদের দান করেন।

৩—অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি: 'দয়া ও শান্তি' ছিল প্রাক্তন সন্ধিকালে প্রচলিত সম্ভাষণ এবং 'অনুগ্রহ' ছিল গ্রীকদের সম্ভাষণ। গ্রীকভাষী হিব্রুরা 'অনুগ্রহ' বলতে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা বুঝাত। সেকালের খ্রীষ্টান লেখকগণ 'অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি' বলতে ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের দেওয়া দানগুলি নির্দেশ করতেন। উল্লিখিত শব্দ তিনটি ব্যবহার করে যোহন একথাও বলেন যে, সেই দানগুলি 'সত্য ও ভালবাসার' ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা দরকার। এবিষয়ে স্মরণ রাখা উচিত হিব্রুদের মতে 'সত্য ও ভালবাসা' ছিল ঈশ্বরের এমন স্বীয় বৈশিষ্ট্য যেগুলি শুধু তাঁর কাছেই পাওয়া যায়, কিন্তু মানবীয় আচরণে যথাযথভাবে প্রকাশ পায় না: সাধারণত মানুষ যখন সত্যকে অতিরিক্তভাবে অবলম্বন করে তখন সকলের বিচারক হতে চায়, ফলত ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হয়। আবার সে যখন ভালবাসায় আক্রান্ত হয় তখন সত্য ও ন্যায় বজায় রাখতে পারে না। সাম ৮৫:১১ সম্বন্ধে ইহুদী ঐতিহ্য বলত, শুধু ঈশ্বরে এবং মসীহের আগমনের সময়ে ভালবাসা ও সত্যের সাক্ষাৎ ঘটবে, ন্যায় ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করবে। কিন্তু এখন মসীহ যীশু এসে গেছেন, এমনকি স্বয়ং তিনি সত্য এবং তাঁর মধ্যে ঈশ্বর ভালবাসা বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এজন্য তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে আমরা এখন ঐশসত্য এবং ঐশভালবাসার সহভাগী হয়ে উঠলাম। অবশ্যই এখনও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যখন সত্য ও ভালবাসার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই; এধরনের অবস্থা যোহনের স্থানীয় মণ্ডলীতেও দেখা দিয়েছিল এবং এ পত্রের মাধ্যমে তিনি সমস্যা মোকাবেলা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

৪—আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি: আশীর্বাদের পর যোহন নিজের আনন্দ ব্যক্ত করেন। তিনি আনন্দিত, কেননা আশীর্বাদ করা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করা সর্বদা আনন্দের উৎস হওয়ার কথা। আবার তিনি আনন্দিত, কারণ যাদের কাছে চিঠিপত্র পাঠান তিনি জানেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রেমাজ্ঞা মেনে চলে।

৫—তোমার কাছে অনুরোধ ...: তাদের প্রশংসা করে যোহন তাদের উপদেশ দিয়ে বলেন তারা সবাই যেন যীশুর দেওয়া আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকে। প্রথম পত্রের মত এখানেও যোহন নূতন কিছু বলতে চান না, বরং ভ্রাতৃপ্রেম পালন করতে সকলকে অনুরোধ করেন, কারণ ভ্রাতৃপ্রেমেই খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত এবং এ আজ্ঞা পালনে খ্রীষ্টবিশ্বাসী জানে সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছে (১ যোহন ৩:১১)। আসলে, প্রেরিতদূতগণের হস্তান্তরিত সংবাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও মণ্ডলীতে ভালবাসা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, নইলে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিত্রাণ হবে না (১ যোহন ১:৯-১১; ৩:১০-১৪,২৩; ৪:৭-১২,২০ ...)।

৬—আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুলি অনুসারে চলি: প্রথম পত্রের মত এখানেও ‘ভালবাসা’ বলতে ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি মেনে চলা বোঝায়। প্রেমাজ্ঞা দৈনন্দিন জীবনেই প্রকাশ পাবার কথা (১ যোহন ৩:১৭ …)। প্রেমাজ্ঞা পালন করে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও সহায়তা লাভ করি।

৭—অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে: প্রথম পত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি যোহনের স্থানীয় মণ্ডলী নকল শিক্ষাগুরু বা খ্রীষ্টবৈরীদের দ্বারা আক্রান্ত ছিল। তাদের উপস্থিতি দেখায় শয়তান খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অমঙ্গল ঘটাবার জন্য অবিরত প্রবৃত্ত আছে। শয়তানের জাল থেকে মুক্তি পেতে হলে সেই যীশুখ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করতে হয় যিনি পিতা দ্বারা সর্বযুগের মানুষের জন্য এ জগতে প্রেরিত হয়েছিলেন (১ যোহন ৪:২)। মাংসে ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের আগমন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা ও পবিত্র জীবনযাপনে বাস্তবায়িত করা একান্ত প্রয়োজন (১ যোহন ৪:২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমন অতীতকালের একটা তত্ত্ব নয় বরং তা এমন মহাঘটনা বলে উপলব্ধি করতে হয় যার মাধ্যমে আমরা ঐশপরিত্রাণ পেয়ে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠলাম।

৮—সতর্ক হও: যোহন আপন খ্রীষ্টভক্তদের সতর্ক থাকতে আহ্বান করেন, পাছে তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় ও তারা ঐশপুরস্কার হারায়।

৯—যে কেউ মাত্রা অতিক্রম করে …: এ পর্যায়ে যোহন নকল শিক্ষাগুরুদের মুখোশ খুলে দেন। তারাই নকল শিক্ষাগুরু যারা যীশুখ্রীষ্টের হস্তান্তরিত শিক্ষার মাত্রা অতিক্রম করে (১ যোহন ২:৭ …,২৪,২৭)। জ্ঞানমার্গপন্থী হিসাবে তারা মনে করত দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্ব না দিলেও তারা প্রকৃত বিশ্বাস ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করছে এবং এজন্য তারা পৃথিবীস্থ যীশুর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। যোহন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন, যারা এদের ভ্রান্তমত অবলম্বন করে তারা ঈশ্বরকে পায়নি। তারাই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাপ্রাপ্ত হয়েছে যারা যীশুর শিক্ষায় ‘স্থিতমূল থাকে’, অর্থাৎ যারা হস্তান্তরিত শিক্ষা বিশ্বস্তভাবে পালন করে। লক্ষ করার বিষয়, এ কথাগুলো সেই যোহন দ্বারা প্রচারিত, যিনি নবসন্ধির লেখকদের মধ্যে অগ্রগামী বলে পরিগণিত। সুতরাং অনুমান করতে পারি, যোহনের মত বর্তমানকালেও প্রকৃত অগ্রগামী খ্রীষ্টান পরম্পরাগত খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পবিত্র আত্মার আলোতে সেই ঐতিহ্যের মর্মকথা গভীরতরভাবে উপলব্ধি ও নবীকৃত করতে সচেষ্ট থাকে এবং তা-ই করে সে সম্পূর্ণরূপেই নতুন কিছু উত্থাপন করতে আদৌ অভিপ্রেত নয়। অপর ধরনের অগ্রগামী খ্রীষ্টান পরম্পরাগত খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য বাঁধন বলে বিবেচনা করে এবং সাধারণত এমন কাল্পনিক বিশ্বাস অবলম্বন করে যা মণ্ডলীগত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তাকে মুক্ত করে।

১০—যদি কেউ এ শিক্ষা বহন না ক’রে …: খ্রীষ্টমণ্ডলীকে রক্ষা করার জন্য যোহন নির্দ্বিধায় প্রচার করেন, খ্রীষ্টকে ও খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ধ্বংসনকারী ব্যক্তিদের প্রতি আতিথ্য অস্বীকার করতে হয়। এত কঠিন কথা নবসন্ধিতে আর কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকালীন অন্যান্য লেখায় তা পাওয়া যায় (এফেসীয়দের কাছে সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৭:১; ৯:১; স্মির্নীয়দের কাছে সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৪:১; ৭:২; বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষাবাণী ১১:১ …): ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অবৈধ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে কথা বলতে, এমনকি তাদের জন্য প্রার্থনাও করতে নেই (১ যোহন ৫:১৬)। এ প্রসঙ্গে কথিত আছে একদিন যোহন এফেসসের একটি বিশেষ ভবনে স্নান করছিলেন, এমনসময় কেরিন্থস নামক একজন ভ্রান্তমতপন্থী স্নানের জন্য একই ভবনে প্রবেশ করে। হঠাৎ যোহন জল থেকে বেরিয়ে একথা বলে চলে গেলেন, ‘এসো, পালিয়ে যাই সবাই, নইলে ভবনটা আমাদের উপর ভেঙে পড়বে; সত্যের শত্রু কেরিন্থস এসেছে!’

আবার, সাধু পলিকার্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মার্কিওর্নয়োন নামক একজন ভ্রান্তমতাবলম্বী তাঁকে বলল, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন?' উত্তরে সাধু পলিকার্প বললেন, 'আপনাকে দেখে শয়তানের প্রথমজাতকে চিনতে পারলাম!' উল্লিখিত কথা ও ঘটনাগুলোর জন্য আমাদের একটু আশ্চর্য লাগতে পারে, কিন্তু তবুও এতে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয় কত না তীব্রভাবে আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকে প্রকৃত বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। যারা নাজারেথীয় যীশুকে গ্রহণ না করে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের সহভাগিতাপ্রাপ্ত বলে মনে করত, তারা প্রকৃত খ্রীষ্টানদের জন্য বিপদস্বরূপ ছিল। এবং এমন ভণ্ড ভ্রাতার সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখত সে তার মৃত্যুজনক পাপের সহভাগী হয়ে যেত, কেননা খ্রীষ্টানদের মধ্যে বাহ্যিক ধরনের সম্ভাষণ প্রচলিত ছিল না বরং সম্ভাষণ ছিল ভ্রাতার জন্য ঈশ্বরের শান্তি ও অনুগ্রহ কামনা করা। একই প্রকারে নিজের ঘরে তেমন ভ্রান্তমতাবলম্বীদের যে গ্রহণ করত সে পরোক্ষভাবে প্রচার করত, সে ভ্রান্তমতাবলম্বীদের সমর্থনকারী এবং যীশু ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর শত্রু, কারণ আতিথ্য বলতে জীবন-সহভাগিতা বোঝায়। তথাপি একথাও লক্ষণীয়, শাস্ত্র তেমন লোকদের ঘৃণা করতে কখনও বলে না; একথাই মাত্র বলে, ভ্রান্তমতাবলম্বী বলেই তাদের জানতে হয় এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কাজ সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেই ঠিকই, কিন্তু সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা শ্রেয়। উপসংহারে বলতে পারি, এ নিয়মগুলি প্রকাশ করে সেকালের খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত ভালবাসাকে সত্যিকারে ঈশ্বরের এমন দান বলে ধারণা করত, যে দানগুলি আমরা শুধু প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রেখে গ্রহণ করতে পারি। ভ্রান্তমতাবলম্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব সহজে সেই খাঁটি বিশ্বাসের পতন ঘটাবে, যে বিশ্বাস প্রকৃত ভালবাসার ভিত্তিস্বরূপ; এরপর ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতাও ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে।

১২— (…) যেন আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়: আনন্দ হল খ্রীষ্টানদের মধ্যে সহভাগিতার ফল এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার প্রমাণ (১ যোহন ১:৪)। যোহন সত্যিই আনন্দিত, কারণ তাঁর প্রিয় সন্তানদের দেখতে পাবেন যাদের তিনি খ্রীষ্টবিশ্বাসে জন্ম দিয়েছিলেন। আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীতে আনন্দ ছিল মুখ্য ও প্রকাশমান একটি বৈশিষ্ট্য; নির্যাতন থাকা সত্ত্বেও তারা খ্রীষ্টবিশ্বাসে একত্রিত হওয়াতে আনন্দ করত।

১৩—তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানেরা …: যোহনের সঙ্গে তাঁর স্থানীয় মণ্ডলীও 'ভগিনী মণ্ডলীর' কাছে প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। 'ভগিনী' হিসাবে উভয় স্থানীয় মণ্ডলী প্রেরিতদূত যোহনের পরিচালনা স্বীকার করে। তিনি অত্যাচারী রাজার মত নয় বরং পিতার মত প্রেমপূর্ণ যত্নশীলতায় সেই এলাকার বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে একতা সৃষ্টি করেন।

যোহনের তৃতীয় পত্র

দ্বিতীয় পত্রের মত এ তৃতীয় পত্রও খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এবারে যোহন একটি স্থানীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছে নয়, বরং গাইউস নামক একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠান। এ পত্রের মাধ্যমেও আমরা আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনধারা ও সমস্যাদির স্পষ্ট একটি ছবি পাই।

যোহন উত্তম জীবনাদর্শ ও আতিথেয়তার জন্য গাইউসের প্রশংসা করেন এবং যত পরিব্রাজক বাণীপ্রচারকদের সাহায্য করতে তাঁকে অনুরোধ করেন (২-৮)। বস্তুত, গাইউসের স্থানীয় মণ্ডলীর উপপরিচালক প্রেরিতদূত যোহনের প্রেরিতজনদের প্রতি আতিথেয়তা রক্ষা করে না, এমনকি তাঁর বন্ধুদের ধর্মচ্যুত করে। স্বয়ং যোহন সেই উপপরিচালকের কাছে গিয়ে তার দুর্ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ত চাইবেন (৯-১০)।

[১] প্রবীণ এই আমি, প্রিয় গাইউসের সমীপে, যাঁকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

[২] প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি যেমন কুশলে আছ, প্রার্থনা করি, সব দিক দিয়ে তুমি যেন কুশলে থাক, তোমার শরীর যেন সুস্থ থাকে। [৩] আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যখন কয়েকজন ভাই এসে তোমার সত্যের বিষয়ে—তুমি কী ভাবে সত্যে চল—সাক্ষ্য দিয়েছেন। [৪] আমার সন্তানেরা সত্যে চলে, একথা শুনতে পাওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই।

[৫] প্রিয়তম, ভাইদের জন্য, এমনকি তাঁরা বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের জন্য তুমি যা কিছু করছ, তাতে তোমার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত। [৬] তাঁরা মণ্ডলীর কাছে তোমার ভালবাসার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর তুমি যদি তাঁদের যাত্রার এমন ব্যবস্থা কর যা ঈশ্বরের যোগ্য, তবে ভালই করবে। [৭] তাঁরা তো নামের খাতিরেই বেরিয়েছেন, বিধর্মীদের কাছ থেকে কিছুই দাবি করেননি। [৮] তাই তেমন মানুষদের সাদরে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, যেন সত্য-সাধনে তাঁদের সহযোগী হতে পারি।

[৯] মণ্ডলীর কাছে কিছু লিখেছিলাম, কিন্তু সেখানকার মাতব্বরিপ্রিয় দিওত্রেফেস আমাদের গ্রাহ্যই করছেন না। [১০] তাই যখন আমি আসব, তখন তিনি বাজে কথা ব'লে আমার নিন্দা ক'রে যে সমস্ত কাজ করছেন, তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব। আর তিনি তাতেও তুষ্ট নন; তিনি নিজেই ভাইদের গ্রাহ্য করতে চাচ্ছেন না, আর যারা তাঁদের গ্রাহ্য করতে ইচ্ছুক, তাদেরও তিনি বাধা দিচ্ছেন, এমনকি মণ্ডলী থেকে তাদের বের করে দিচ্ছেন। [১১] প্রিয়তম, যা অমঙ্গল, তা নয়, যা মঙ্গল, তারই অনুকারী হও। যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত; যে অসৎ কর্ম করে, সে ঈশ্বরকে দেখেনি।

[১২] দেমেত্রিওসের পক্ষে সকলে, এমনকি স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন; আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি; এবং তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

[১৩] তোমার কাছে অনেক কথা লেখার ছিল, কিন্তু কালি-কলমে তা করতে চাচ্ছি না। [১৪] আশা রাখি, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হবে; তখন মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব। [১৫] তোমার শান্তি হোক! বন্ধুরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। প্রত্যেকের নাম করে তুমিও বন্ধুদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

১—প্রবীণ এই আমি, প্রিয় গাইউসের সমীপে …: গাইউস সম্বন্ধে আমরা বেশি কিছু জানি না। চতুর্থ পদ দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুমান করা যায় গাইউস যোহনের দ্বারা খ্রীষ্টবিশ্বাসে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কথিত আছে তিনি পরবর্তীকালে পের্গামস শহরের বিশপ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৩-৪—আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি: যাদের খ্রীষ্টবিশ্বাসে দীক্ষিত করেছেন তাঁর সন্তানদের সদাচরণ দেখে যোহন বড় আনন্দ ভোগ করেন।

৫—প্রিয়তম, ভাইদের জন্য …: পরিব্রাজক বাণীপ্রচারকদের প্রতি সহানুভূতি এবং আতিথেয়তা প্রদর্শন করাই হল সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। অচেনা বাণীপ্রচারকদের সাহায্য করেছেন বলে গাইউস

যোহনের দ্বারা প্রশংসিত।

৭-৮—**তাঁরা তো নামের খাতিরেই বেরিয়েছেন:** পরিব্রাজক বাণীপ্রচারকদের যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলের দায়িত্ব, কারণ তাঁরা নিজেদের স্বার্থের জন্য নয়, বরং অখ্রীষ্টানদের মধ্যে যীশুনাম প্রচার করার জন্যই পরিভ্রমণ করেন। অখ্রীষ্টানদের মধ্যে গিয়ে তাঁরা তাদের কাছে আর্থিক কিছু চান না, কেননা টাকা-কড়ির বিষয়ে তাঁদের চিন্তাটুকুও নেই। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঐশরাজ্য বিস্তার করা। তাঁরা অখ্রীষ্টানদের সাহায্য না পাওয়াতে বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীই তাঁদের সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য দায়ী। উপরন্তু, বাণীপ্রচারকদের সাহায্য ক'রে স্থানীয় মণ্ডলীগুলো প্রৈরিতিক কাজে সহযোগিতা দেয় এবং প্রমাণ করে যে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম শুধু খ্রীষ্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জগতের পরিত্রাণের জন্য সকলের কাছে বিস্তারিত: খ্রীষ্টমণ্ডলী জগৎকে অস্বীকার করে না, কিন্তু জগতের চিন্তা-ধারণা অগ্রাহ্য করলেও জগতের পরিত্রাণ সাধন করতে ইচ্ছা করে। তাছাড়া, পরিব্রাজকদের প্রতি আতিথেয়তা সেকালের সাধারণ প্রথা ছিল। এবিষয়ে হিব্রু ঐতিহ্য বলত, পরিব্রাজককে গ্রাহ্য করা হল ঈশ্বরকেই গ্রাহ্য করা। এ হিব্রু ঐতিহ্য এখনও বেনেডিক্টপন্থী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বীকৃতি পায়; তাদের সংবিধান বলে: 'মাথা নত ক'রে কিংবা ষষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে সন্ন্যাসী অতিথিতে বিরাজমান যীশুখ্রীষ্টকে গ্রাহ্য ক'রে পূজা করুক।'

৯-১০—**দিওত্রেফেস আমাদের গ্রাহ্য করছেন না:** দিওত্রেফেস কিন্তু গাইউসের মত তত ভাল ব্যক্তি নন। পরিব্রাজক বাণীপ্রচারকদের প্রতি আতিথেয়তা রক্ষা না করে অন্যান্য খ্রীষ্টানদেরও আতিথেয়তা রক্ষা করতে বাধা দেন। উপরন্তু তিনি যোহন ও তাঁর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান না এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সেবা নয়, মাতব্বরি করেন।

১১—**প্রিয়তম, যা অমঙ্গল …:** যোহন গাইউসকে সদাচরণ করতে আহ্বান করেন। যারা সদাচরণ করে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতা লাভ করেছে, কিন্তু যারা দুর্ব্যবহার করে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীদের জীবন-সহভাগিতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে।

১২—**দেমেত্রিওসের পক্ষে …:** দেমেত্রিওসও আমাদের কাছে অচেনা ব্যক্তি। যোহন তার উপর নির্ভর করেন, এমনকি স্বয়ং সত্য তার সততার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। অর্থাৎ মানুষ শুধু নয়, ঈশ্বরই দেমেত্রিওসে প্রীত হন; তার সমস্ত জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী: সে-ই প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসী। আপন অধিকারে যোহন নিজে তার সততা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন, এজন্য গাইউস দেমেত্রিওসকে গ্রাহ্য করাতে আপন ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ করবেন।

১৫—**তোমার শান্তি হোক:** উপসংহারে যোহন গাইউসের জন্য শান্তি, অর্থাৎ ঐশপরিত্রাণের পূর্ণতা কামনা করেন। আবার তিনি বলেন অল্প দিনের মধ্যে তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন, তখন পিতার মত তাঁর প্রিয় সন্তানদের সঙ্গে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চেষ্টা করবেন। সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও যোহন অন্তরের শান্তি হারান না, আন্তরিকতা গুণে তিনি বিভিন্ন সমস্যা ও অশান্তি জয় করবেন বলে আশা পোষণ করেন।

*　　　*　　　*

দ্বিতীয় পত্রের মত এ তৃতীয় পত্রও আমাদের চোখে আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনধারার একটি জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছে। সেকালেও খ্রীষ্টমণ্ডলী বিবিধ সমস্যায় আক্রান্ত ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম, ঈশ্বরজ্ঞান ও খ্রীষ্টবিশ্বাস-স্বীকার

বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বদা রত ছিল। উপরন্তু যোহনের শিক্ষা বারবার উপস্থাপিত হয়: আমাদের স্মরণ করতে হয় যে খ্রীষ্টানদের পরিচয় ভ্রাতৃপ্রেমেই প্রকাশ পায় এবং খ্রীষ্টান-উচিত আচরণ ভালবাসায় ও সত্যে প্রমাণিত হওয়ার কথা।

পরিশিষ্ট

শব্দসূচী

আজ্ঞা – আদি থেকে শ্রুত **বাণীই** প্রধান আজ্ঞা, যে বাণী **বিশ্বাস** ও পারস্পরিক **ভালবাসা** দাবি করে, ২:৭,৮; ৩:২৩; ৪:২১; ২ যোহন ৫,৬।
– আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে-ই **ঈশ্বরকে জানে**, ২:৩,৪।
– আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে **ঈশ্বরে থাকে** আর ঈশ্বর তার অন্তরে, ৩:২৪।
– আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায়, ৩:২২।
– আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে-ই ঈশ্বরকে **ভালবাসে**, ৫:২,৩।
– ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়, ৫:৩।

আনন্দ – প্রেরিতদূতগণের এবং **ঈশ্বরের** সঙ্গে আমাদের **সহভাগিতার** ফলই পূর্ণ আনন্দ, ১:৪ (২ যোহন ১২)।
– (খ্রীষ্টভক্তগণ পবিত্র **জীবন** যাপন করেন বলে যোহন আনন্দিত, ৩ যোহন ৪)।

আলো – **ঈশ্বর** আলো, ১:৫।
– সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান, ২:৮।
– আলোতে চলা দরকার, ১:৭।
– পারস্পরিক **ভালবাসা** পালনে আমরা আলোতে থাকি ২:১০।

ঈশ্বর – তিনি **আলো**, ১:৫,৭।
– তিনি **ভালবাসা**, ৪:৮,১৬।
– তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্মময়, ১:৯।
– **যীশুকে** যে **স্বীকার** করে তিনি তার অন্তরে **থাকেন**, ৪:১৫।
– প্রতিবেশীকে যে **ভালবাসে**, তিনি তার অন্তরে **থাকেন**, ৪:১৬।
– তিনি **যীশুতে** আমাদের অনন্ত **জীবন** দিয়েছেন, ৫:১১।
– আমরা **ঈশ্বরের সন্তান**, ৩:১,২।
– আমাদের অন্তরে তাঁর **বীজ থাকে**, ৩:৯।
– আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত, ৩:৯,১০; ৪:৪,৬,৭; ৫:১,৪,১৮,১৯।
– যে ঈশ্বর থেকে উদ্গত সে **পাপ** করে না, ৩:৯; ৫:১৮।
– ঈশ্বর থেকে উদ্গত হতে হলে সদাচরণ কর প্রয়োজন, ৩:১০।
– ঈশ্বর থেকে যা উদ্গত, তা **জগৎকে** জয় করে, ৫:৪।
– যে ঈশ্বরকে **ভালবাসে**, সে প্রতিবেশীকেও ভালবাসে, ৪:২১; ৫:২; ৩ যোহন ১১।
– প্রতিবেশীকে **ভালবাসলে** তবেই ঈশ্বরে **থাকি**, ৪:১৮।
– ঈশ্বরকে যে শোনে, সে প্রেরিতদূতগণকেও শুনবে, ৪:৬।

– প্রকৃত খ্রীষ্টান ঈশ্বরের **আজ্ঞাগুলি** পালন করে, ২:৩,৪; ৩:২২,২৪; ৫:২,৩।

ঈশ্বরের সন্তান

– খ্রীষ্টান ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত এবং সত্যিই তা-ই, ৩:১-২।

– ঈশ্বরের সন্তান বলে আমাদের ধর্মাচরণ ও **প্রেমাজ্ঞা** পালন করা প্রয়োজন, ৩:১০।

– যে ঈশ্বরকে **ভালবাসে** ও তাঁর **আজ্ঞাগুলি** পালন করে, সে তাঁর সন্তানদের ভালবাসবে, ৫:২।

খ্রীষ্ট **যীশুখ্রীষ্ট** দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টবৈরী – খ্রীষ্ট বলে **যীশুকে** যে অস্বীকার করে, সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, ২:২২।

– **পিতা** ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে, সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, ২:২২।

– মাংসে যীশুখ্রীষ্টের আগমন যে অস্বীকার করে, সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, ৪:৩; ২ যোহন ৭।

– অনেক খ্রীষ্টবৈরী এর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে, ২:১৮।

ঘৃণা – নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক, ৩:১৫।

– নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে, ২:৯,১১।

– যে বলে সে **ঈশ্বরকে ভালবাসে** অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী, ৪:২০।

– **জগৎ** খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ঘৃণা করে, ৩:১৩।

– (ভালবাসা-র শেষ উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

জগৎ – **ঈশ্বর** আপনার একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন, ৪:৯।

– **পিতা খ্রীষ্টকে** জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করলেন, ৪:১৪।

– **যীশুখ্রীষ্ট** সমগ্র জগতের **পাপের** জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি, ২:২।

– জগতে যা আছে তা **পিতা** থেকে উদ্গত নয়, ২:১৬।

– জগৎ খ্রীষ্টানকে **জানে** না **ঈশ্বরকে** জানেনি বলে, ৩:১।

– জগৎ লোপ পেতে চলেছে, ২:১৭।

– জগৎ খ্রীষ্টানকে **ঘৃণা** করে, ৩:১৩।

– **ঈশ্বর** জগতের চেয়ে মহান বলে আমরা জগৎকে **জয়** করি, ৪:৪।

– জগৎ ও খ্রীষ্টবৈরীরা একই কথা, ৪:৫; ৫:১৯।

– জগৎকে **ভালবাসতে** নেই, ২:১৫।

– জগৎকে যে ভালবাসে, **ঈশ্বরের ভালবাসা** তার অন্তরে নেই, ২:১৫।

– **ঈশ্বর** থেকে যা উদ্গত, তা জগৎকে **জয়** করে, ৫:৪।

– **যীশুতে** আমাদের **বিশ্বাসই** জগৎকে **জয়** করে, ৫:৫।

জয় – **যীশুতে বিশ্বাসই জগতের** উপর খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জয়, ৫:৪।

– খ্রীষ্টানরা **খ্রীষ্টবৈরীদের** ও **জগৎকে** জয় করেছে, ৪:৪; ৫:৪।

– তাদের মধ্যে **বাণী** স্থিতমূল **থাকে** বলে তরুণেরা **শয়তানকে** জয় করেছে, ২:১৩,১৪।

জানা – খ্রীষ্টান **পিতা** ও পুত্রকে জানে, ২:১৩-১৪।
– সত্যময় **ঈশ্বরকে** জানবার জন্য **যীশু** আমাদের উপযুক্ত জ্ঞান দিয়েছেন, ৫:২০।
– আমরা জানি, একদিন **যীশুকে** প্রত্যক্ষভাবে দেখব ও তাঁর সদৃশ হব, ৩:২।
– খ্রীষ্টান **যীশুকে** নিষ্পাপ পাপহর বলে **জানে**, ৩:৫।
– ভাইকে **ভালবাসে** বলে খ্রীষ্টান জানে সে মৃত্যু থেকে **জীবনে** পার হয়েছে, ৩:১৪।
– খ্রীষ্টান জানে সে এখন থেকেই অনন্ত **জীবন** পেয়ে গেছে, ৫:১৩।
– খ্রীষ্টান **জগতের** প্রতি **ঈশ্বরের ভালবাসা** জানে, ৩:১৬; ৪:১৬।
– খ্রীষ্টান **সত্যকে** জানে, ২:২১।
– **পবিত্র আত্মার** প্রেরণায় খ্রীষ্টান জানে **ঈশ্বর** তার অন্তরে **থাকেন**, ৩:২৪; ৫:১৩।
– খ্রীষ্টান জানে **ঈশ্বর** তার কথা শোনেন, ৫:১৫।
– খ্রীষ্টান জানে ঈশ্বর-সঞ্জাত যারা, তারা **পাপ** করে না, ৫:১৮।
– খ্রীষ্টান জানে সে **ঈশ্বর** থেকে উদ্গত, ৫:১৯।
– খ্রীষ্টান জানে **খ্রীষ্ট** এসেছেন এবং **ঈশ্বরকে** জানবার জ্ঞান তাকে দিয়েছেন, ৫:২০।
– একটি আত্মা যা স্বীকার করে, তা থেকে খ্রীষ্টান **ঈশ্বরের আত্মাকে** জানে, ৪:২।
– **আজ্ঞাগুলি** ও **বাণীকে** যে পালন করে, সে **ঈশ্বরকে** জানে, ২:৩-৫।
– প্রেরিতদূতগণের কথা যে শোনে, সে **ঈশ্বরকে** জানে, ৪:৬।
– প্রতিবেশীকে যে **ভালবাসে**, সে **ঈশ্বরকে** জানে, ৪:৭।
– প্রেমাজ্ঞা পালনে খ্রীষ্টান জানে সে **সত্য** থেকে সঞ্জাত, ৩:১৯।
– খ্রীষ্টান প্রেরিতদূতগণের **সাক্ষ্য** সত্য বলে জানে, ৩ যোহন ১২।
– জগৎ খ্রীষ্টানদের জানে না এবং তারা তাকে **ভালবাসে** না, ৩:১,১৩।
– যে **পাপ** করে সে **ঈশ্বরকে** দেখেনি ও **জানেওনি**, ৩:৬।

জীবন – **যীশুই** জীবন-**বাণী** ও অনন্ত জীবন, ১:১,২; ৫:২০।
– অনন্ত জীবনই **খ্রীষ্টের** দেওয়া প্রতিশ্রুতি, ২:২৫।
– **ঈশ্বর** আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন, ৫:১১।
– প্রেমাজ্ঞা পালন করি বলে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি, ৩:১৪।
– যে **ঘৃণা** করে তার অন্তরে অনন্ত জীবন নেই, ৩:১৫।
– **ঈশ্বরের** পুত্র **যীশুতেই** অনন্ত জীবন, ৫:১১।
– পুত্রকে যে পেয়েছে, সে অনন্ত জীবনও পেয়েছে, ৫:১২।
– **ঈশ্বরের** পুত্রের নামে যে **বিশ্বাস** করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, ৫:১৩।

তৈলাভিষেক – **যীশুর** দেওয়া দানই তৈলাভিষেক, ২:২০।
– তৈলাভিষেক আমাদের অন্তরে থাকে, ২:২০।
– তৈলাভিষেক সর্ববিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেয়, ২:২৭।

থাকা – পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা **জানি ঈশ্বর** আমাদের অন্তরে থাকেন, ৩:২৪; ৪:১৩।
– **ঈশ্বরের বাণী** আমাদের অন্তরে থাকে, ২:১৪।
– **খ্রীষ্টের তৈলাভিষেক** আমাদের অন্তরে থাকে, ২:২৭।
– **ঈশ্বরের বীজ** আমাদের অন্তরে থাকে বলে আমরা **পাপ** করি না, ৩:৯।
– **সত্য** আমাদের সঙ্গে থাকে চিরকাল, ২ যোহন ২।
– **যীশুতে** থাকার প্রয়োজনীয়তা, ২:২৭,২৮।
– প্রেমাজ্ঞা যে পালন করে, সে **আলোতে** এবং **ঈশ্বরে** থাকে আর ঈশ্বর তার অন্তরে, ২:৬; (৩:১৭); ৪:১২,১৬।
– যে **ভালবাসে** না, সে **মৃত্যুতে** থাকে এবং অনন্ত **জীবন** তার অন্তরে থাকে না, ৩:১৪,১৫।
– **ঈশ্বরের** ইচ্ছা যে পালন করে, সে থাকে অনন্ত কাল, ২:১৭।
– **আজ্ঞাগুলি** যে পালন করে, সে ঈশ্বরে থাকে এবং **ঈশ্বর** তার অন্তরে, ৩:২৪।
– আদি-সংবাদে যে বিশ্বস্ত থাকে, সে পুত্রে ও **পিতায়** থাকে, ২:২৪।
– **ঈশ্বরে** যে থাকে, সে **পাপ** করে না, ৩:৬।
– যে **যীশুকে** ঈশ্বরের পুত্র বলে **স্বীকার** করে, **ঈশ্বর** তার অন্তরে থাকেন এবং সে ঈশ্বরে, ৪:১৫।
– খ্রীষ্টশিক্ষায় যে বিশ্বস্ত থাকে, সে **পিতা** ও পুত্রকে পেয়েছে, ২ যোহন ৯।

দিয়াবল **শয়তান** দ্রষ্টব্য।

পবিত্র আত্মা – পবিত্র আত্মা **ঈশ্বরের** দান, ৩:২৪।
– তিনি **যীশুর সাক্ষী**, ৫:৬,৮।
– তিনিই **সত্য**, ৫:৬।
– তিনি **বিশ্বাস** ও **ভালবাসার** উৎস, ৩:২৩-২৪।
– (তিনি **যীশুর** দেওয়া **তৈলাভিষেক** এবং আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের বীজ, ২:২০,২৭; ৩:৯)।
– তাঁর দ্বারা আমরা **জানি ঈশ্বর** আমাদের অন্তরে থাকেন, ৩:২৪; ৪:১৩।
– (নকল আত্মা থেকে ঈশ্বরের আত্মাকে নির্ণয় করা দরকার, ৪:১ ...)।
– (ঈশ্বরের আত্মা মাংসে ঐশপুত্র **যীশুর** আগমন **স্বীকার** করে, ৪:২)।

পাপ – **যীশুই** আমাদের ও সমগ্র জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি, ২:২; ৪:১০।
– **যীশু** নিষ্পাপ পাপহর, ৩:৫।
– **যীশুতে** যে **থাকে** সে পাপ করে না, ৩:৬।
– ঈশ্বর-সঞ্জাত যারা, তারা পাপ করতে পারে না, কেননা তাদের অন্তরে **ঈশ্বরের বীজ** থাকে, ৩:৯ (৫:১৮)।
– নিজের পাপগুলি যে স্বীকার করে, **যীশু** সেগুলি থেকে তাকে শুচি করেন, ১:৯।
– **আলোতে** যে চলে, **যীশুর** রক্ত তার সকল পাপ থেকে তাকে শুচি করেন, ১:৭ (২:১২)।
– যে নিজেকে নিষ্পাপ মনে করে, সে **ঈশ্বরকে** মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করে এবং বাণী তার অন্তরে নেই, ১:৮,১০।
– যে পাপ করে, সে **যীশুকে** দেখেনি, **জানে**ও নি, ৩:৬।

– যে পাপ করে, সে **শয়তান** থেকে উদ্গত, ৩:৮।
– পাপ হল জঘন্য কাজ, ৩:৪।
– মৃত্যুজনক পাপ, ৫:১৬-১৭।
– পাপীদের জন্য **প্রার্থনা** করলে ঈশ্বর তাদের **জীবন** দেবেন, ৫:১৬।

পিতা – পিতার সঙ্গে **সহভাগিতা** আমাদের আছে, ১:৩।
– আমাদের প্রতি তাঁর অগাধ **ভালবাসা** আছে, ৩:১।
– তিনি **যীশুকে জগতের** ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করলেন, ৪:১৪।
– পুত্রকে যে **স্বীকার** করে সে পিতাকে পেয়েছে, ২:২৩; ২ যোহন ৯।
– পিতায় **থাকা** প্রয়োজন, ২:২৪।

প্রার্থনা – যে **ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি** ও ইচ্ছা পালন করে, ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনবেন, ৩:২২।
– **ঈশ্বরের** ইচ্ছা অনুসারে যে প্রার্থনা করে তিনি তার কথা শোনেন, ৫:১৪।
– প্রার্থনা আশ্বাসপূর্ণ হওয়া দরকার, ৫:১৫।
– পাপী ভাইদের জন্য প্রার্থনা করলে **ঈশ্বর** তাদের **জীবন** দেবেন, ৫:১৬।

প্রেম **ভালবাসা** দ্রষ্টব্য।

বাণী – **যীশুখ্রীষ্টই** সেই **জীবন**-বাণী যা বিষয়ে সংবাদ ও **সাক্ষ্যদান** করা হয়, ১:১।
– বাণী আমাদের অন্তরে থাকে, তা দ্বারা **শয়তানকে জয়** করি, ২:১৪।
– ঈশ্বরের বাণী যে পালন করে, তার অন্তরে ঐশপ্রেম সিদ্ধিলাভ করেছে, ২:৫।
– (বাণীই **তৈলাভিষেক**, এবং আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের **বীজ**, ২:২০,২৭; ৩:৯)।

বিশ্বাস – **যীশুখ্রীষ্টে** বিশ্বাসই **জগতের** উপর খ্রীষ্টবিশ্বাসীর **জয়**, ৫:৪।
– **যীশুতে** বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, ৩:২৩; ৪:৬; ৫:১,১০,১৩।

বীজ – **ঈশ্বরের** বীজ আমাদের অন্তরে থাকে বলে পাপ রোধ করতে পারি, ৩:৯।

ভালবাসা – **ঈশ্বর** ভালবাসা, ৪:৮,১৬।
– ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে আছে, ২:৫; ৩:১,১৬; ৪:৮-১০,১২,১৬,১৭; ৫:৩।
– পারস্পরিক ভালবাসাই **যীশুর আজ্ঞা**, ২:৭-১০।
– ভালবাসাই **যীশুর** দেওয়া সংবাদ, ২:১০; ৩:১১,২৩; ৪:২১।
– যীশুর ভালবাসাই আদর্শ ভালবাসা, ৪:১৯।
– যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, এবং ঈশ্বর তার অন্তরে থাকেন, ৪:৭,১২।
– পারস্পরিক ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা, ২:১০; ৩:১০,১৪,১৭,১৮; ৪:৭,১১,১৬,১৮,২১; ২ যোহন ৬।
– ভাইয়ের প্রতি ভালবাসাই **ঈশ্বরের** প্রতি ভালবাসার প্রমাণ, ৪:২০; ৫:২।
– যে ভালবাসে, সে **মৃত্যু** থেকে **জীবনে** পার হয়েছে, ৩:১৪।
– কথায় শুধু নয়, বাস্তবেই ভালবাসা উচিত, ৩:১৮।

– ভাইকে যে ভালবাসে না, সে **ঈশ্বর** থেকে উদ্গাত নয়, তাঁকে **জানে** না এবং **মৃত্যুতে থাকে**, ৩:১০,১৪; ৪:৮,২০।

মৃত্যু – ভাইদের ভালবাসি বলে আমরা **জানি** মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি, ৩:১৪।
– যে **ভালবাসে** না, সে মৃত্যুতে থাকে, ৩:১৪।

যীশুখ্রীষ্ট – যীশুখ্রীষ্টই **জীবন-বাণী**, ১:১।
– তিনিই **পিতা**মুখী অনন্ত **জীবন**, ১:২; ৫:২০।
– তিনিই **ঈশ্বরের** পুত্র, ১:৩,৭; ২:২২-২৪; ৩:৮,২৩; ৪:৯,১০,১৪,১৫; ৫:৫, ৯-১৩,২০; ২ যোহন ৩,৯।
– তিনি **পিতার** কাছে আমাদের সহায়ক, ২:১।
– তিনি (ঈশ্বরের মত) ধর্মাত্মা, ২:১; ২:২৯; ৩:৭।
– তিনি সেই পরমপবিত্রজন যাঁর কাছ থেকে **তৈলাভিষেক** পেয়েছি, ২:২০।
– তিনি অনন্ত জীবন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ২:২৫।
– তিনি আমাদের ও সমগ্র **জগতের পাপের** প্রায়শ্চিত্তবলি, ২:২; ৪:১০।
– তিনি বিশ্বপাপহর, ৩:৫।
– তিনি **জগতের** ত্রাণকর্তা, ৪:১৪।
– তিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন, ৫:৬।
– আমরা তাঁর **সহভাগিতায়** আছি, ১:৩।
– তাঁর রক্ত **পাপ** থেকে আমাদের শুচি করে, ১:৭।
– তাঁকে মসীহ/**খ্রীষ্ট** বলে **স্বীকার** করতে হয়, ২:২২।
– তাঁকে 'মাংসে আগত' বলে **স্বীকার** করতে হয়, ৪:২; ২ যোহন ৭।
– তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে **স্বীকার** করতে হয়, ৪:১৫; ৫:৫,১০।
– তাঁর নামে **বিশ্বাস** করা প্রয়োজন, ৩:২৩; ৫:১৩।
– তাঁকে যে **স্বীকার** করে, সে **ঈশ্বরকে** পেয়েছে, ২:২৩।
– তাঁকে যে অস্বীকার করে, সে **ঈশ্বরকেও** অস্বীকার করে, ২:২২,২৩।
– যীশুতে **থাকা** প্রয়োজন, ২:২৭,২৮; ৩:৬।

শয়তান – যে ঈশ্বরসঞ্জাত, শয়তান তাকে স্পর্শ করে না, ৫:১৮।
– শয়তানের কাজকর্ম বিনাশের জন্যই **যীশু** আবির্ভূত হলেন ৩:৮।
– বাণীর মাধ্যমেই তরুণেরা শয়তানকে **জয়** করেছে, ২:১৩,১৪।
– যে **পাপ** করে সে শয়তান থেকে সঞ্জাত, ৩:৮।
– ভাইদের যে **ভালবাসে** না, সে শয়তান থেকে সঞ্জাত, ৩:১০।

সত্য – **পবিত্র আত্মাই** সত্য, ৫:৬।
– সত্য আমাদের অন্তরে অনন্তকাল থাকে, ২ যোহন ২।
– যে **আলোতে** চলে, **আজ্ঞাগুলি** পালন করে ও **পাপ** করে না, সে-ই সত্যের সাধক, ১:৬,৮; ২:৪।
– প্রেমাজ্ঞা পালনে **জানি** আমরা সত্য থেকে উদ্গাত, ৩:১৯।

– খ্রীস্টান সত্যকে **জানে**, ২:২১; ২ যোহন ১।

– খ্রীস্টান সত্যে চলে, ২ যোহন ৪; ৩ যোহন ৩,৪।

– সত্যের **আত্মা** যার আছে, সে প্রেরিতদূতগণের কথা শোনে, ৪:৬।

– বাণীপ্রচারকদের প্রতি সহযোগিতাদান হল সত্য-সাধনেরও প্রতি সহযোগিতাদান, ৩ যোহন ৮।

সন্তান **ঈশ্বরের সন্তান** দ্রষ্টব্য।

সহভাগিতা– প্রেরিতদূতগণের সঙ্গে সহভাগিতা হল **ঈশ্বরের** সঙ্গে সহভাগিতার শর্তস্বরূপ, ১:৩।

– যারা **আলোতে** চলে তাদের অন্তরে ঐশসহভাগিতা বর্তমান, ১:৭।

সাক্ষ্য – **পবিত্র আত্মা**, জল ও রক্ত মাংসে **যীশুর** আগমনের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ৫:৬-৮।

– **যীশু** যে তাঁর পুত্র, এবিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষ্য দিলেন, ৫:৯।

– **যীশু** বিষয়ে **ঈশ্বরের** সাক্ষ্য মানবীয় সাক্ষ্যের চেয়ে মহান, ৫:৯।

– **যীশুতে** যে **বিশ্বাস** রাখে, তার অন্তরে সাক্ষ্য বর্তমান আছে, ৫:১০।

– **যীশুতে** যে **বিশ্বাস** রাখে, সে অনন্ত **জীবন** পেয়ে গেছে: এটিই **ঈশ্বরের** সাক্ষ্য, ৫:১১।

– প্রেরিতদূতগণ **যীশু** বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, ১:২।

স্বীকার – পুত্রকে যে স্বীকার করে, সে **পিতাকে** পেয়েছে, ২:২৩।

– যে কোন আত্মা মাংসে **যীশুর** আগমন স্বীকার করে, সে **ঈশ্বরের**, ৪:২-৩; ২ যোহন ৭।

– ঈশ্বরের পুত্র বলে যীশুকে যে স্বীকার করে, **ঈশ্বর** তার অন্তরে থাকেন আর সে ঈশ্বরে, ৪:১৫।

– **পাপের** ক্ষমালাভের জন্য পাপগুলি স্বীকার করা প্রয়োজন, ১:৯।